॥ নিশিলগ্ন ॥

রণজিৎকুমার সেন

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্‌,
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৬৪

প্রচ্ছদশিল্পী :
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পান
নিউ সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা—৬

মূল্য :
চারি টাকা মাত্র

My heart is like a rainbow shell
That paddles in a halcyon sea ;
My heart is gladder than all these
Because my love is come to me.

—ROSSETTI

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

দ্বৈত-সঙ্গীত

নতুন দিন নতুন মানুষ

নানা ফুলের সাজি

রাধা

আগামী পৃথিবী

দ্বীপ ও দ্বীপান্তর

চক্রধারী

একালের কাহিনী

সানাই

ঝরা পালক

সব্যসাচী

বৌদ্ধদর্শন

সমাজ-দর্শন

Man and Society

গীত-ভারতী

বিপ্লব

শতাব্দী

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নিশিলগ্ন

শীতে সরু খালের মতো স্তিমিত হ'য়ে আসে নবগঙ্গা, বর্ষায় আবার ক্ষেপে ওঠে প্রচণ্ড বেগে, কূলপ্লাবি স্রোতের শব্দ জাগে তখন কলকলনাদে।

কামার, কুমোর, চাষি-মজুর, মধ্যবিত্ত আর মাঝিমাল্লায় বঙ্কিম্ মহকুমা। বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে তার নবগঙ্গা। গঙ্গার নব সংস্করণ নয়, নামের মধ্যে তবু একটা স্বাজাত্য আছে। বঙ্গ-বিভাগে আজ এখানে এসেছে ইস্‌লামী জোয়ার, অবিভক্ত বঙ্গে একদিন পাশাপাশি জাগতো এখানে শঙ্খ ঘণ্টা আর আজানের ধ্বনি। তিরিশ বছর আগে আর পরে ঃ ইতিহাসের কি নির্ম্মম হাসিই না চোখে ভাসে! সেদিন মুসলমান চাষি আর 'কেরায়া'র মাঝির সাথে মধ্যবিত্ত হিন্দুর আত্মীয়তা ছিল অন্তরের, সামাজিক সম্বন্ধে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছিল বিরাট একটা যৌথ-পরিবারের মতই পরস্পর ঘনিষ্ঠ। সকালের রোদ বিকেলে যেতো, এ-বাড়ির মানুষ যেয়ে আসর জমাতো ও-বাড়িতে। প্রীতি ছিল, সৌহার্দ্দ্য ছিল, ছিল তেমনি কাঙালপনাও। স্কুল-আদালতে মহকুমা হ'লেও চক্ মিলানো গ্রামের মতই তখন মাগুরা। ওপারের মানুষ এসে সওদা ক'রে নেয় এপার থেকে, এপারের মানুষ গিয়ে বীজ বুনে আসে ওপারের চষা ক্ষেতে। তার মধ্যেই সুখ-দুঃখ, তার মধ্যেই আশা-আনন্দ, তার মধ্যেই রূপায়িত হ'য়ে ওঠে তেমনি অন্তরের তিক্ততা আর বৈলক্ষণ্য।

তার মধ্যেই সঞ্চারিত হ'লো একদিন তিনটি পরিবারের ত্রয়ী সাধনার ক্ষেত্র। কুঞ্জবিহারী বাড়ুয্যে, রসিকলাল আর মিঃ মল্লিক।

কুঞ্জবিহারী বাড়ুয্যে আজ বেঁচে নেই, বারো বছরের একমাত্র ছেলে বিজনকে নিয়ে সংসারে আজ বেঁচে আছেন তাঁর বিধবা স্ত্রী নির্ম্মলা। রসিকলাল মাগুরা-কোর্টেই ওকালতি করেন। মেয়ে সবিতা, বাচ্চা দু'টি ছেলে মিণ্টু আর জিতু, দূর সম্পর্কের মৃত ভাই অমিয় মাধবের কন্যা ছন্দা আর অতিরিক্ত রকমের মুখরা স্ত্রী অঞ্জনা ঃ রসিকলালের সংসার ব'ল্‌তে এই ক'টি প্রাণী। স্ত্রী অতিরিক্ত রকমের মুখরা হ'লেও বিশেষ শান্ত প্রকৃতির মানুষ রসিকলাল। অন্দরের আবহাওয়ায় বিষিয়ে উঠে সম্প্রতি এসে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি

বাইরের ঘরে। দিনের বৃহত্তর অংশটা কেটে যায় আইনের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে, বাকী সময়টুকু কাটে নিজেকে নিয়ে মজা নদীর মতো। ততক্ষণে সাংসারিক আবেষ্টনীর মধ্যে চীৎকার ক'রে সারা বাড়িটাকে মাথায় ক'রে নেন অঞ্জনা। মিণ্টু ভূমিষ্ঠ হবার পর নাকি কি একটা বড় অসুখে তাঁকে শয্যাশায়ী থাকতে হ'য়েছিল কিছুকাল, মেজাজটা বিগ্‌ড়ে গেছে সেই থেকেই। নইলে রসিকলাল নিজেও জানেন—মিণ্টু পেটে আসবার আগে পর্য্যন্ত সুরটা এমন উদারা থেকে তারায় ওঠেনি অঞ্জনার। স্ত্রীর স্বভাবকে আজ অদৃষ্টের বিবর্ত্তনের সঙ্গেই বাধ্য হ'য়ে স্বীকার ক'রে নিতে হ'য়েছে রসিকলালকে। মাঝে মাঝে এক একবার নিজেকে তুলনা ক'রতে যান তিনি মিঃ মল্লিকের সাথে, কিন্তু তুলনার প্রতিযোগিতায় অবধারিত রূপেই হার স্বীকার ক'রে নিতে হয় তাঁকে। বনেদী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গতি-সম্পন্ন মানুষ যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, মিঃ মল্লিক নামেই এখানে তিনি সমধিক খ্যাত। মহকুমার এই পরিবেশে খানিকটা খাপছাড়া জীবন। কী একটা সূত্রে একদিন আসেন তিনি এ অঞ্চলে, সেই থেকে বছর কয়েক ধ'রে আছেন। স্ত্রী আর বছর ন'দশ বয়সের মেয়ে রেবাকে নিয়ে বাংলোর মতো বেঁধে আছেন তিনি সংসারটি। নাগরিক সভ্যতার আলোয় মার্জ্জিত চেহারা ; শিক্ষিত রুচি আর শালীনতা বোধের ঐতিহ্য লক্ষ্যে পড়ে আচারে, কথায় আর চোখের দৃষ্টিতে। একেশ্বরবাদী শান্তিপ্রিয় জীবন। গোড়া হিন্দু-শাস্ত্রের পুতুল পূজোর অসারতা নিয়ে ইতিমধ্যে একদিন তিনি বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছিলেন রসিকলালের আইনের যুক্তিকে। তাই ব'লে অন্তরের সম্প্রীতিটা আইনের খাতা ঘেঁসে চলেনি। মাঝে মাঝে সান্ধ্যবৈঠকে সেটুকু বরং ঘনিষ্ঠ হ'য়েই ওঠে।

অধস্তন পুরুষে নেমে এসে দেখা যায়—ছন্দার বয়সের সঙ্গে রেবার বয়সের মিলটা দূরের নয়, বরং এ ওর ঠিক উল্টো পিঠ। তাদের খেলাঘরের জীবনে মাঝে মাঝে এসে অতিরিক্ত রকমের অভিভাবকত্ব প্রকাশ ক'রে বসে বিজন। জ্যামিতিক ত্রিভুজের মতো কণ্ঠ-সংলগ্ন তারা পরস্পর। খেলাঘরের তিনটি নির্ম্মল শুচিশুদ্ধ জীবন। দিন ক্রমে এগিয়ে চলে, খেলাঘরের রূপও তেমনি একটু একটু ক'রে পাল্টাতে থাকে তাদের। মাঝে মাঝে একাকিত্বের মুহূর্ত্তগুলো অন্ধকার রাত্রির মতো কালো হ'য়ে আসে ছন্দার কাছে। ভাবতে বসে তখন সে নিজেকে নিয়ে, ভাবতে বসে বিজন আর রেবার দিকে লক্ষ্য ক'রেই। জীবনে তাদের ব্যথা লুকোবার যায়গা আছে, স্নেহ কেড়ে নেবার মানুষ আছে,

কিন্তু ছন্দার? দূর সম্পর্কের মুখরা কাকিমার সংসারে মানুষ হ'য়ে আপনার ব'লতে সে কাউকে পায়নি। যেখানে স্নেহ কুড়োবার যায়গা, ফাঁক থেকে গেছে সেইখানেই। কাকা রসিকলাল ইচ্ছে থাক্‌লেও কাছে ডেকে নেবার ভরসা পান না বড় একটা। ভয় আছে কাকিমাকে; চোখে প'ড়লেই চেঁচিয়ে উঠবেন তিনি: 'ছেস্থা দেখ, নিজের ছেলেমেয়েগুলো সেই কথন্ থেকে ক্ষিদেয় গলা ফাটাচ্ছে, এদিকে ভাইঝিকে নিয়ে ব'সেছেন তিনি আদিখ্যেতা দেখাতে। তবু তো এমন কিছু আপনা ভাইয়ের সম্পর্ক নয়, তেমন হ'লে না জানি তবে কি হ'তো!' এমন কথা শুধু একদিন কেন, ব'লে ব'লে কতদিনই তো গলা ফাটিয়েছেন অঞ্জনা। কাকিমার সেই রুদ্র ভয়াল মূর্ত্তি কিশোর-মনে গাঁথা র'য়ে গেছে ছন্দার। কাকা রসিকলাল সেই থেকে যথাসম্ভব ঔদাসীন্য রক্ষা ক'রেই বাইরের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।—এসব কথা মনে হ'লে অশ্রু রোধ ক'রতে পারে না ছন্দা। বিজনের জীবনে এ দুঃখের ইতিহাস নেই, এমন ক'রে আড়ালে ব'সে অশ্রু মুছে নিতে হয় না রেবাকে। স্নেহাঞ্চলে সুখের নীড় রচনা ক'রে আছে তারা। তাদের অদৃষ্টকে কল্পনা ক'রে হিংসা হয় না, মনে হয়—শান্তির কি সুন্দর উদাহরণ!

খেলাঘরের দিনগুলো এমনি ক'রেই সুখের বসন্তে দুঃখের ঝটিকা হ'য়ে উড়ে যায়। নিজের দিকে লক্ষ্য ক'রে এক একবার সেদিকে দৃষ্টি তুলে ধরে ছন্দা।

দুই

সেদিন কি একটা উপলক্ষে যেন দুপুরেই ছুটি হ'য়ে গেল বিজনদের প্রাইমারী স্কুল। বই খাতা নিয়ে ঘরে ফিরলো বিজন। ততক্ষণে নিজের শয্যায় শুয়ে এক ঘুম দিয়ে উঠলেন নির্ম্মলা। ব'ল্লেন, 'এরই মধ্যে বুঝি ছুটি হ'য়ে গেল আজ! রান্নাঘরে খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে দেয়ে এসে অঙ্ক বই আর খাতা নিয়ে ব'স্।'

কথা শুনে মনে মনে কিছুটা দমে গেল বিজন। আজ বিকেলে তাদের হকি-টুর্ণামেণ্ট। অথচ তার নিজের হকি নেই। এটা কম দুঃখের কথা নয় তার পক্ষে। ছন্দাদের পেয়ারা গাছের ডাল থেকে বাঁকা দেখে একটা ডাল কেটে নিয়ে আসতে পারলেই তা দিয়ে আপাতত একটা হকি বানিয়ে নিতে পারবে সে ঃ উদ্দেশ্যটা হ'চ্চে এই। অথচ মা'র আদেশ কঠিন খড়্গের মতো অকস্মাৎ উদ্যত হ'য়ে উঠেছে। কথামতো অঙ্ক বই আর খাতা নিয়ে এসে না ব'সলে মার খাওয়াটা অবধারিত। রান্নাঘর থেকে খাবার খেয়ে এসে একান্ত সুবোধ বালকের মতই তাই খুলে ব'সলো সে অঙ্ক বই আর খাতা। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে আঁকিঝুঁকি ক'রলো খাতায়, কিন্তু মন ব'সতে চাইল না কিছুতেই। সারা ব্রহ্মতালুতে ঘুরপাক খাচ্ছে তার হকি-টুর্ণামেণ্ট। তার নিজের হকি নেই—এ দুঃখ সে কাকে বোঝাবে?

পার্শ্বপরিবর্ত্তন ক'রলেন একবার নির্ম্মলা। ঘুমের ঘোর তখনও ভালো ক'রে কাটেনি। গাঢ় নিদ্রায় আবার দু' চোখ আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো। ঘুমিয়ে প'ড়লেন নির্ম্মলা।

তাঁর নাসিকা গর্জ্জনের আভাস পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য একবার স্থির হ'য়ে বস্‌লো বিজন। খুসিতে খানিকটা উচ্ছল হ'য়ে উঠলো এবারে সে। বিজন জানে—মা'র যেমন আজগুবি ঘুম, তেমনি একবার ঘুমোলে সহজে সে-ঘুম ভাঙবার নয়। খোলা প'ড়ে রইল অঙ্ক বই আর খাতা, এক সময় নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর পা টিপে টিপে ধারালো হাত দা'খানি হাতে নিয়ে সোজা সে বেরিয়ে প'ড়লো রসিকলালের বাড়ির দিকে।

রসিকলাল তখন কোর্টে। অঞ্জনা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরের মেঝেয় পাটি বিছিয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ঘুমন্তপুরীর একমাত্র প্রহরী ছন্দা। একা

একা ভালো লাগছিল না ঘরের মধ্যে ব'সে থাক্‌তে। বাইরের দাওয়ায় ব'সে তাই অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবছিল ছন্দা। বিজনকে আসতে দেখে এবারে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা গেল তার মধ্যে। কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে চাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'দা নিয়ে কোথায় যাচ্ছো বিজুদা ?'

ভারিক্কি কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'যাচ্ছিনে কোথাও, স্কুলের মাঠে আমাদের আজ হকি-ম্যাচ্‌ আছে, তোদের পেয়ারা গাছ থেকে একটা বাঁকা ডাল কেটে নেবো, তাই এসেছি।'

স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়েই ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'হকি খেল্‌বে, তা ডাল দিয়ে কি ক'রবে ?'

—'মেয়ে মানুষের অত দিয়ে দরকার কি, ও তুই বুঝবি নে।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'কি ক'রবো, তা পরেই দেখতে পাবি; আয়, নিচে দাঁড়াবি তুই।'

বুকখানি সহসা একবার আতঙ্কে দুর্‌-দুর্‌ ক'রে উঠ্‌লো ছন্দার। ব'ল্‌লো, 'শব্দ শুনে কাকিমা যদি হঠাৎ জেগে ওঠেন, তবে যে আর রক্ষা থাক্‌বে না বিজুদা !'

—'নে, জ্যাঠামি রাখ, রক্ষা থাকবে না আর কিছু!' স্পষ্ট একটা তাচ্ছিল্যের সুর মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো বিজনের কণ্ঠেঃ 'ভারী তো কাকিমা, তার আবার ভয়! আয়, নীচে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিবি তুই, আমি নির্ব্বিবাদে কাজ হাঁসিল ক'রে চ'লে যাবো।'

ভয়ে কাঁপ্‌ছে বুকখানি দুর্‌-দুর্‌ ক'রে, তবু কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতই নীরবে অনুসরণ ক'রলো ছন্দা বিজনকে।

নির্ব্বিবাদে খুসী মতো ডাল কেটে নিয়ে গাছ থেকে নেমে এলো বিজন। বাসায় ফির্‌বার পথে ছন্দার কানের কাছে মুখ নিয়ে ব'লে এলো সেঃ 'খবরদার, ঘুনাক্ষরেও যেন তোর কাকিমার কানে না ওঠে ব্যাপারটা, তবে মেরে কিন্তু একেবারে হাড় গুড়িয়ে দেবো।'

ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে শুধু চেয়ে রইল ছন্দা বিজনের মুখের দিকে, উত্তরে একটি কথাও ব'ল্‌তে পারলো না।

বাসায় এসে সেই বাঁকা ডাল দিয়ে মনের মতো ক'রে হকি বানিয়ে আবার কিছুক্ষণের জন্য এসে বই-খাতা নিয়ে ব'স্‌লো বিজন। কিন্তু অঙ্ক কষা আর হ'লো না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্ম্মলার নিদ্রা ভেঙে গেল, জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'ক'টা অঙ্ক কষ্‌লি বিজু?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে এবারে বাধ্য হ'য়েই কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'লো বিজনকে, ব'ল্‌লো, 'ক'টা আবার কষ্‌বো, একটা নিয়েই যে এতক্ষণ কাট্‌লো। কিছুতেই এসে যোগফলে মিল্‌ছে না!'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বেশ তো, ওটা না হয় পরে মাষ্টার মশাইর কাছ থেকেই বুঝে নিবি; ততক্ষণে আর পাঁচটা কষ্‌।'

বাইরে বেলা ক্রমে প'ড়ে আস্‌ছিল। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে মনে মনে কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধ'রছিল না বিজনের। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একসময় আব্দারের সুর তুলে ধ'রলো সে মা'র কাছে, 'এবারে কিন্তু আমি খেল্‌তে যাবো মা, আমাদের আজ একটা ভীষণ ম্যাচ খেলা আছে। দেরী ক'রে গেলে ওদিকে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।'

আপত্তি ক'রলেন না নির্ম্মলা। কুঞ্জবিহারী বাড়ুয্যে সংসার থেকে চ'লে যাবার পর হ'তে বিজনের সকল আব্দার নির্ব্বিবাদে মেনে এসেছেন তিনি। বিজন ছাড়া সংসারে আসক্তি ব'ল্‌তে আজ আর তাঁর কি আছে? ছেলেকে তাই শাসন করেন তিনি যতটুকু, স্নেহ দিয়ে ঘিরে রাখেন তার অধিক। এ স্নেহের কাছে কোনো যুক্তি নেই, কোনো বিচার নেই।

বই-খাতা বুজিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরী হ'য়ে নিল বিজন। পায়ে সাদা কেড্‌স্, হাঁটু থেকে কোমর অবধি খাঁকি পেন্টুলান, গায়ে হাতকাটা জামা: পাকা খেলোয়াড়ের পোষাক। সদ্য তৈরী করা নতুন হকিখানি হাতে দোলাতে দোলাতে খেলার মাঠের দিকে বেরিয়ে প'ড়লো বিজন।

সুরু হ'লো খেলা। হঠাৎ বিপক্ষ দলের কার হাতের একখানি হকি এসে সজোরে আঘাত ক'রলো বিজনের ডান পায়ের হাঁটুতে। যন্ত্রণা চেপে রাখ্‌তে না পেরে সহসা ব'সে প'ড়ে কাত্‌রাতে সুরু ক'রলো সে। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। এ ভাবে ব'সে থাকা ভীরুতার লক্ষণ। তেমন ভীরুতা প্রকাশ ক'রতে রাজি নয় বিজন। সামনেই বল পেয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠে আবার সে সুরু ক'রলো হকির কৌশল দেখিয়ে যথানিয়মে দৌড়োতে। ব্যথায় টন্ টন্ ক'রছে হাঁটুটা, মনে হ'চ্চে—পা থেকে আল্‌গা হ'য়ে খ'সে প'ড়েছে হাঁটুর বাটিটা। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। বল নিয়ে অনবরত আক্রমণ ক'রতে উদ্যত হ'য়ে উঠেছে সে বিপক্ষ দলের গোল-পোষ্টের দিকে।

শেষ পর্য্যন্ত একটা আশ্চর্য্য রকমের স্কোর। দু'মিনিট মাত্র বাকী রেফারীর ঘড়িতে। একটু বাদেই বাজবে খেলা-সমাপ্তির হুইসিল। দর্শকদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ফেটে প'ড়ছে মাঠের মধ্যে। এমনি সময়ে হঠাৎ গোলটা হ'য়ে গেল। এ্যাঙ্গল্-সট্ গোল, স্কোরটা ক'রলো বিজনই। হাঁটুর আঘাতের প্রতিশোধ নিতে পারলো সে এতক্ষণে।

হিপ্-হিপ্-হুররা ধ্বনিতে সহসা আকাশ বিদীর্ণ হ'য়ে উঠলো। রূপোর মেডেল নিয়ে ঘরে ফিরলো বিজনদের দল। পাশ থেকে কে একজন সহানুভূতির কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'চোট্‌টা খুব বেশী লাগেনি তো তোর পায়ে?'

—'ওটুকু চোটে কি হয়, দিলাম তো শেষ পর্য্যন্ত স্কোরটা ক'রে!'—উত্তর দিতে গিয়ে আত্ম-কৃতিত্বের গর্ব্বটুকু চেপে রাখতে পারলো না বিজন।

কিন্তু যত তাচ্ছিল্য ক'রেই আঘাতের মাত্রাটাকে লঘু ক'রে দিতে চেষ্টা করুক্ না সে সহপাঠিদের কাছে, রাত্রে কিন্তু ততোধিক গুরুতর যন্ত্রনায় অস্থির হ'য়ে প'ড়লো বিজন। হাঁটুটা দেখতে দেখতে অনেকখানি ফুলে উঠেছে। ব'সে ব'সে গরম জলের সেক দিয়ে দিলেন নির্ম্মলা। ব'ল্লেন, 'দস্যি ছেলে, খেল্‌তে গিয়ে যে হাঁটু ক্ষুইয়ে এলি, এরপর স্কুলে যাবি কি ক'রে?'

যন্ত্রনার মধ্যেও কেমন যেন খানিকটা খুসীর আভাস খেলে গেল এবারে বিজনের কণ্ঠে। ব'ল্লো, 'তা ঠিক যেতে পারবো, দেখে নিও তুমি। স্কোর ক'রেছি, স্কুলে কে কি বল্লে, শুন্‌বো না মা?'

—'এই আনন্দেই থাকো, হতচ্ছাড়া কোথাকার।' ব'লে কিছুটা স্নেহের তিরস্কার ক'রলেন নির্ম্মলা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যথাটা আর বড বেশী বোধ হ'লো না পায়ে। এপাশে ওপাশে নানা দিকে পাখানিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো বিজন—নাঃ, মার স্নেহের হাতের গুণই আলাদা।

ইতিমধ্যে ওপাশের বাখাড়ীর বেড়া ডিঙিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো রেবা আর ছন্দা। কাল রাত্রেই তারা বিজনদের মেডেল জেতার খবর পেয়েছিল। সেই থেকে ঔৎসুক্যে ভ'রে আছে সারা মন। বাখাড়ীর বেড়া ডিঙিয়ে আস্‌তে গিয়ে বিজনের পদচালনার ব্যাপারটা তাদের চোখে প ড়েছিল। ব'ল্‌লো, 'ও কি বিজুদা, ডন-কুস্তি ক'রছো নাকি?'

মনে মনে অনেকখানি লজ্জা বোধ ক'রেই এবারে স্থির হ'য়ে বস্‌লো বিজন। অপ্রস্তুত হ'তে সে রাজি নয় কোনো ক্রমেই। ব'ল্‌লো, 'মেয়েমানুষের বুদ্ধি,

এভাবে কেউ বুঝি ডন-কুস্তি করে? যা জানিস্‌নে, তা নিয়ে এমন ক'রে কথা ব'ল্‌তে আসিস্‌ কেন?'

রেবা ব'ল্‌লো, 'তা না হয় না-ই জান্‌লাম, কিন্তু কি খাওয়াচ্ছো বলো?'

—'মানে?'

—'বাঃ রে, মানে আবার কি, মেডেল জিত্‌লে, খাওয়াবে না?'

—'আচ্ছা তো বোকা দেখছি।' চোখ-মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে বিজন ব'ললো, 'মেডেল কি আমি একা জিতেছি যে খাওয়াবো!'

জোর ক'রলো এবারে রেবা: 'একাই জেতো আর দোক্‌লাই জেতো, জিতেছ তো! আগে খাওয়া চাই, তারপর অন্য কথা।'

—'বাঃ রে, বেশ মানুষ তো!'

দু'পা সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো এবারে ছন্দা, ব'ললো, 'বেশ মানুষ ছাড়া কি, মনে আছে কালকের কথা বিজুদা? না খাওয়ালে কালকের কথা কিন্তু একেবারে বেফাঁস ক'রে দেবো।'

মৃদু হাসির সঙ্গে কৃত্রিম ক্রোধ মিশিয়ে এবারে খানিকটা তেড়ে উঠ্‌লো বিজন ছন্দার উপর: 'তবে আর একগাছাও চুল থাক্‌বে না তোর মাথায়, জানিস তো?'

ঈষৎ ঠোঁট উল্টিয়ে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'ঈস, ধ'রেই দেখ না, মজা দেখিয়ে দেবো।'

ইতিমধ্যে নির্ম্মলা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন।

বিজনের যত ক্রোধ এবারে বাঁকা চোখের চাপা হাসির মধ্যে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।

নির্ম্মলাই উপযাচক হ'য়ে এবারে সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন। তিনজনকে কাছে বসিয়ে বাটিতে বাটিতে ক'রে সাজিয়ে দিলেন তিনি টাট্‌কা মুড়ি আর পাটালী।

হঠাৎ কি খেয়াল হ'লো বিজনের, একদৌড়ে গিয়ে সাম্‌নের ঘোষেদের দোকান থেকে ছোট এক ভাঁড় দই এনে ঢেলে দিল সে ছন্দা আর রেবার বাটিতে। তাই নিয়েই একটা মহোচ্ছবের হুলুস্থুল।

—'নে, আশ্‌ মিট্‌লো তো এখন!'

রেবা কিম্বা ছন্দার মুখে কিন্তু এবারে একটি কথাও প্রকাশ পেলো না।

মনে মনে নির্ম্মলা বুঝলেন, এ উপলক্ষে অন্ততঃ ছেলের পায়ের ব্যথাটা

কমেছে, নইলে এত সহজে দৌড়ে গিয়ে ঘোষেদের দোকান থেকে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ছুটে এসে এমন হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলা বিজুর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হ'তো না। ব'ল্লেন, 'নাও, এবারে ঘরে গিয়ে ব'সে তোমরা গল্প করো, আমি ততক্ষণে যায়গাটা পরিষ্কার ক'রে নিই।'

ছন্দা ব'ল্লো, 'আমরা থাক্‌তে আপনি কেন পরিষ্কার ক'রতে ব'স্‌বেন মাসীমা!' নির্ম্মলাকে একরকম জোর ক'রেই সরিয়ে দিয়ে নিজের হাতেই ছন্দা নিকোবার কাজে লেগে গেল জায়গাটা।

এসব কাজে রেবা অভ্যস্ত নয়। অনভিজ্ঞতার চোখ নিয়েই নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য ক'রতে লাগলো সে ছন্দার কাজটাকে। পথে এসে ব'ল্‌লো, 'এতও পারিস তুই বাপু!'

চঞ্চল চোখ দু'টোকে একবার তির্য্যকভাবে নিবদ্ধ ক'রলো ছন্দা রেবার মুখের দিকে, ভাবলো—জবাব দেবে না, কিন্তু না দিয়েও পারলো না, ব'ল্‌লো, 'জীবনে তোর মতো আদর পেয়ে তো মানুষ হইনি, সংসারের কাজগুলো নিজের হাতে ক'রতে হয়; এটুকু তাই কিছু নয়।'

এবারে বাধ্য হ'য়েই থেমে যেতে হ'লো রেবাকে।

এর ঠিক দু'দিন বাদেই বিজন আর ছন্দার নিমন্ত্রণ হ'লো রেবাদের ঘরে। উপলক্ষ—তার পুতুলের বিয়ে। চিনেমাটির পুতুল নয়, সেলুলয়েডের বড় ডল্-পুতুল। এই উপলক্ষে সামান্য অঙ্কের বেশ কিছু খরচ হ'য়ে গেল মিসেস্ মল্লিকের। জোর ক'রে ঠেসে ঠেসে খাওয়াল রেবা বিজন আর ছন্দাকে।

না পেরে শেষ পর্য্যন্ত হাত গু'টিয়ে বস্‌লো ছন্দা। বিজন ব'ল্‌লো, 'আমাকে তোর জব্দ ক'রবার ইচ্ছে ছিল, তাই না রেবা?'

মুখ টিপে হেসে রেবা ব'ল্‌লো, 'কিছু একটা বেশী খেলেই বুঝি জব্দ হয় মানুষ! আমার এত ঘটা ক'রে পুতুল বিয়ের খাওয়া, নিজের হাতে সব ক'রে-কম্মে দিয়েছেন মা, জব্দই যদি বলো, খেয়ে না হয় জব্দ একটু হ'লেই!'

কাছেই ব'সে ছিলেন মিসেস্ মল্লিক। তাঁর দিকে লক্ষ্য ক'রেই আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না বিজন। কিন্তু মনে মনে খাবারের তারতম্যটা বড় বেশী বিঁধতে লাগ্‌লো তাকে। তার ঘরে মুড়ি, পাটালী তার দইয়ের অধিক কিছু জোটাতে পারেনি সে, কিন্তু রেবার পুতুল বিয়েতে দইটা আনুসঙ্গিক মাত্র,

তাকে আবৃত ক'রে আছে ক্ষিরপুলি, ছানাবড়া আর কাঁচা সন্দেশ। সংসারে অবস্থার তারতম্যটা হয়তো এম্‌নি ক'রেই ফুটে ওঠে চোখের উপর!

নবগঙ্গার পাড়ে গিয়ে নিজেকে নিয়ে যে কতক্ষণ ব'সে ব'সে কাটালো সে, ঠিক ব'ল্‌তে পারি না। তারপর ঘরে এসে একসময় নীরবে শুয়ে প'ড়লো সে নিজের বিছানায়।

তিন

অবকাশ মতো মিসেস্ মল্লিক এসে ব'সলেন সেদিন নির্ম্মলার সাম্‌নে। গল্পে গল্পে কাট্‌লো কিছুক্ষণ আনন্দে । বিজনের সাড়া না পেয়ে একসময় মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বিজুকে যে দেখ্‌ছি না, খেল্‌তে বেরিয়েছে বুঝি ?'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'ও কি ঘরে থাক্‌বার ছেলে, আছেই তো দিনরাত খেলা নিয়ে। সেদিন পা ফুলিয়ে এসে শুয়ে প'ড়লো, ভাবলাম—তবু দু'দিন ঘরে থাকবে। ও মা, ঘরে থাকবে কি, রাত কাবার হ'তেই আবার তর্‌পানি স্থরু হ'লো। এমন দস্যি ছেলেকে নিয়ে আর পারি না দিদি। বড় হ'য়ে যে ও কি ক'রবে, তাই ভাবচি।'

মৃদু হেসে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বড়র কথা বড় হ'য়ে। এখনই সে ভাবনা কেন ? ওদের ঐ দস্যিপনাটুকু আছে ব'লেই তো মেতে আছি ওদের সঙ্গে, নইলে সময়টুকুও বুঝি আর কাটতো না।'

উত্তর ক'রলেন না নির্ম্মলা।

থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বিজুর শুধু দস্যিপনাটাই দেখ্‌লেন, ওর লেখাপড়ার দিকদাও তো দেখবেন ! প্রত্যেকবার ফাষ্ট হ'য়ে উঠ্‌চে, সোনার টুক্‌রো ছেলে, এমন ছেলে ক'জনের হয় দিদি, ব'ল্‌তে পারেন ?'

এবারও কিছু-একটা উত্তর ক'রলেন না নির্ম্মলা। ছেলের প্রশংসায় মাতৃ-গর্ব্বে আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ, তারপর মৃত স্বামীর উদ্দেশে মনে মনে একবার ব'ল্‌লেন, 'স্বর্গ থেকে তুমি আশীর্ব্বাদ করো তোমার বিজুকে, ও যেন সত্যিই বড় হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, মুখ উজ্জ্বল ক'রতে পারে যেন দেশের !'

ইতিমধ্যে পিছনের খিড়কি দুয়োর দিয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো বিজন।

কৃত্রিম রাগত-কণ্ঠে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'দিনরাত বাইরে বাইরে কেবল টো-টো ক'রে বেড়াবি, ওদিকে যে পরীক্ষার আর বাকী নেই দু'দিনও। শেষ পর্য্যন্ত কি ফেল করাটাই ইচ্ছে ?'

কিছুক্ষণ শান্ত হ'য়ে দাঁড়ালো বিজন, তারপর ব'ল্‌লো, 'ফেল বুঝি কোনোদিন ক'রেছি, সব সময় তুমি শুধু পরীক্ষার খোঁটা দাও। দেখো—এবারও পাশ ক'রবো।'

এবারে আপনি থেকেই স্বর নরম হ'য়ে এলো নির্ম্মলার, জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বলি কোথা থেকে কাটিয়ে এলি এতক্ষণ, বল্ তো ?'

—'কোথায় আবার কাটাতে যাবো !' বিজন ব'ল্লো, 'খেলে ফির্‌ছিলাম ছন্দাদের বাড়ির সাম্‌নে দিয়ে, ডেকে ছন্দা ব'ল্লো—ডোমখুর আর বেতফল খাবে বিজুদা ? আমিই বা ছাড়ি কেন, খেলাম, পকেটে পুরেও নিয়ে এলাম। এই ভ্যাখো—'

পকেট থেকে এক মুঠো ডোমখুর আর বেতফল তুলে মা'র চোখের সাম্‌নে মেলে ধ'রলো বিজন, তারপর মিসেস মল্লিককে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লো, 'খাবেন মাসীমা, খুব মিষ্টি।'

—'না বাবা, মাত্র তো ঐ ক'টা অবশিষ্ট, ও তুমিই খাও।' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'রেবার আবার এসব দিকে একেবারেই ঝোঁক নেই, তার সব চাইতে প্রিয় খাদ্য পাকা খেঁজুর। কর্ত্তা তাই মাঝে মাঝে নিয়ে আসেন বাজার থেকে।'

শুনে জিভে হয়ত একবার জল এলো বিজনের ! ব'ল্লো, 'পাকা খেজুর তো, ও আমিও ভালোবাসি মাসীমা। এবারে রেবাকে ব'লে দেবো, হাতে এলেই আমি যাতে দু'টো পাই।'

নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'লোভ বেড়ে যাচ্ছে বড্ড দিন দিন, তাই না ? যাও, এবারে হাত-পা ধুয়ে প'ড়তে বসো গে, যাও।'

তিলমাত্র আর সেখানে না দাঁড়িয়ে এবারে সোজা এসে বিজন নিজের পড়ার জায়গায় ব'সে প'ড়লো ; ব'সে প'ড়লো বই নিয়ে নয়, অবশিষ্ট ডোমখুর আর বেতফলগুলো নিয়ে। বেশ লাগছে একটা একটা ক'রে রসিয়ে রসিয়ে চিবোতে। টক আর মিষ্টিতে মিলে বেশ একটা অপূর্ব্ব রসাস্বাদন।...

কথাপ্রসঙ্গে একসময় খানিকটা দুঃখের ছায়া নেমে এলো ছন্দাকে নিয়ে। রেবা আর বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক সময়ই এ প্রসঙ্গ এসে পড়ে, আজও এলো।—ছন্দার উপর অঞ্জনার অহেতুক অত্যাচার দিনে দিনে ক্রমেই ভারী হ'য়ে উঠছে। অঞ্জনার নিজের মেয়ে সবিতাও ছন্দার বয়সী, পাটরাণীর মতো সেও এটা ওটা নিয়ে ফাই-ফরমাস করে ছন্দাকে, মাঝে মাঝেই মিথ্যে লাগিয়ে মার খাওয়ায় তাকে মায়ের হাতে। নিজের মেয়ে আর দূর সম্পর্কিত দেবরের মেয়ের মধ্যে পার্থক্য টেনে নিজের মধ্যে অনবরত জ্ব'লে ওঠেন অঞ্জনা। অনেক সময়েই রসিকলালের কান পর্য্যন্ত গিয়ে তা পৌঁছায় না। অঞ্জনা

জানেন—স্বামীর কাছে নিজের মেয়ের চাইতে ছন্দার আদরটা অনেকখানিই বেশী। এখানে আরও বেশী বিক্ষোভ অঞ্জনার। এই নিয়ে কথা শোনাতেও ছাড়েন না তিনি রসিকলালকে। অথচ রসিকলাল কিন্তু তাঁর বহির্ব্বাটিতে একেবারেই নীরব, নির্ব্বিকার। এসব কথা জানাজানি হ'য়ে গেছে বৈকি মিসেস মল্লিক আর নির্ম্মলার মধ্যে।

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে পারি না, দুঃখে বুক ফেটে যায়। এ বয়সে ছেলেমেয়েদের কত সাধ-আহ্লাদ থাকে, সেদিক থেকে মেয়েটার যে কতবড় দুঃখের জীবন, তা ভাবতে পারি না দিদি।'

মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'মেয়ে মানুষও তেমনি বটে ওর কাকিমা। বলি, তুমিও তো ক'ছেলে-মেয়ের মা, মায়ের প্রাণে কি এতটুকুও বাজে না?'

—'তবে আর দুঃখ ছিল কি!' নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'অঞ্জনা কি মানুষ, পাথর—পাথর—একেবারেই পাথর, দিদি।'

যখন এ বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল অঞ্জনার, আনুপাতিক বয়সের হিসেবে সেই থেকে তাঁকে নাম ধরেই ডেকে এসেছেন নির্ম্মলা; আজ যাতায়াতের পালা আপনি থেকেই একরকম শেষ হ'য়ে এসেছে। রুচিতে মেলে না ব'লে নির্ম্মলাও বড়-একটা গা মাখান নি, মনের সঙ্গে মিশ খায়না ব'লে অঞ্জনাও ধীরে ধীরে আসা কমিয়ে দিয়েছেন। তাতে অঞ্জনা বেঁচেছেন কিনা বলা শক্ত, তবে মনে মনে নির্ম্মলা বর্ত্তে' গেছেন অনেকখানি।

স্বল্পকাল থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সেদিন শুনলাম, সারাদিন খেতে দেয়নি ছন্দাকে। বিকেলে রেবার সঙ্গে এসেছিল খেল্‌তে, কচি মুখখানি শুকিয়ে চুপ্‌সে গেছে। জিজ্ঞেস ক'রলাম—কি হ'য়েছে রে ছন্দা? ব'ললে—কাকিমা মেরেছে। পরে রেবার মুখ থেকে সব শুন্‌তে পেলাম। একবাটি দুধ এনে মুখের সাম্‌নে তুলে ধ'রে ব'ল্‌লাম, এটুকু খেয়ে নে তো মা! লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা। ভাবি কি দিদি জানেন, অমন ডাকসাঁইটে কাকিমার সংসারে এমন লজ্জা নিয়ে ক'দিন বাঁচবে মেয়েটা!'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'যে ক'দিন ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন সংসারে।'

ততক্ষণে বিজন তার বাংলা পাঠ্য খুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে প'ড়তে সুরু ক'রে দিয়েছে। অভিনয়ের মতো একটা বিশেষ সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠচে তার অপটু কণ্ঠের মধ্যে:

'ভগবানের অমোঘ নিয়মে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। তিনি সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, সংহার করিতেছেন। তিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। জীব-জগতের তিনিই জীবন দিয়াছেন, আবার ধ্বংস করিতেছেন। আপন লীলায় লীলাময় তিনি; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বশক্তিমান।...'

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে চারদিক আচ্ছন্ন হ'য়ে আস্‌ছিল। তার মাঝে নির্ম্মলা আর মিসেস্ মল্লিকের বেশ লাগছিল বিজনের পাঠ্য বিষয়ের সমুচ্চ উচ্চারণ। ভগবানের প্রতি অচল বিশ্বাসে দু'জনেরই হৃদয় পূর্ণ। সন্ধ্যার এই স্তিমিত আভায় বিজনের উদাত্ত এই ঈশ্বর-উচ্চারণ তাই কেমন যেন খানিকটা মুগ্ধ আবেশে আবিষ্ট ক'রে তুল্‌ছিল তাঁদের। কথা রেখে অনেকক্ষণ ব'সে তাই দু'জনে নীরবে শুন্‌লেন, পরে একসময় বিদায় নিয়ে উঠে যেতে যেতে মিসেস মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'একটু আগে না বকছিলেন বিজুকে, কেমন সময়নিষ্ঠ দেখুন তো, তেম্‌নি কি চমৎকার উচ্চারণ-ভঙ্গী! দেখ্‌বেন—বিজু আপনার কত বড হয় জীবনে!'

নির্ম্মলা কিছু একটাও আর উত্তর ক'রলেন না, মনে মনে শুধু আর-একবার ব'ললেন, 'একথা যেন সত্য হয় ভগবান।' তারপর উঠে তুল্‌সীমঞ্চ থেকে ঘুরে এসে সন্ধ্যা-আহ্নিকের যোগাড়ে ব'স্‌লেন।

এম্‌নি ক'রেই সময়ের কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছিল, নিঃশেষ হ'য়ে আস্‌ছিল দেয়ালপঞ্জীর দিনগুলো একটি একটি ক'রে।...

তখন বিজনদের স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হ'চ্চে।

বিকেলের দিকে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে বুড়িগঙ্গা না কি একটা খেল্‌ছিল ছন্দা আর রেবা।

একসময় বিজন এসে ব'ল্‌লো, 'কাল খুব ভোরে ভোরে উঠে আমাকে দু'জনে তোরা দু'ছড়া মালা গেঁথে দিবি, মাষ্টারমশাইকে দেবো। ক্লাসের সবাই মালা নিয়ে আসবে, আমি নিয়ে যেতে না পারলে কি মান থাকৃবে!'

দু'হাত কোমরে রেখে গ্রীবা বেঁকিয়ে রেবা ব'ল্‌লো, 'ই-স্, কতবড় মানী ব্যক্তিটি দেখি!'

বিজন দৃঢ়নেত্রে একবার তার মুখের দিকে তাকালো মাত্র, জবাব দিল না।

নীরবে ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানালো ছন্দা।

তারপর আবার সুরু হ'লো তাদের খেলা।

কিন্তু পরদিন সকালে উঠে রেবার আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। বিজন দেখলো—গাছের নীচে থেকে প্রচুর ফুল কুড়িয়ে ইতিমধ্যেই ছোটবড় চার পাঁচ ছড়া মালা গেঁথে ফেলেছে ছন্দা। একদিকে খুসীতে বুকখানি যেমন ভ'রে উঠছিল তার, অন্যদিকে মনের কোথায় যেন খানিকটা ব্যথাও অনুভব ক'রতে লাগলো সে। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'রেবা আসে নি বুঝি?'

—'এলে তো দেখতেই পেতে।' ব'লে মুখ ঘুরিয়ে নিল ছন্দা।

—'তা—তুই যে বড় এলি?'

—'এমন আসি তো রোজই।' ছন্দা ব'ল্‌লো, 'রোজ এম্‌নি সময়ে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর আসন সাজাতে হয়।'

—'মালা তো আর গাঁথতে হয় না!'

—'সেটুকু না হয় আজ নতুন হ'লো, কিন্তু না গাঁথলেই ভালো ছিল, তাই না?'

খানিকটা বোকার মতো দৃষ্টিতে তাকালো এবারে বিজন: 'এ-কথা কেন ব'ল্‌লি ছন্দা?'

—'তুমি যে জিজ্ঞেস্ ক'রলে, এলাম কেন?'

—'অম্‌নি রাগ হ'লো বুঝি?' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তোরা মালা গেঁথে না দিলে কোথায় পাবো, বল্ তো? রেবাটার এমন বড়মানুষি গর্ব্ব কোথায় থাকে, দেখবো। ফুল কুড়িয়ে একটা মালা গেঁথে দিলে যেন ওর জাত যেতো, পাজিটা।' পরোক্ষে রেবার উপর খানিকটা তিরস্কার বর্ষণ ক'রে নিল বিজন।

ছন্দা এ-কথার কিছু একটা প্রতিবাদও ক'রলো না, জবাবও দিল না। শুধু দু'পা কাছে এগিয়ে এসে সব চাইতে বড় মালা-ছড়াটি নিজের হাতে রেখে বাকী সবগুলো বিজনের হাতে তুলে দিল

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'ওটা যে বড় দিলি নে?'

—'ই-স্, আহ্লাদ আর ধরে না, সবটাই দেখচি পাবার ইচ্ছে!' থেমে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'ভেবেছ, এটা বুঝি তোমার বুড়ো মাষ্টারের গলায় দেবার জন্যেই গেঁথেছি, আহা আমার সাধ রে!'

—'তা নয় না গেঁথেছিস্, কিন্তু কাকে ওটা দিবি, বল্ তো ?'—বিজনের কণ্ঠে এবারে খানিকটা অনুনয়ের সুর ভেসে উঠ্লো।

পাঁপড়ির মতো পাত্লা ঠোঁটের মধ্যে উদ্গত একটা হাসি গোপন ক'রে নিল ছন্দা : 'সবটাই এত জানবার ইচ্ছে কেন ? যা পেয়েছ, তাই নিয়েই যাও না, ঝুলোও গে তোমার মাষ্টারের গলায়।'

ক্রমশঃই কৌতূহলে সারা মন আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্চে বিজনের। ছন্দার একখানি হাত আলগোছে নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে তেমনি অনুনয়ের কণ্ঠে আবার সে একই প্রশ্ন তুলে ধ'রলো, 'বল্ না লক্ষ্মীটি, কাকে দিবি ওটা ?'

আধো আধো মিষ্টি স্বরে ছন্দা ব'ললো, 'কেন ব'লবো, তুমি আমাকে বলো সব কথা ?'

—'কেন, কি লুকিয়েছি বল্ ?'

—'জানি না, যাও।'

—বাঃ রে মজা, তবু দিলি নে তো মালাটা !' থেমে আবার প্রশ্ন ক'রলো বিজন, 'বল্ না লক্ষ্মীটি, কাকে দিবি ?'

—'কি ছিনেজোঁক রে বাবা !' ছন্দা ব'ল্লো, 'আগে চক্ষু বোজো, তবে ব'লবো।'

চোখ বুজে মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো বিজন, ব'ল্লো, 'বল্ এবারে !'

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিজের হাতের মালাটি এবার বিজনের গলায় পরিয়ে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো ছন্দা : 'বাঃ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে বিজুদা !'

চোখ খুলে বিজন তাকালো একবার নিজের বুকে দোলানো মালাটার দিকে, তারপর ব'ললো, 'ও—এই তবে তোর ইচ্ছে ছিল ?'

উত্তরে কিছু একটাও না ব'লে জিভ কেটে শুধু একবার ভেঙ্চালো ছন্দা।

থেমে বিজন ব'ললো, 'কিন্তু তোর গলাটা যে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে রে, আয়, তোকেও একটা পরিয়ে দি। এতগুলো মালা মাষ্টারকে না দিলেও চ'লবে।'

—'ই-স্, নিজের হাতের গাঁথা মালা আমি পারি না।' ব'লে সহসা খানিকটা দূরে গিয়ে স'রে দাঁড়ালো ছন্দা।

হাত বাড়িয়ে ধ'রতে গেল তাকে বিজন, কিন্তু পারলো না, ততক্ষণে তার হাতের নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ছন্দা।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেল বিজন।

এবারে এক দৌড়ে সোজা গিয়ে উঠ্‌লো ছন্দা নিজেদের ঘরের দাওয়ায়।

পাশে তখন নবগঙ্গার বর্ষাতি বুকে জলকণাগুলি নৃত্যচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

কতক্ষণ ধরে যে ছন্দার গমন-পথের দিকে অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিজন, তা সে নিজেও জান্‌লো না। পরে একসময় সোজা সে স্কুলের পথে পা বাড়ালো। ··

এমনি করেই সময়ের চঞ্চল পদক্ষেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'ল্‌লো দিনগুলো। আবর্ত্তিত বর্ষ-চক্রে উড়ে চ'ল্‌লো ঋতুলক্ষ্মীর বস্ত্রাঞ্চল। নবগঙ্গায় জোয়ারের পর ভাঁটা ·এলো, আবার জোয়ার। সময় কোথাও স্থির নয়, স্থির নয় তেমনি জীবনের গতি। জীবন প্রধাবিত, বিস্তারিত, বিশ্লিষ্ট, বিরামবিহীন তার অগ্রগতি। সেই আগামী মুহূর্ত্তের মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'ল্‌লো সরল সুন্দর তিনটি হাসিভরা জীবন : রেবা, বিজন আর ছন্দা।

চার

ক্রমে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগলো তারা, বাল্য ও কৈশোরকে অতিক্রম ক'রে ক্রমে এসে দাঁড়ালো তারা যৌবরাজ্যের প্রথম দুয়ারে। সামাজিক অনুশাসন ক্রমান্বয়ে ভারী হ'য়ে উঠলো তাদের জীবনে। বাংলার চিরাচরিত গ্রাম্য সমাজের বিধিনিষেধের গণ্ডি, তা থেকে মুক্ত ছিল না মাগুরা ; নবগঙ্গা অনেক জঞ্জাল ধুয়ে নিয়ে গেলেও মানুষের মন থেকে সংস্কারকে মুক্ত ক'রতে পারেনি। সমাজের সেই চিরাচরিত সংস্কার একসময় চক্রায়িত হ'য়ে উঠলো তাদের তিনটি জীবনে। বিজন ব্যাটাছেলে, সমাজের চাইতে বেশী ভয় তার মাকে ; বিধবা হ'লেও অনেকখানি মুক্ত-হৃদয় নির্ম্মলা, কিন্তু মুক্ত-হৃদয় হ'য়েও কি কেউ সমাজমুক্ত হ'তে পারে ? নির্ম্মলাও পারেন নি, বরং পেরেছে অনেকটা বিজন। আর পেরেছে সমাজের গণ্ডি ছাড়িয়ে উঠতে রেবা। ব্রাহ্মঘরের মেয়ে সে, হিঁদুয়ানী সংস্কার তাকে বাঁধতে পারেনি। কিন্তু ছন্দার পক্ষে বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিতে হ'য়েছে শাস্ত্র-সম্মত সমস্ত সংস্কারকে। নিজের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে সে ল'ড়তে পারে মি কিছুর বিরুদ্ধে। কাকিমার সংসারে পল্লবগ্রাহী পরগাছার মতো জীবন তার। সমাজ এসে প্রতিমুহূর্ত্তে কাকিমার চোখের মধ্য দিয়ে উঁকি দেয় আজ তার দিকে। ছোট বেলার দিনগুলোর মতো আজ আর ইচ্ছে-খুসী মতো চ'লে-ফিরে বেড়াতে পারে না সে। নিজের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে নিজেই শিউরে ওঠে ছন্দা। তার জীবনে এ আজ কিসের পরিবর্ত্তন ?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তেমন একটা পরিবর্ত্তন রেবার জীবনেও এসেচে বৈ কি ! তবে সে-পরিবর্ত্তন ছন্দার মতো তাকে সঙ্কোচে বিহ্বল করে নি, বেশে-পারিপাট্যে বরং আরও অনেকখানি মার্জ্জিত হ'য়ে উঠেছে রেবা।

মাঝখানে অচঞ্চল হিম-গিরির মতো দাঁড়িয়ে আছে বিজন। মনের একদিকে তার রেবা, আর-একদিকে ছন্দা। খেলাঘরের প্রথম দিন থেকে কবে না-জানি নিজের অজ্ঞাতসারেই বিজন নিজের মনের সঙ্গে গেঁথে নিয়েছিল এ দু'টি হৃদয়কে একান্ত ভাবে ! কেমন একটা মিষ্টি সুর আর মধুর ছন্দে এতদিন ভরা ছিল সেই জীবনটা। আজ চারদিকে তাকিয়ে বড় নিঃস্ব, বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে দিনগুলো। খেলা-ঘরের দিনগুলো আজ শুধু অতীতের

স্মৃতি হ'য়েই মনে ভাসে। কেমন ছাড়া-ছাড়া, কেমন যেন অসংলগ্ন আজ সব কিছু। ইচ্ছে ক'রেও আজ আর দু'দণ্ড বেশী ব'সে গল্প ক'রবার অবকাশ নেই ছন্দা কিম্বা রেবার সঙ্গে। কেমন যেন বাধো-বাধো ভাব, কেমন যেন সঙ্কোচ আর চকিত লজ্জা! মনে মনে অনুভব করে বিজন, কিন্তু হৃদয় সায় দেয় না।

এদিকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তার ভালোভাবে উত্তীর্ণ হবার সংবাদ বেরোলো। উদ্যোগ ক'রলো এবারে সে দৌলতপুর কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হ'তে।

একসময় রেবা এসে ব'ল্‌লো, 'তোমার কাছে খেতে চেয়ে মুখ হারাবো না। তোমার পাশের খবর যথাসময়েই মার কানে গিয়ে পৌঁছেচে, সন্ধ্যায় তোমার নেমন্তন্ন রইল আমাদের বাড়িতে।'

রেবার দিকে মুখ তুলে আজ কেন যেন 'তুই' ব'লে তাকে সম্বোধন ক'রতে পারলো না বিজন, কৌতুহলোদ্দীপ্ত চোখ দু'টি তুলে ধ'রে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আজ তবে পেট ভ'রে মিষ্টি খেতে পাচ্ছি মাসীমার হাতে, তাই না?'

—'তা আমি কি জানি, যেয়ো তো, সে মা বুঝবেন।' ব'লে মুখ টিপে হাসলো রেবা।

এমন সুন্দর হাসি এর আগে কোনোদিন দেখবার অবকাশ হয় নি বিজনের। মুখ টিপে হাসির মধ্যেও মানুষের এত লাবণ্য স্পষ্ট লক্ষ্যে পড়ে!

সন্ধ্যায় গিয়ে সত্যিই সে মিসেস মল্লিকের হাতে পেট ভ'রে মিষ্টি খেয়ে এলো।

শুভকামনা জানিয়ে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'দীর্ঘজীবী হও, কৃতকার্য্য হও জীবনে! আজ তোমার মার কত বড় সুখের দিন, ভেবে দেখ তো বিজন!'

বিজন কি উত্তর দেবে, ভেবে পেলো না।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বড় হ'য়ে মার দুঃখ ঘোচাবে বিজু, এই আশাতেই যে দিনরাত বুক বাঁধছেন তিনি।'

মল্লিক দম্পতির আলোচনার মধ্যে একসময় উঠে প'ড়লো বিজন।...

নির্ম্মলার হাতেও রেবা আর ছন্দার মিষ্টি-যোগটা একেবারে ফাঁকা গেল না।

নিভৃতে একসময় কাছে এসে ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তুমি নাকি কলেজে প'ড়বার জন্যে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছো বিজুদা?'

—'না যেয়ে উপায় কি বল্? লেখাপড়া শিখ্‌তে হবে তো!' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'আজ যদি আমাদের এ মহকুমায় কলেজ থাকতো, তবে কি আর ঘর ছেড়ে ন'ড়তাম!'

কেন যেন বহুক্ষণের মধ্যে এবারে কিছু একটাও আর ব'লতে পারলো না ছন্দা, একটা অব্যক্ত বেদনায় চোখ দু'টি শুধু ছল্ ছল্ ক'রতে লাগলো।

দৃষ্টি এড়াল না সেটুকু বিজনের। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে পরে একসময় ব'ল্‌লো, 'আমি চ'লে গেলে তোর খুব কষ্ট হবে, না রে?'

অস্ফুট কণ্ঠে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'না, কষ্ট কিসের!' তারপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে বিজনের পাশ থেকে স'রে গেল সে।

স'রে গেল সে শুধু নিজেকে না সামলাতে পেরে। তার খেলাঘরের জীবন থেকে শুরু ক'রে পরম আত্মীয় ব'লে ভেবে এসেছে সে বিজুদাকে। বিজুদার সান্নিধ্যে তার পরম শান্তি, নির্ম্মলার মতো মাসীমার স্নেহের মধ্যে তার প্রতি দিনের সকল কাজের সকল উৎস। এঁদের সান্নিধ্য ভিন্ন তার ব্যথাহত জীবনে সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? তার আকাশ যখন কালো মেঘে ঢেকে যায়, তখন যে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় বিজুদা আর মাসীমা নির্ম্মলা। বিজন চ'লে যাবে শুনে অবধি মনের মধ্যে কেমন যেন একটা তীব্র অশ্বস্তি পোড়া বালির মতো ধিকি ধিকি জ্ব'ল্‌ছিল, নিভৃতে এসে একসময় তা অশ্রু হ'য়ে ঝ'রে প'ড়লো।

বিষণ্ণতায় নির্ম্মলার মনও কম অস্থির ক'রছিল না। সারা ঘরের একমাত্র অবলম্বন তাঁর বিজন। সে চ'লে গেলে একা ঘরে তিনিই বা কী নিয়ে থাক্‌বেন? তাই বিজন যখন অনুমতি চেয়ে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো, ছেলের ভবিষ্যৎ কল্যাণের সমস্ত-কিছু বুঝেও মত দিতে গিয়ে অশ্রুতে দু'চোখ ভ'রে উঠলো নির্ম্মলার।

প্রবোধ দিয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'মিছেমিছি এম্‌নি ক'রে চোখের জল ফেলে আমাকে বাধা দিওনা মা। উচ্চশিক্ষা লাভ ক'রে একদিন তোমার মুখ উজ্জ্বল ক'রবো, এই আশা নিয়েই তো যাচ্ছি মা! আশীর্ব্বাদ করো আমি যেন কৃতকার্য্য হ'য়ে ফিরতে পারি! তোমার আশীর্ব্বাদ যে আমার জীবনের অক্ষয়-কবচ মা! হাসিমুখে তোমার পায়ের ধূলো দাও আমার মাথায়।'

নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদের স্নেহকর প্রসারিত ক'রলেন নির্ম্মলা বিজনের মাথায়,

তারপর স্বভাবজাত কণ্ঠে আর-একবার উচ্চারণ ক'রলেন তিনি স্বামীর উদ্দেশে : 'তুমি যে-লোকেই আজ থাকো না কেন, আশীর্ব্বাদ করো তোমার বিজুকে।'

মিথ্যে আর কালবিলম্ব ক'রলো না বিজন। নবগঙ্গার ঘাটে নৌকো বাধা ছিল। মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে একসময় গিয়ে ব'স্‌লো সে নৌকোয়। গলায় কি একটা ভাটিয়ালী সুর ভেঁজে তীর ছেড়ে মাঝগাঙে এসে বৈঠা ধ'রলো মাঝি। তীরে দাঁড়িয়ে নীরবে বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু গোপন ক'রে নিলেন নির্ম্মলা। সে অশ্রু বিজনের চোখেও কম বইল না। খেলাঘরের প্রথম জীবন থেকে আজ পর্য্যন্ত একে একে সমস্ত কথা মনে প'ড়ে কেবলই আলোড়িত ক'রে তুল্‌তে লাগলো তাকে। কেউ তা দেখলো না, কেউ তা জানলো না, শুধু তার মনের কথা দীর্ঘশ্বাস হ'য়ে নবগঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ব'য়ে গেল।...

পাঁচ

ক্বচিৎ কখনো সুযোগ পেলেও ইদানীং আর আগেকার মতো মাসীমা নির্ম্মলার কাছে এসে দু'দণ্ড ব'সে যেতে কেন যেন মনের দিক দিয়ে বড়-একটা সাড়া পায় না ছন্দা। বর্ষা-শেষে শুক্‌নো চরের মতো একেবারে খাঁ খাঁ করে এদিকটা। বিজুদা আজ গ্রাম-ছাড়া, একথা ভাবতেও যেন মনটা কেমন বিষিয়ে ওঠে! মাসীমা নির্ম্মলার স্নেহ—প্রতিমুহূর্ত্তে তা মায়ের মতো ক'রে আকর্ষণ করে তাকে, সে স্নেহটুকু ছাড়া তার বাঁচা কঠিন। অথচ বিজুদার অভাবে আজ মাসীমার স্নেহটুকুও যেন কেমন অতি দূরের ব'লেই মনে হয়।

মাঝখানে রেবা এসে দিন দু'য়েক ঘুরে গেছে। শূন্য ঘরের বিষাদে ভরা নিজের অদৃষ্টকে যতখানি সম্ভব তুলে ধ'রেছেন নির্ম্মলা তার কাছে: 'চেষ্টা ক'রছিস বুঝি মাসীমাকে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে, মা ?'

—'না মাসীমা, ভুল্‌বো কেন, এই তো এলাম!' ব'লে নিজেকে কতকটা গোপন ক'রে নিয়েছে রেবা: 'আজকাল বড় হ'য়েছি বলে মা ইচ্ছে খুসী মতো আমাকে দিয়ে যখন তখন কাজ করিয়ে নেয়। সময় যে কোথা দিয়ে চ'লে যায়, কিছুই বুঝতে পারি নে।'

—'তবু ভালো যে দিদির দুঃখ এত দিনে ঘুচলো।' নির্ম্মলা বলেন, 'তবু তার মধ্যেই কি ইচ্ছে থাক্‌লে সময় হয় না একবারটি এসে ঘুরে যেতে? তোরা ছাড়া এ শূন্য পুরীতে আজ আর আমার কে আছে, বল্ তো মা?'

এবারে জবাব দেওয়া শক্ত হয় রেবার পক্ষে। কিছুক্ষণ এ-কথায় সে-কথায় কাটিয়ে একসময় আবার বাড়ির পথ ধ'রেছে সে।

দিনগুলি আবার তেমনি নিঃসঙ্গতায় ভ'রে উঠেছে নির্ম্মলার। ক্বচিৎ-কখনও মিসেস মল্লিক এসে দু'দণ্ড গল্প ক'রে যান, সপ্তাহেও তা একবার হবে কি না সন্দেহ। চেষ্টা ক'রে নিজেকে প্রশমিত ক'রতে হয় নির্ম্মলাকে।

সেদিন বিকেলের দিকে কাকিমার চোখ এড়িয়ে একসময় ছন্দা এসে দাঁড়ালো নির্ম্মলার সাম্‌নে। ব'ল্‌লো, 'বিজুদার খবর কি মাসীমা, কুশলে আছে তো, অসুবিধে হ'চ্ছে না তো কিছু? আমার কথা বুঝি কিচ্ছুটি লেখেনি চিঠিতে?'

—'লেখে নি কি রে পাগলি, তোদের ছেড়ে গিয়ে একটা মুহূর্ত্তও ওখানে

মন টিক্‌ছে না বিজুর, কত ক'রে লিখেছে। তুই তো দিনান্তেও একবারটি এ মুখো হবি নে, জানবি কি ক'রে?' ব্যথাকাতর চোখ দু'টি একবার তুলে ধ'রলেন নির্ম্মলা ছন্দার দিকে।

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'এ অনুযোগ যে সইতে হবে, জানতুম মাসীমা। কিন্তু কেন যে আসতে পারি না, সেটুকুও তো বুঝতে পারেন! এমন অদৃষ্ট ক'রে আসিনি যে, দু'দণ্ড এসে আপনার কোলে মুখ লুকিয়ে শান্তি নিয়ে ঘরে ফিরবো।'

এবারে স্বল্পক্ষণের জন্য থামলেন নির্ম্মলা, তারপর ব'ল্‌লেন, 'হ্যাঁরে, কাকা তোর কিছু বলেন না?'

—'কাকাকে কিছু ব'লবার মতো সুযোগ দিলে তো কাকিমা!' ব্যথাহত কণ্ঠে ছন্দা ব'ললো, 'কাকাকে বড় একটা দেখা যায় না বাড়ির ভিতরে, এক খাবার সময়ে এসে নীরবে খেয়ে উঠে চ'লে যান।'

—'অন্তরে তাঁরও দুঃখ কম নয়। শান্তি পেলেন না জীবনে ভদ্রলোক।' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'ধন্যি মেয়েমানুষ তোর কাকিমা, অমন শিবের মতো স্বামী পেয়েও তাঁর মনে একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও শান্তি দিতে পারলো না।'

বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'মাঝে মাঝে তাই ভাবি মাসীমা, নিজের সংসারে যেখানে কাকাই জীবনে সুখী নন্‌, আমি সেখানে কোন্‌ ছাড়।'

—'তাই ব'লে সংসারে একটি মানুষ শুধু অত্যাচার ক'রেই যাবে, তার কোনো প্রতিকার নেই?'

—'নেই কেন মাসীমা, আছে। এ সংসার থেকে বিদেয় হয়ে যেতে পারলেই প্রতিকার, তার আগে নয়। তা যাক্‌ গে।' থেমে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'বিজুদার কথা বলুন মাসীমা। খুব শীগগিরই আবার ফিরে আসচে তো বিজুদা?'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'খুব শীগগির আর কোথায়? সাম্‌নে পূজোর ছুটি, তার আগে কি আর বিজু আস্‌তে পারবে!'

—'এবারে আপনি যেদিন চিঠি লিখবেন, আমিও কিন্তু দু'কলম লিখে দেবো সেই সঙ্গে, মনে থাকবে তো মাসীমা?'

—'আমি কবে লিখবো আর তুই কবে আসবি, তার কিছু ঠিক আছে।' নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'পারিস তো কাল সকালেই দিয়ে যাস্‌ দু'কলম লিখে, পেয়ে খুসীই হবে বিজু।'

কিন্তু পরদিন সকালে এসে আর বিজুদাকে চিঠি লেখা হ'লো না ছন্দার। নির্ম্মলার কাছ থেকে উঠে যখন সে ঘরে ফিরলো, সন্ধ্যার আবছায়ায় তখন চারদিক ভ'রে উঠেছে। ঘর থেকে বেরোবার সময় কাকিমার চোখে পড়ে নি সে, কিন্তু ফিরে এসে ঘরে দাঁড়াতেই এক অনর্থ ঘটলো। সাম্‌নে এসে অঞ্জনা একেবারে ফেটে প'ড়লেন : 'বলি, এই ভর সন্ধ্যায় কোথা থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরলি? ঘর-সংসারের কাজ কি এর মধ্যেই মিটে গেল! একটু চোখের আড়াল হ'য়েছি কি অম্‌নি স্বুর-স্বুর ক'রে ঘর ছেড়ে পাড়া বেড়াবার ধুম প'ড়ে যায় মেয়ের! বলি, বুনো বাগ্দীদের মতো যদি অত পাড়ায় পাড়ায় বেড়াবারই সখ, তবে ঘর ছেড়ে পথেই যা না, আমিও নিশ্চিন্তি হই, তুইও বাঁচিস! ধিঙ্গী মেয়ে হ'য়েছে, এখনও লজ্জাসরমটুকু পর্য্যন্ত হ'লো না। এদিকে সারা বাড়ি চেচিয়ে মরে' মন্দের ভাগী হই আমি।'

মাথা নীচু ক'রে নিজের কাজে গিয়ে মন দিল ছন্দা। টু-শব্দটি পর্য্যন্ত ক'রলো না। কিন্তু আত্মগ্লানিতে নিজের মধ্যে একেবারে ভেঙে প'ড়লো সে। নিশ্চিত বুঝে নিল ছন্দা—বিজুদাকে ঘরে ব'সে হয়তো চিঠি লেখা সম্ভব, কিন্তু মাসীমা নির্ম্মলার হাতে গিয়ে তা পৌঁছে দিয়ে আসা আদৌ সম্ভব নয়। সকালে উঠে তাই ব'লে চেষ্টার ত্রুটি করেনি সে, কিন্তু যখন দেখলো—খাড়া প্রহরীর মতো অনবরত কাকিমা তার চোখের সাম্‌নে দিয়ে ঘুরচেন, তখন সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে মনে মনে শুধু একবার উচ্চারণ ক'রলো সে : 'আমার কোনো কিছুই তো তোমার জান্‌তে বাকী নেই বিজুদা, চিঠি দিতে পারলুম না ব'লে তুমি যেন চিঠি দেওয়া বন্ধ কোরো না!'

ততক্ষণে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে আবার কি একটা নিয়ে ফেটে প'ড়েছেন অঞ্জনা।

সেদিকে কান না দিয়ে নীরবে আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেল ছন্দা।

ছয়

মাঝখানে বার দু'য়েক চিঠি এসেছে বিজনের। তাতে দূরে গিয়ে মার জন্য কষ্টটাই ফুটে উঠেছে বিশেষ ক'রে। তা-ভিন্ন আর একটা অভাবও একেবারে প্রচ্ছন্ন নয়। চিঠির এখানে ওখানে বার বার ক'রে উল্লেখ র'য়েছে রেবা আর ছন্দার। সাথীহীন একাকীত্বের মধ্যে দিনগুলি যে কতখানি দুঃখে কাটছে বিজনের, মা হ'য়ে নির্ম্মলার কাছে সেটুকু অজ্ঞাত নয়। নিজের মনে দুঃখ পাওয়া ভিন্ন আজ আর কিছু ক'রবার নেই তাঁর। কিন্তু এর বাইরেও আশ্বস্ত হবার মতো কিছু সংবাদ ছিল চিঠিতে। হোষ্টেলে সিট পেয়ে সুস্থ মতো বস্‌তে পেরেছে বিজন, পড়াশুনো গোড়া থেকেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চ'লেছে, তার সঙ্গে চেষ্টা চ'লেছে কিছু একটা ট্যুইশনি পাবার।

সেদিন মিসেস্ মল্লিক বেড়াতে এলে এ-কথা সে-কথায় টুক্‌রো-টুক্‌রো নানা আক্ষেপের সুর তুলে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'ওখানে গিয়ে ছেলের আমার বুদ্ধি হ'য়েছে, যাই বলুন দিদি। নিত্যদিনের অভাবের সংসার থেকে কিছু গিয়ে যে তার হাতে পৌঁছাবে না, একথা বিজু ভালোভাবেই জানে, চেষ্টা ক'রছে তাই কাছে-পিঠে কোনো ছেলে পড়িয়ে ওখানকার খরচটা তুলে নিতে। মন্দ কি!'

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'অত পরিশ্রম কি ওর সইবে? কোনোদিন তো কষ্ট ক'রতে হয়নি জীবনে, হঠাৎ এমন কষ্টের মধ্যে প'ড়ে পড়াশুনোর তো ক্ষতি হবে না বিজুর?'

—'না, না, ক্ষতি কেন হবে!' একান্ত আশ্বস্ত চিত্তেই নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'কত ছেলে ওর চাইতেও কত কষ্ট ক'রে পড়ে, তাদের কি আর লেখাপড়া হয় না! আপনাদের শুভেচ্ছায় ওর কোনো কষ্টই গায়ে লাগবে না।'

মিসেস মল্লিক এবারে চুপ ক'রে গেলেন।

থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'আমারও হ'য়েছে তেম্‌নি অদেষ্ট দিদি, মাত্র তো মুঠোখানেক জমি, কর্ত্তা বেঁচে থাক্‌তে চাষিরা ফসল আর খাজনা মিটিয়ে দিতে দেরী করে নি। আজ খবর দিয়ে পর্য্যন্ত তাদের ডেকে পওয়া ভার। খাজনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, দু'দানা ফসলের পর্য্যন্ত আজ আর মুখ দেখতে পাই না। এই যদি অবস্থা হয়, তবে কি ক'রে সংসার চালাই, বলুন তো?'

সমবেদনা জানিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'সংসারে ব্যাটাছেলে না থাকলে যা হয়। চাষি তাড়িয়ে বেড়ানো কি মেয়েদের কাজ! বিজু এসে নিজের চোখে সব দেখাশোনা ক'রলেই এ সমস্যা আর থাক্‌বে না। তখন দেখবেন দু'বেলা চাষিরা এসে আবার দুয়োরে ঘষটাবে।'

—'কিন্তু সমস্যা তো তাতে ঘুচলো না!' নির্ম্মলা ব'ললেন, 'আজই যদি বিদেশে থেকে বিজুকে কষ্ট ক'রতে হ'লো, তবে ভবিষ্যতের সুখ দিয়ে আমার কি হবে?'

—'বিজুর জীবনে তার প্রয়োজন আছে। আজকের জীবনের বাইরে যে তার অনন্ত কাল প'ড়ে র'য়েছে, সেটুকুও তো ভেবে দেখবেন!' উঠে বিদায় নিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি; মাথার উপর ভগবান আছেন, তিনিই চালিয়ে নেবেন, দুঃখ ক'রে মানুষ কতটুকু কি ক'রতে পারে।'

সত্যিই পারে না, নিজের ইচ্ছায় কিছুই ক'রতে পারে না মানুষ। ভগবান ভিন্ন অক্ষম হৃদয়ের নির্ভরতা এ পোড়া সংসারে সত্যিই কি কোথাও আছে! যুক্ত হাত কপালে স্পর্শ ক'রে সেই ভগবানের উদ্দেশেই একবার প্রণাম জানালেন নির্ম্মলা, তারপর উঠে সম্ভবতঃ কিছু একটা কাজের উদ্দেশ্যেই কোথায় একদিকে চ'লে গেলেন।···

চোখের উপর দিয়ে বর্ষার মেঘ গড়িয়ে গেল। আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবনের পর এলো ভাদুরে ধারা। দু'কুল ছাপিয়ে উছলে প'ড়লো নবগঙ্গা। গ্রামের সব চাইতে ভীষণ এবং সাহসী পুরুষ হরি মুখুজ্জে পাড়া চড়িয়ে বেড়ান নানা কথার সূত্র টেনে। তিনিই একসময় রটালেন—এবার নাকি বান ডাকবে নবগঙ্গায়। শুনে ভয়ে ত্রাসে বুকখানি একবার দুর্ দুর্ ক'রে উঠলো নির্ম্মলার। এখনি নদীর যা অবস্থা হ'য়েছে, এরপর বান ডাক্‌লে বাস্তু-ভিটেটুকুও আর রক্ষা করা যাবে না। এতদিনের বাড়ুয্যে পরিবারের সমস্ত স্মৃতিটুকুই তবে একদিনে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

কিন্তু যত বড় গলা ক'রে হরি মুখুজ্জে কথাটা রটালেন, ঠিক তত বড় ক'রে শেষ পর্য্যন্ত আর নবগঙ্গাকে প্রসারিত হ'তে দেখা গেল না। কিছুকাল ঘরে ব'সে গড়গড়াতে তামাক টেনে নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে দিলেন তিনি। ধীরে ধীরে জল ক্রমে স'রে গিয়ে শরতের স্বচ্ছ নীলাঞ্জনকে আহ্বান জানালো নবগঙ্গা।

শারদীয়ার সমারোহে চারদিক মুখরিত হ'য়ে উঠলো। কলেজের ছুটি হ'লে একটা দিনও আর অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। সোজা রওনা হ'য়ে এলো সে বাড়িতে। ইচ্ছে ছিল—দৌলতপুর বাগেরহাট ঘুরে রেবা আর ছন্দার জন্য ভাল কিছু উপহার কিনে নিয়ে আস্‌বে সঙ্গে: শারদীয় উপহার। কিন্তু তবিল হাতড়ে দেখলো—শূন্য। যা আছে, উপহার কেনা তো দূরের কথা, পথ-খরচার পক্ষেই যথেষ্ট নয়। মুহূর্ত্তের জন্য একবার বিষণ্ণতায় সমস্তটা মন তার ভ'রে উঠলো। মনের এই সামান্য সাধটুকু'ও মেটাবার মতো তার অবস্থা নয়। বড় দুঃখে একবার ধিক্কার দিল সে নিজের অদৃষ্টকে। শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গে নিয়ে এলো দু'জনের জন্য দু'খণ্ড কলেজ-ম্যাগাজিন। বিজনের একটি সদ্য রচিত কবিতা বেরিয়েছে তাতে। জীবনের ব্যথা-বেদনাকে কেন্দ্র ক'রে কবিতাটি রচিত। উপহার হিসেবে এই বা একেবারে তুচ্ছ কি! জীবনের প্রথম রচনা নিজের হাতে উপহার দিচ্ছে সে, পৃথিবীর অনন্ত সম্পদের মধ্যে এ-ই কি কিছু কম?

মাকে এসে আবৃত্তি ক'রে শোনাতে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'এ ভাব তুই পেলি কোত্থেকে বাবা?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'কেন, তোমার কাছ থেকে, তোমার চোখের জলের মধ্যেই যে আমার কাব্যের উৎস লুকিয়ে আছে মা! প্রফেসারেরা খুব প্রশংসা ক'রেছে কবিতাটার। মনে হ'চ্ছে—চেষ্টা ক'রলে ভবিষ্যতে আমি খুব ভালো সাহিত্যিক হ'তে পারবো। কেমন, পারবো না মা?'

—'কেন পারবি নে বাবা, নিশ্চয়ই পারবি।' অলক্ষ্যে নিজের মধ্যে একটা আনন্দের নিঃশ্বাস চেপে নিলেন নির্ম্মলা।

ম্যাগ্যাজিন নিয়ে যখন রেবা আর ছন্দার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বিজন, তখন দেখা গেল—বাজারের কেনা উপহারের চাইতে বিজনের উপস্থিতিতে তার কবিতাটাই বিশেষভাবে মর্ম্মস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে।

বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'তুমি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে শিখলে কবে থেকে বিজুদা?'

মুচকি হেসে বিজন বল্‌লো, 'খেলোয়ার হ'য়ে শুধু মেডেল জিতে আন্‌তেই দেখেছিলি, খাতা খুলে কবিতা দেখবার তো কোনোদিন অবকাশ হয় নি, জান্‌বি কি ক'রে?'

—'এতদিন তবে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখতে, বলো?'

এ-কথার জবাব না দিয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'এবারে দিলুম তো অবাক ক'রে!'

—'তা ক'রলে বটে।' ব'লে একবার মুগ্ধ হাসি হাসলো রেবা।

ছন্দা কিন্তু কবিতার কথাটা একেবারেই উল্লেখ ক'রলো না। বিজনের মুখের উপর স্থির দৃষ্টিটুকু একবার তুলে ধ'রে শুধু ব'ল্লো, 'এতদিনে তবে দেশের কথা তোমার মনে প'ড়লো বিজুদা? এতদিনও মানুষ দেরী করে?'

—'ছুটি না হ'লে কলেজ-পালিয়ে এলে যে পার্সেণ্টেজ কাটা যায়, তাও কি জানিস্ নে বোকা? ছুটি হ'লে কি একটা দিনও দেরী ক'রেছি?

'পার্সেণ্টেজ শব্দটা একেবারেই নতুন ছন্দার কাছে, তবু সে আভাসে এটুকু বুঝে নিল যে, কলেজ কামাই ক'রলে কিছু একটা ক্ষতি হ'তো বিজুদার, এবং সে ক্ষতিটা নিতান্তই কম নয়। ব'ল্লো, 'কতদিন ভেবেছি চিঠি দিই, মাসীমাকেও ব'লেছি কতবার, কিন্তু সংসারের যাঁতা-কলে ঘুরে একটা দিনও কি ছাই পেরেছি কাগজ কলম নিয়ে ব'সতে! একটুও তাতে শান্তি পাই নি বিজুদা।'

উত্তরে কিছু একটাও না ব'লে কিছুক্ষণ থেমে কি যেন একবার চিন্তা ক'রলো বিজন, তারপর ব'ল্লো, 'এবার থেকে বড় ক'রে চিঠি দিস্! বিভুঁয়ে একা একা কি ক'রে যে দিন কাটে, জানিস না তো! সব সময় আকর্ষণ করে এখানকার সব কিছু।'

কেন যেন এবারে চোখ দু'টো তুলে একবার ভালো ক'রেও তাকাতে পারলো না ছন্দা বিজনের মুখের দিকে। স্বল্পক্ষণ কেটে গেলে পরে একসময় ব'ল্লো, 'কিছু সাত তাড়াতাড়িই আবার চ'লে যাচ্ছো না তো বিজুদা?'

—'থাক্‌লেই বা এমন কি সুবিধে, তুই তো পালিয়ে পালিয়েই বেড়াবি!' বিজন ব'ল্লো, 'নইলে ছুটি হাতে আছে এখনও পুরো এক মাস।'

—'তবে তুমি আছো নিশ্চয়ই।' ব'লে আর একমুহূর্ত্তও দেরী ক'রলো না ছন্দা। কাকিমার সংসারে কাজ থেকে তার অবকাশ নেই। এখনও এক পাঁজা বাসন মাজা বাকী। গিয়ে আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেল ছন্দা।...

মিসেস মল্লিক সেদিন কাছে বসিয়ে ফল, মিষ্টি আর ঘরে তৈরী আচার খাওয়ালেন বিজনকে, মিঃ মল্লিক এসে খানিকটা পিঠ চাপড়ে দিয়ে ব'ল্লেন, 'তোমার কবিতার রসাস্বাদ থেকে আমাকেও কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত করে নি রেবা। মাইকেলের পর মনে হ'য়েছিল বাংলা অমিত্রাক্ষরে ভাঁটা পড়লো, কিন্তু তোমার কবিতা প'ড়ে সে মত পরিবর্ত্তন ক'রতে আমি বাধ্য হ'য়েছি। বাস্তবিকই স্প্লেন্‌ডিড, অপূর্ব্ব। মাইকেলও এই যশোরেরই লোক ছিলেন,

তুমি তাঁর উত্তর-সাধক ; তোমাকে আজ আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি বিজু। বড় হও, দীর্ঘজীবী হও, যশস্বী হ'য়ে ওঠো তুমি।'

এমন প্রশংসা জীবনে এই প্রথম। লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠছিল বিজন। অপাঙ্গে একবার তাকিয়ে দেখলো—দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাস্‌চে রেবা। মানুষের প্রশংসায় যে নিজেকে এতখানিও অপ্রস্তুত বোধ ক'রতে হয়, তা এই প্রথম বোধ ক'রলো বিজন। মিঃ মল্লিকের অভিনন্দনের উত্তরে কিছু-একটাও না ব'ল্‌তে পেরে নীরবে উঠে সে একবার প্রণাম ক'রতে গেল তাঁকে।

বাধা দিয়ে মিঃ মল্লিক ব'ললেন, 'ছিঃ ছিঃ, প্রণাম কেন ক'রবে তুমি! বামুনের ছেলে হ'য়ে ওটা ভালো দেখায় না।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'জাতের বিচারটাই বড়ো হ'লো, মানুষ কিছু নয়? এমন সমাজের ভালো দেখাদেখির মধ্যে আমি নেই মেসোমশাই।'

—'মাইকেলও ঠিক এমনি ছিলেন।' থেমে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কিন্তু দেশাচার কি একদিনেই বদ্‌লানো যায়, না বদ্‌লানো সম্ভব! তা ছাড়া ওটা দাসমনোবৃত্তির লক্ষণ। মাথা উঁচু রেখে সবসময় চ'ল্‌বে, কোথাও তাকে নোয়াতে যেয়ো না। সেটা বড় হবার লক্ষণ নয়।'

নম্রকণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'তবু গুরুজনদের ক্ষেত্র তো স্বতন্ত্র বটেই! তাকে অস্বীকার ক'রলে যে মানুষের মনুষ্যত্ব ব'লে আর কিছুই থাকে না মেসোমশাই।'

মিঃ মল্লিকের পক্ষে এবারে উত্তর দেওয়া শক্ত হ'লো।

কথাটাকে প্রসঙ্গান্তরে টেনে নেবার চেষ্টা ক'রে মিসেস মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'দিদির মুখে শুনেছিলাম তুমি ট্যুইশনি খুঁজছো, তা পেলে কিছু বাবা?'

—'হাঁ পেয়েছি, পনেরো টাকা মাইনে। ক্লাশ সেভেন আর এইটের দু'টি ছেলে, সকাল বিকেল পড়াতে হয়। অবস্থা ভালোই, তবে ওর বেশী আর দিতে চায় না।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তা—ওর বেশী কেইবা আর দিতে চায় আজকাল! আমার হোষ্টেল আর কলেজের খরচাটা উঠে গেলেই হ'লো, না কি বলেন মাসীমা?'

—'তা হ'লেই যথেষ্ট।' মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কিন্তু আমি ভাব্‌চি—দু'বেলা তুমি যদি ট্যুইশনিই ক'রবে, তবে নিজের বই নিয়ে বস্‌বার সময় কোথায়?'

—'আমিও প্রথমটা এ-কথাই ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখ্‌লাম—সময় ক'রে নিলে ঠিকই হ'য়ে যায়।' ব'লে আর অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। বিকেলের রোদ তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেছে। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আহ্নিকে ব'সেছে মা! উঠে সে এবারে সোজা বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

অনুমান তার মিথ্যে নয়। আহ্নিকে বসা নয়, আহ্নিক সেরে সবে উঠ্‌লেন তখন নির্ম্মলা। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কোত্থেকে কাটিয়ে এলি এতক্ষণ বিজু?'

ঘরে গিয়ে গা থেকে জামা খুলে রাখতে রাখতে বিজন ব'ল্‌লো, 'ওবাড়ির মল্লিক-মাসীমার হাতে পেটপুরে খুব ফল, মিষ্টি আর আচার খেয়ে এলাম মা। খাসা আচার, জলপাই আর কৎবেলের। তুমিও কেন অম্‌নি ক'রে তৈরী করো না মা? বেশ লাগে খেতে।'

মুখ টিপে হেসে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'পাগ্‌লা ছেলে, কার জন্যে আচার ক'রবো বল্ তো?'

—'কেন, কার জন্যে আবার! ভেবেছ আমি বাড়ি নেই ব'লে আচার ক'রতেও নিষেধ আছে? বানিয়েই দেখ না, এমনি এক একটা ছুটিতে এসে তোমার ভরা বয়োম সব খালি ক'রে দিয়ে যাবো।' ব'লে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এবারে হেসে ফেল্‌লো বিজন।

ঝাল, মিষ্টি আর টক মিলিয়ে খেতে সে যে কত ভালোবাসে, মায়ের প্রাণে তা অজানা ছিল না নির্ম্মলার। নিজের অক্ষমতার জন্য মনে মনে এই নিয়ে বড় কম দুঃখ পেলেন না তিনি। ব'ললেন, 'আচ্ছা, এবারে বানিয়ে রাখবো; দেখবো কত আচার খেতে পারিস তুই!'

হাসতে হাসতেই এবারে লুটিয়ে প'ড়লো বিজন মায়ের কোলের কাছে।—'ভেবেছ, আমি বুঝি একটা রাক্ষস। আচার বানাতে গিয়ে তোমাকে আর পরিশ্রম ক'রতে হবে না। কবে ছুটি পাবো, তবে আস্‌বো, ততদিনও আবার আচার থাকে নাকি! ও দিয়ে কাজ নেই মা।'

—'আচ্ছা, সে দেখবো।—বিজনের মাথাভর্ত্তি একবোঝা চুলের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগলেন নির্ম্মলা।

আরামে চোখের পাতা বুজে আস্‌ছিল বিজনের।

স্বল্পক্ষণ থেমে পুনরায় নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'এবারে তুই থাক্‌তে থাক্‌তে

চাষিদের দু'কথা ব'লে যা বিজু। আমি যে আর পেরে উঠছিনা ওদের নিয়ে! ঘরে না আস্‌চে দু'দানা ধান, না পাচ্ছি খাজনা। এম্‌নি হ'লে সংসার চালাই কি ক'রে?'

বিজন ব'ললো, 'তোমাকেই যখন ওরা অবজ্ঞা ক'রতে শিখেছে মা, তখন কি আমার কথাই কিছু একটা শুন্‌বে ওরা?'

—'না শুন্‌লে শোনাবার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ঘরে কোনো পুরুষ-ছেলে না থাক্‌লে এ কি আমার কাজ, বল্‌ তো বাবা?'

এবারে সত্যিই ভাবতে হলো বিজনকে। ভাবলো—কালই তসর আলীদের পাড়ায় গিয়ে এর একটা হিল্লে ক'রে আস্‌বে সে।

পরদিন তাই ঘুম থেকে উঠেই সোজা সে রওনা হ'য়ে পড়লো ঘর থেকে। চাষিদের অনেক ক'রে বুঝিয়ে তবে সে ফিরলো।

বিকেলের দিকে স্থানীয় সমবয়সী ছেলেরা এসে হঠাৎ চেপে ধ'রলো তাকে: প্রতি বছরের মতো এবারও শারদীয়ায় তারা বারোয়ারী-তলায় থিয়েটারের ব্যবস্থা ক'রেছে, সেই সাথে কৃষ্ণলীলা আর পুতুল-নাচ। তাদের সাথে অবশ্যই গিয়ে যোগ দিতে হবে বিজনকে।

আপত্তি তুলে বিজন ব'ল্‌লো, 'থিয়েটারে অভিনয়ে আমি তো কোনোদিনই অভ্যস্ত নই, আমি গিয়ে কি ক'রবো! বরং দর্শক হিসেবে উপভোগের সুযোগ পাবো অনেকখানি।'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো আপত্তিই টিক্‌লো না তার। নানা ওজোর তুলে চেপে ধ'রলো ছেলেরা: 'থিয়েটারে পার্ট নিলেই কি চুকে গেল সব, অনুষ্ঠান আয়োজনের দিক দিয়ে কাজের কি কিছু অন্ত আছে! পালিয়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না।'

পালিয়ে থাকা তো দূরের কথা, শেষ পর্য্যন্ত দুটো সীনের পার্ট দিয়ে তবে তাকে ছাড়লো সকলে। জনমতের দাবী, অনভিজ্ঞতার প্রশ্ন এখানে বড় নয়। বাধ্য হ'য়ে এবারে নিয়মিত রিহার্সালে গিয়ে যোগ দিতে হ'লো বিজনকে। দেখা গেল—অনভিজ্ঞতাকে জয় ক'রে উঠেছে সে। কবিতা লেখার মতো এটাও বড় কম কৃতিত্বের কথা নয় তার জীবনে। বিনে পোষাকেই রীতিমত সে আসর জমিয়ে নিল রিহার্সালে।

শুনে ছন্দা আর রেবা তো অবাক্‌। বিজুদার থিয়েটার দেখবার জন্যে একটা দুরন্ত বাসনায় অনবরত উদ্বেলিত হ'য়ে উঠছিল তারা। তা ছাড়া

পুতুল-নাচ কোনোদিন দেখেনি তারা জীবনে। অবকাশ মতো ছন্দাই একসময় কথাটা পাড়লো : 'আমাদের নিয়ে যাচ্ছো তো বিজুদা ? খুব কাছাকাছি নিয়ে কিন্তু বসিয়ে দিতে হবে, নইলে কিচ্ছু শুনতে পাবো না। তুমি কেমন ক'রে পাট ক'রবে বিজুদা, লজ্জা ক'রবে না ষ্টেজে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে কথা ব'লতে ?'

—'লজ্জা, তখন আবার লজ্জা নাকি, বল্—ভয় ক'রবে কিনা!' থেমে বিজন ব'ল্লো, 'তবে কি জানিস্, দিয়েছি সবাইকে তাক্ লাগিয়ে। সেদিন যেমন ওবাড়ির মল্লিক মেসোমশাই একরকম মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গেই তুলনা ক'রে ব'সলেন আমাকে, এবারে থিয়েটার ক'রে ভাবচি—রাতারাতি গিরিশ ঘোষ হ'য়ে যাবো কিনা! পারিস তো মেয়েদের মধ্য থেকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তুই একটা স্বর্ণপদক ঘোষণা ক'রে দিস্।'

শুনে অনেকক্ষণ ধ'রে মুখ টিপে টিপে হাস্‌লো ছন্দা। তারপর ব'ল্লো, 'কি ব'লে ঘোষণা ক'রবো ?'

—'তাও ব'লে দিতে হবে ? ব'ল্‌বি—মহিমার্ণবের অভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে আমি অভিনেতাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেল্‌লো বিজন। ব'ল্লো, 'শ্রোতারা তখন কী অদ্ভুত বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকবে, বল্ তো ছন্দা ?'

ঠাট্টা ক'রে ছন্দা ব'ল্লো, 'তোমার দিকে না আমার দিকে ?'

—'প্রথমটা তোর দিকে, পরে আমার দিকে।'

—'তবে আর আমার বলা হ'লো না।' ঠোঁট উল্‌টিয়ে বার কয়েক ঘাড় নাড়লো ছন্দা।

বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন ব'ল্‌তে পারবি নে, বল ?'

—'সর্ব্বনাশ, তবে কি আর তার পরের দিন মুখ দেখাতে পারবো পাড়ায়! আমাকে নিয়েই শেষ পর্য্যন্ত কিছু একটা অভিনয় সুরু হ'য়ে যাবে। অভিনয়ের মধ্যেই যে আছি বিজুদা, জানো তো ?'

—'নে, যথেষ্ট হ'য়েছে, দেখলাম ঠাট্টাটুকুও তুই ধ'রতে পারিস নে।' হেসে বিজন বল্‌লো, 'তোরও যেম্‌নি মাথা খারাপ, আমি ক'রবো থিয়েটারে পার্ট, তার আবার পদক ঘোষণা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি!'

এবারে মনে বড় আঘাত পেলো ছন্দা, ব'ল্লো, 'ছিঃ, এমনি ক'রে কেন ব'ল্‌ছো নিজেকে বিজুদা ? তুমি কানাও নও, পদ্মলোচনও নও, তুমি যা

ঠিক তা-ই।' তারপর আর এক মিনিটও দেরী ক'রলো না সে। কাকিমার সংসার বড় বেশীক্ষণ কোথাও তাকে সুস্থির হ'য়ে দাঁড়াতে দেয় না। তারও উপরে আছে এখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর উদ্ধত দৃষ্টি। চারপাশে ছড়িয়ে র'য়েছে তার বেড়াজাল। সে জাল ছিন্ন করা যে কতখানি কঠিন, তা সে জানে। জানে ব'লেই এই সতর্কতা, প্রতিমুহূর্ত্তের এই উৎকণ্ঠা। নইলে বিজুদাকে ছেড়ে সত্যিই কি একটা মুহূর্ত্তও সে মনে শান্তি পায়? পায় না। তবু ছেড়ে যেতে হয় তাকে, লুকিয়ে রাখতে হয় নিজেকে কাকিমার ধারালো কথা আর শ্যেন দৃষ্টির আড়ালে।...

যথাদিনে এবং যথা সময়েই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ষ্টেজ বেঁধে অভিনয় সুরু হ'লো বিজনদের। রেবা এসে দিব্যি সামনে ব'সেই দেখতে পারলো অভিনয়। রেবার সাজটাও দেখবার মতো। ফ্রক সে অনেকদিনই ছেড়েছিল, কিন্তু শাড়ি প'রে রেবাকে বুঝি এমন সুন্দর আর কখনও দেখা যায় নি। মেয়েদের মধ্যে এই নিয়ে কাণাঘুষো হওয়াও বিচিত্র নয়।

কিন্তু যথাসময়ে রওনা হবার উদ্যোগ ক'রেও কাকিমার সংসার থেকে ছুটি পেলো না ছন্দা। তার উপর হেঁসেলের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অঞ্জনাই বরং পাড়া থেকে দু'পাঁচ জনকে ডেকে নিয়ে ঘটা ক'রে এসে ব'স্‌লেন দর্শকদের আসরে। দুঃখে দু' চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল ছন্দার। চেষ্টা ক'রেও সেটুকু সে সম্বরণ ক'রতে পারলো না। পুতুলনাচ আর কৃষ্ণলীলা চুলোয় যাক্, তা দেখবার জন্য মন কাঁদে না তার; কিন্তু বিজুদার অভিনয়, এ যে আজ কতখানি তাকে হারাতে হ'লো, এ কথা সে ভিন্ন আর কে বুঝবে সংসারে? নির্জ্জন হেঁসেলে ব'সে কতক্ষণ যে চোখের জলে সে বুক ভাসালো, তা নিজেই বুঝতে পারলো না ছন্দা।

বুঝতে পারলো না তেম্‌নি বিজনও—আজকের অভিনয়ের সার্থকতা তার কোথায়! শুধু রেবা আসবে, এ তো সে আশা করে নি! ছন্দার সঙ্গে এত কথা, এত ঠাট্টা হবার পর সে-ই কিনা আস্‌তে পারলো না তার অভিনয়ে! থিয়েটারের সমস্ত আনন্দটাই মাটি হ'য়ে গেল বিজনের। ঘরে ফিরেও যে নিশ্চিন্ত মনে সে ঘুমোতে পারলো, তা নয়। অভিনয়ের মহিমার্ণব নির্জ্জন রাত্রি-শয্যায় অনবরত যেন তাকে ব্যঙ্গ ক'রে সমস্ত হৃদয়টাকে একেবারে তোলপাড় ক'রে দিয়ে যেতে লাগলো। তার মধ্যেই একবার কঠিন বিদ্রোহে জ্ব'লে উঠলো সে অঞ্জনার বিরুদ্ধে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের কাছে তার

নিজের ব্যর্থতা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। কি ক'রতে পারে সে অঞ্জনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে। তাতে কি ছন্দার জীবনের নিগ্রহ কিছু কম্‌বে?

কয়েক দিন ধ'রে এম্‌নি ক'রেই নিজের মধ্যে নানাভাবে আন্দোলিত হ'তে লাগলো বিজন।

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'কদিন ধ'রে তো দিব্যি কাটিয়ে দিলি বাইরে বাইরে, এতদিনে তবু যা হোক্‌ থিয়েটারটা চুকে গেল! কিন্তু হঠাৎ এমন তুই গম্ভীর হ'য়ে গেলি কেন, বল্‌ তো বাবা!'

—'গম্ভীর আবার আমাকে দেখলে কোথায়? এই তো দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি কথা ব'ল্‌ছি।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'কখন্‌ কি যে বলো তুমি মা, তা তুমি নিজেই জানো না।'

—'জানি না, তবে বুঝ্‌তে পারি। আমার কাছে কি কিছু লুকোনো থাকে রে!' ম্লান হেসে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'একদিন তোকে গর্ভে ধরেছিলাম, আজ কি তোর মনের কথাটুকুও জানি নে?'

—'কি জানো বলো?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার চোখ তুলে মার মুখের দিকে তাকালো বিজন। একটা ভীরু সংশয়ে অনবরত নিজের মধ্যে আন্দোলিত হ'চ্ছে সে। মার কাছে কি সত্যিই তবে সে ধরা প'ড়ে গেল?

কিন্তু নির্ম্মলা আর দ্বিরুক্তি ক'রলেন না। নীরবে উঠে গিয়ে নিজের কাঠের মালা নিয়ে আহ্নিকে ব'স্‌লেন তিনি।

ছুটি ক্রমেই ফুরিয়ে আস্‌ছিল বিজনের। এবারে গ্রামে এসে অনেক প্রশংসাই অদৃষ্টে লেপে নিতে পারলো সে। অনেক দিন মনে থাক্‌বে এই স্মৃতি, স্মৃতির সঙ্গে 'বেদনাটুকুও। কলেজ খুল্‌তে দু' একটা দিন বাকী থাকতেই মাকে খানিকটা সান্ত্বনায় অভিষিক্ত ক'রে বেরিয়ে প'ড়লো আবার সে গ্রাম ছেড়ে। নবগঙ্গার উপর দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল মাগুরা, মিলিয়ে গেল ছুটির অবকাশের খণ্ড-ছিন্ন মুহূর্ত্তগুলি।

সাত

কিছুকাল কেটে গেলে দেখা গেল—ছন্দার বিয়ে নিয়ে বিশেষ তৎপর হ'য়ে উঠেছেন অঞ্জনা। রসিকলাল যেমন সংসার-উদাসীন মানুষ, এ ব্যাপারে অঞ্জনার তাই তৎপর না হ'য়ে উপায় নেই। মেয়েটা চিরকালের দু'চোখের কাঁটা তাঁর কাছে। তার ভরন-পোষণের ব্যাপারে আর অধিক দূর অগ্রসর হ'তে তিনি না-রাজ। নিজের ছেলে-মেয়ে র'য়েছে, তাদের জন্যেই কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারছেন না তিনি। তা ছাড়া মেয়ে সবিতা তো ছন্দার বয়সীই, মা হ'য়ে দু'দিন বাদে কি তাকেই তিনি কোনো বাজে ছেলের হাতে তুলে দিতে পারবেন? ভালো ঘর, ভালো বর পেতে হ'লে ভালো অর্থ ঢাল্‌তে হয় মেয়ের পিছনে। অথচ সেই অর্থের সঙ্গতিই বা কোথায়? কাঁটার মতো সবিতার পথ আগলে আছে ছন্দা। এ কাঁটা আগে বিদেয় না ক'রতে পারলে শান্তি নেই অঞ্জনার।

নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে কিছুকাল তিনি এখানে ওখানে ছেলে দেখলেন। অথচ যার জন্যে ছেলে খোঁজা, তার কাছে কিন্তু সমস্ত বিষয়টাই একেবারে অস্পষ্ট র'য়ে গেল।

সবিতাই বরং দু'একবার ঝগ্‌ড়ার সূত্রে শাসানির সুরে গলা তুলেছে: 'যাওনা এবার শ্বশুর-বাড়ি, দেখবে মজা কেমন!'

অর্থাৎ—এখানে যেন সুখে থাক্‌তেও সুখের নিকুচি ক'রছে ছন্দা, ভাবখানা এইরকম।

ব্যাপার আর কিছু নয়। চুলের কাঁটা আর ফিতে নিয়ে ঝগ্‌ড়ার সূত্র টেনে আপনি থেকেই মুখিয়ে উঠেছিল সবিতা। ছন্দা শুধু ব'লেছিল, 'আমি কারুর জিনিষ ছুঁই না।' অম্‌নি তাই নিয়ে একটা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। তবে সেই রামায়ণ থেকে এতদিনে একটা বড় জিনিষ বুঝে নেবার অবকাশ পেলো সে, সেটা তার বিয়ে। ভাবতে গিয়ে সহসা একবার নিজের মধ্যে আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো ছন্দা।

কিন্তু নিজের উদ্যোগে যত চেষ্টাই করুন অঞ্জনা, ছেলে পছন্দ ক'রে বার করা শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পক্ষে সত্যিই কঠিন হ'লো। শ্বশুর শাশুড়ীর ঘর শূন্য দেখে অনেকে পিছিয়ে গেল, কেউবা মোটা পণ চেয়ে বিমর্ষ মুখে বিদায় ক'রে

দিল অঞ্জনাকে। বিক্ষুব্ধ চিত্তে একসময় এসে বহির্বাটিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঝাল ঝাড়্লেন তিনি স্বামীর উপর।—রসিকলাল তখন কি একটা জরুরী মোকদ্দমার ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ঘরে মক্কেল ছিল না। সহসা সরোষে চিৎকার ক'রে উঠ্লেন অঞ্জনা: 'বলি, এবাড়িতে কি কেউ পুরুষ মানুষ নেই? একা মেয়েমানুষ হ'য়ে ক'দিক সাম্‌লাই আমি! এদিকে গাঁয়ে তো মুখ দেখানো কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো। লোকেরই বা দোষ কি! ধিঙ্গী মেয়ে ধিন্ ধিন্ ক'রে বেড়াবে, মানুষ তো আর অন্ধ নয়, ব'ল্‌বে বৈ কি! পুরুষ মানুষের অপেক্ষায়ই কি থেকেছি, দেখলামও তো দু'পাঁচ ঘর, তা গাঁয়ে ছেলে না মিল্‌লে গাছ-কোমর বেঁধে আমি পথে বেরোলে এবাড়ির সম্মানই কি কিছু রক্ষা পাবে?'…

স্বতঃউৎসারিত কণ্ঠে আরও কিছু ব'ল্‌তে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা। একটা লাল ফিতে দিয়ে হাতের জরুরী ফাইলগুলো উপস্থিত মতো বেঁধে রেখে শান্তকণ্ঠে রসিকলাল ব'ল্‌লেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে অম্‌নি ক'রে কি সব ব'ল্‌ছো? এস না, ভিতরে এসে বসো।'

—'হ্যাঁ, ব'স্‌লেই আমার সাতপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে আর কি!' ঝাঁঝালো কণ্ঠেই আবার থরথরিয়ে উঠলেন অঞ্জনা: 'আমাকে না হয় বুঝ্‌লাম সহ্য করা কষ্ট, কিন্তু গাঁয়ের লোক? তাদের মুখ ঢাক্‌বে কি ক'রে? মেয়েটার কি দেখে-শুনে গতি ক'রতে হবে না?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবারে ভিতরে এসেই ব'স্‌লেন অঞ্জনা।

পুরু কাঁচের চশ্‌মার ফাঁকে একবার চোখ তুলে তাকালেন রসিকলাল স্ত্রীর মুখের পানে: 'তা—সবির এমনই বা কি বয়স হ'লো যে, এক্ষুণি ওর জন্যে ছেলে না দেখ্‌লে নয়!'

ললাটে করাঘাত ক'রে অঞ্জনা ব'ল্‌লেন, 'হাঁ রে আমার অদেষ্ট, সবির কথাই তবে ব'ল্‌ছি এতক্ষণ!'

—'তবে?'

—'ন্যাকা আর কি! এদিকে আইন ক'রে মাথা পাকালে, অথচ ঘরের কথা কি ঢোকে মাথায়, তা ঢোকে না। ঢুক্‌বে কেন, ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক থাক্‌লে তো ঢুক্‌বে!'—নিজের মধ্যে জ্ব'লে ম'রতে লাগলেন অঞ্জনা।

রসিকলাল কিন্তু এতটুকুও চট্‌লেন না। তেম্‌নি শান্ত কণ্ঠেই ব'ল্‌লেন, 'তবে কি ছন্দার কথা ব'ল্‌ছো?'

—'নয় তো কি আমার কথা ব'ল্‌ছি!' অঞ্জনা ব'ল্‌লেন, 'ঘরে আমার এমন ন শো পঞ্চাশ মজুৎ নেই যে, চিরকাল পাঁচজনের জন্যে দেখে শুনে ক'রবো। সোমত্ত বয়স হ'য়েছে, আর কেন! এবারে দেখে শুনে আহ্লাদের ভাইঝিটিকে কারুর হাতে তুলে দিয়ে আমাকে উদ্ধার ক'রলেই তো হয়!'

—'এ তুমি কি ব'ল্‌ছো?' শান্ত দৃষ্টিতে এবারে খানিকটা বিস্ময় এসে যুক্ত হ'লো রসিকলালের চোখে।—'ছন্দা আর সবির মধ্যে পার্থক্য কি? বয়সে তো ওরা প্রায় পিঠেপিঠিই ব'ল্‌তে গেলে! তা ছাড়া নতুন ক'রে আজ ওর জন্যে এমন কি সংসার-খরচাটা তোমার বাড়লো, তাও তো বুঝতে পারছি নে সবির মা!'

—'সংসার হাতে নিয়ে তা এসে নিজে বুঝলেই তো হয়, আমাকে তবে আর এমন ক'রে মরতে হয় না।' কি মনে ক'রে এবারে উঠে দাঁড়ালেন অঞ্জনা।—'কাজের মধ্যে তো ঘরে ব'সে মক্কেল তাড়ানো আর আপিসে গিয়ে দিন ভ'রে গলা বাজানো, গাঁয়ের লোকের কথা তো আর তোমাকে শুন্‌তে হয় না! বুঝবে কি ক'রে?'

সত্যিই বুঝতে পারেন না রসিকলাল। অবুঝের মতো আত্মখেয়ালে বুঝতেও তিনি রাজি নন্‌ কোনো কিছু। স্বল্প থেমে তিনি ব'ল্‌লেন, 'গাঁয়ের লোকেরা কি একচোখো, তারা ছন্দাকে দেখে, তোমার মেয়েকে দেখে না?'

এবারে ওষ্ঠাগ্রে উত্তর এসেও কেন যেন ভাষা থেমে গেল অঞ্জনার কণ্ঠে! জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো চোখ দু'টোকে একবার দৃঢ়ভাবে স্বামীর চোখের দিকে নিবদ্ধ ক'রে তৎপরমুহূর্ত্তেই তিনি ঝড়ের চাইতেও তীব্র গতিতে রসিকলালের সাম্‌নে থেকে দ্রুত প্রস্থান ক'রে অন্দর-মহলের দিকে চ'লে গেলেন। বহির্ব্বাটিতে এসে স্বামীর মুখোমুখি এই তিনি প্রথম দাঁড়ালেন আজ।

মোকদ্দমার ফাইল নিয়ে কাজে আর মন ব'স্‌লো না রসিকলালের। অথচ জরুরী মোকদ্দমা। বাদী আর আসামী পক্ষে জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া, শেষ পর্য্যন্ত রক্তারক্তি ব্যাপার। ফৌজদারী আদালতে দু'দিন ধ'রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'য়েছে এই নিয়ে। আসামী পক্ষের উকীল তিনি, হাত গলিয়ে পয়সার অঙ্কটা একেবারে মন্দ আসেনি পকেটে। মোকদ্দমার মারপ্যাঁচ নিয়ে চিন্তা ক'রতে হ'চ্চে নানাভাবে। অকস্মাৎ ছেদ প'ড়লো সেই চিন্তায়। খানিকক্ষণ নিজের মধ্যে অর্থহীন ভাবে ব'সে রইলেন তিনি। হঠাৎ ভিতরবাড়ি থেকে অঞ্জনার শাণিত কণ্ঠের উদগ্র ধ্বনি এসে কানে বিঁধলো তাঁর। এতক্ষণে গিয়ে

আবার সম্মুখসমরে প'ড়েছেন তিনি ছন্দাকে নিয়ে—'বলি, মিণ্টুর প্যাণ্ট কেচে সাবান রেখেছিস কোথায়, আগে বল্? হতচ্ছারিকে কতবার বলি—যেখানকার জিনিষ সেখানে যেন থাকে। তা নয়, সারা বাড়ি খুঁজে মরলেও যদি কাজের জিনিষ প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে পাই! বলি, আমাকে না মেরে কি তোর শান্তি নেই? এতবড় আইবুড়ী ধিঙ্গী মেয়ের এখনও যদি কিছু ছিরি হ'লো! দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তো আমাকে উদ্ধার ক'রছিস্, আর কত ক'রবি বল?'

উদ্ধার যে কে কাকে ক'রছে, ভগবানই জানেন। দুঃখে ইচ্ছে হ'লো একবার ডুক্‌রে কাঁদে ছন্দা, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিল সে। একদিনও চোখের জল না ফেলে অন্ন গ্রহণ করে নি সে কাকিমার সংসারে, আজও ক'রলো না। প্রতিবাদের কণ্ঠ নিয়ে তাকে পাঠান নি ভগবান সংসারে। কোথায়ই বা প্রতিবাদ ক'রবে সে? বোবাকণ্ঠেই এখানে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে সে, প্রতিবাদ ক'রলে হয়ত আর দ্বিতীয় রাত্রি বাস করা চ'লতো না এখানে। আজও সে নীরবেই মুখ নিচু ক'রে কাকিমার সাম্‌নে থেকে সরে গেল। সাবান ঠিক যথাস্থানেই রেখেছিল সে, তারপর কার হাতের স্পর্শে তা উধাও হ'য়েছে, তা সেও জানে না। অথচ সংসারের খুঁটিনাটি অধিকাংশ ব্যাপারের মতো আজকের এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটার জন্যও অপরাধের বোঝা বহন ক'রতে হ'লো তাকেই।

বহির্ব্বাটির নিভৃতে ব'সে বিষয়টা নিয়ে আজ একটু বেশীই ভাবতে হ'লো রসিকলালকে। যে ভাবে একটু আগেই অঞ্জনা এসে দাপট ক'রে গেলেন, তাতে একথা অন্ততঃ রসিকলালের কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল যে, ছন্দার কিছু-একটা সত্বর ব্যবস্থা না ক'রলে এবাড়িতে তার পক্ষে থাকা ক্রমেই দুর্ব্বিসহ হ'য়ে উঠবে। অঞ্জনা আজ শুধু রসিকলালের জীবনটাকেই নয়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ছন্দার অদৃষ্টটাকেও। অথচ অমিয়মাধবের মৃত্যুশয্যায় তাঁর কাছে একদিন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই ছন্দাকে গ্রহণ ক'রেছিলেন রসিকলাল যে, তাঁর যদি কোনোদিন দু'মুঠো ভাতের অভাব না হয়, তবে ছন্দারও অভাব হবে না জীবনে। অথচ সংসারের সেই দু'মুঠো ভাতের অভাবই আজ বড় ক'রে দেখা দিল ছন্দার। নিজে কর্ম্মক্ষম থেকেও এর চাইতে মনুষ্যত্বের আরও বড় কিছু কি অপমান আছে রসিকলালের জীবনে! উঠতে ব'সতে দিন রাত মেয়েটার হাড় চিবিয়ে খাচ্ছে অঞ্জনা। অদৃষ্টের আশ্চর্য্যকর পরিহাস!

বহুক্ষণ ধ'রে বহুভাবে চিন্তা ক'রে দেখলেন তিনি বিষয়টাকে। শেষে একরকম মন স্থির ক'রেই ফেললেন। একসময় নিভৃতে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন তিনি ছন্দাকে, সান্ত্বনা দিয়ে ব'ললেন, 'প্রতিদিন সংসারে যা ঘটছে, তা চোখের আড়ালে হ'লেও এ-দুটো কানে এসে আমার সবই বাজে। তার জন্যে দুঃখ করিস নে মা। ভালো ঘর খুঁজে দেখি কোথাও তোকে দিতে পারি কি না! তবে তোরও শান্তি, আমারও শান্তি।' ব'ল্‌তে গিয়ে কণ্ঠ একবার আর্দ্র হ'য়ে উঠলো রসিকলালের।

উত্তরে কিছু-একটাও মুখ ফুটে ব'লতে পারলো না ছন্দা। শুধু দু'ফোঁটা চোখের জল দিয়ে নীরবে কাকার কথার সমর্থন জানালো। না জানিয়ে উপায় ছিল না তার। শেষ পর্য্যন্ত ছন্দা স্পষ্টই বুঝে নিয়েছিল—কোথাও চ'লে যাওয়াই প্রতিদিনের এ সমস্যার একমাত্র সমাধান। কিন্তু কোথাও অর্থে পথ খুঁজে কিছু পায় নি সে। এবারে সে-পথের কিছু একটা নির্ভরযোগ্য আভাস পেয়ে অতি দুঃখের মধ্যেও মুহূর্ত্তের জন্য একবার বুকখানি ফুলে উঠলো তার। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার একটা তীব্র অশ্বস্তিতে নিজের মধ্যে বিষিয়ে উঠলো ছন্দা। বিজুদাকে ছেড়ে কেমন ক'রে জীবনে সে সুখী হবে? বিজুদা ভিন্ন আর কিছু যে জানে না সে!

নীরবে একসময় কাকার সামনে থেকে সরে এসে ঘাট থেকে জল আনবার অছিলায় কলসী নিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে সে নদীর ঘাটে। নির্জ্জন নিস্তব্ধতায় ওকূল থেকে একূলে এসে আছড়ে প'ড়ছে নবগঙ্গা। কতক্ষণ যে নির্জ্জনে ব'সে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রলো ছন্দা, তা সে নিজেও জানলো না। অশ্রু তার ধারা হ'য়ে নদীর জলে মিশে গেল।

*　　　*　　　*

ইতিমধ্যে আর একবার মুখোমুখি কথা-কাটাকাটি হ'য়ে গেল অঞ্জনার সঙ্গে রসিকলালের। শান্ত মানুষ, ক্রমেই উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছেন তিনি সংসারে। অঞ্জনার শাণিত জিহ্বা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লেছে।

পাঁজি দেখে একদিন দুর্গা নাম স্মরণ ক'রে তাই বেরিয়ে প'ড়লেন রসিকলাল পথে। পথেই বেরিয়ে প'ড়লেন সত্য, কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট পথে নয়। ভিতরে ভিতরে কিছু দিন ধ'রে খোঁজ নিয়েছেন তিনি। অবশেষে রাইহরণ সিকদার একটা ভালো সন্ধান দিলো। রাইহরণকে বিশ্বাস না হবার কথা নয়। দীর্ঘকালের মক্কেল সে রসিকলালের। ঠাকুর্দ্দার আমলের কিছু জমিজিরেত

র'য়েছে রাজসাহীতে, সেই সূত্রে মাঝে-মধ্যে যাতায়াতও আছে সেখানে। সম্বন্ধটাও খাস রাজসাহীর। উত্তরবঙ্গ, বরেন্দ্রভূমি, তবু যদি কিছু একটা সম্পর্ক দাঁড়ায় উত্তর বাংলার সাথে!

একসময় এসে রাজসাহীতেই পৌঁছালেন রসিকলাল। পাঁজি দেখে তবে তিনি কাজে নেমেছেন, খারাপ অদৃষ্ট নিয়ে বেরোন নি পথে। সেই অদৃষ্টের জোরেই একসময় পাত্র মিলে গেল। ছেলে শ্যামলকান্তি নতুন ডাক্তারী পাশ ক'রে সম্প্রতি শহরের উপরেই ডিস্‌পেন্‌সারি দিয়ে ব'সেছে। সংসারে স্ত্রীলোক ব'ল্‌তে কেউ নেই; পিতা তারিণীমোহন আর পুত্র শ্যামলকান্তি। ঠাকুর চাকরে চালিয়ে নেয় সংসার। জ্ঞাতি সম্পর্কে তারিণীমোহনের দু' এক ঘর আত্মীয় র'য়েছেন পাশাপাশি হিস্যায়। আপদে বিপদে তাঁরাই এসে পাশে দাঁড়ান। শ্যামলকান্তির বয়স কিছুটা বেশী হ'লেও একেবারে বেমানান হবে না ছন্দার সঙ্গে। স্বভাবচরিত্র ভালো, দেখতে শুন্‌তেও দৈর্ঘে এবং স্বাস্থ্যে মিলিয়ে চমৎকার। তবু একটা আশঙ্কা এসে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল মনেঃ পারবেন তো তিনি এঘরে ঠাঁই ক'রে দিতে ছন্দাকে? তেমন ক'রে তো লেখা-পড়া শেখাতে পারেন নি তিনি তাকে! আজকালকার দিনে একটু বেশী লেখাপড়া জানা মেয়েই চেয়ে থাকে সকলে। শ্যামলকান্তিই বা না চাইবে কেন?

তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'তা—লেখাপড়া যা জানে শুন্‌লাম—ভালোই জানে। ঘরে ব'সে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত প'ড়েছে, আবার কি! তা ছাড়া গ্রামের মেয়ে ব'লেও দোষের কিছু নয়। গ্রামের মেয়েই আমি চাই। আধুনিক সহুরে সভ্যতা আমি ঠিক সহ্য ক'রে উঠতে পারিনে। জানি, আমার ছেলেরও তার বাপের মতেই মত হবে। আমি চাই কুললক্ষ্মী, এঘরে এসে সে-ই হবে সর্ব্বেসর্ব্বা। আপনি গিয়ে বরং প্রস্তুত হন, আস্‌চে মাসের ১৭ই দিন সাব্যস্ত করা গেল। ঐদিনেই বিয়ে হবে। আপনাকে এক পয়সাও এ বিয়েতে খরচা করতে হবে না।'

হাতে যেন আকাশ পেলেন রসিকলাল। ভগবানের আমোঘ বিধান জয়যুক্ত হোক্ঃ মনে মনে একবার প্রণাম ক'রলেন তিনি ইষ্টদেবতাকে। নিজের মেয়ে সবিতার জন্য হ'লেও সম্ভবতঃ এতখানি সুখী হ'তেন না তিনি। যতখানি কষ্ট নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, এবারে তার চাইতেও বেশী শান্তি নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

ক্রমে এ-কান থেকে সে-কানে হ'য়ে হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়লো সংবাদটা। গ্রামের চক্রবর্ত্তী বাচস্পতিরা ফুর্সিতে তামাক টান্‌তে টান্‌তে খানিকটা প্রতীক্ষমান হ'য়ে রইল নিমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়ে। এর আগে তারাই কান লাগিয়েছিল গ্রামে। প্রাচীন পল্লী-বাংলার কুখ্যাত সংস্কার নিয়ে আজও এরা তাম্রকুটের আসর জাঁকিয়ে বেঁচে আছে।

কিন্তু এতবড় একটা সুসংবাদেও অঞ্জনার মুখে কিন্তু হাসি ফুটলো না। তিনি যথারীতি পূর্ব্বের মতই চ'লতে লাগলেন। বরং এই ভেবে আরও অশান্তিতে দগ্ধ হ'তে লাগলেন যে, ভালো ঘর পেয়ে বাঁচলো মেয়েটা।

অথচ এমন বাঁচা ছন্দা কিন্তু আদৌ বাঁচতে চায়নি। বার কয়েক গিয়ে সে ইতিমধ্যে মাসীমা নির্ম্মলার সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে। নির্ম্মলা ভিন্ন তার এই দগ্ধ হৃদয়ের কোথাও শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই। বিজুদাকে কেন্দ্র ক'রে পারে না কি সে চির জীবন নির্ম্মলার পায়ে প'ড়ে থাকতে? কিন্তু এখানকার সমাজ হয়ত এতবড় বর্ণ-মিলনটাকে একেবারেই উদার হৃদয়ে স্বীকার ক'রে নেবে না। বিজুদা ব্রাহ্মণ, তারা কায়স্থ। কিন্তু জাতীয় বর্ণ-বৈষম্যটাই কি সব, হৃদয়টা কিছু নয়? বুকের মধ্যে অশান্ত হৃদয় বারবার হাহাকার ক'রে ওঠে ছন্দার। কি ক'রবে সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। একদিকে কাকিমার সংসার ছেড়ে গিয়ে বাঁচা, আর-একদিকে বিজুদাকে চিরদিনের মতো না পেয়ে তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে মরা। বিভ্রান্ত চিত্তে অজস্র চিন্তার আবিলতায় একসময় দুচোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল ছন্দার, তারপর নিজের অলক্ষ্যেই কখন একসময় ঘুমিয়ে প'ড়লো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো সে বিজুদাকে। বরের বেশে এসে দাঁড়িয়েছে সে সামনে, আর ছোটবেলার মতো নিজের হাতের গাথা মালা তাকে গলায় পরিয়ে দিয়ে নতজানু হ'য়ে তাকে প্রণাম ক'রলো সে।

কিন্তু নিশার স্বপ্ন-সুখ—সে কতক্ষণ?

যথাদিনে সানাই বেজে উঠলো বাড়ির দেউড়িতে।

এতদিনে আজ এই প্রথম উদ্যোগী হ'য়ে চিঠি লিখলো ছন্দা বিজনকে। এমন মুহূর্ত্ত হয়ত আর কোনোদিন আসবে না জীবনে! এ ক'দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছে সে। সামান্যই আর সময় আছে লগ্নের। তারপর চিত্রকরা পিঁড়িতে এসে ব'সবে শ্যামলকান্তি। চির জীবনের মতো আশ্রয় পেয়ে দূরে চ'লে যাবে ছন্দা। যাবার আগে তাই আজ এই শেষ চিঠি তার বিজুদাকে :

—দূরের বাঁশীর ডাক এসে হঠাৎ কানে বাজলো। ছোটবেলার খেলাঘর যে এম্‌নি ক'রেই একদিন তচ্‌নচ্‌ হ'য়ে যাবে, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি বিজুদা। এমন অদৃষ্ট নিয়ে এসেছিলাম যে, সংসারে ঠাঁই হ'লো না। তাই এই নতুন সংসারপথে যাত্রা। কাকার ব্যবস্থার উপর কথা বলিনি; কাকার হৃদয় তো জানি! বাধা দিলে হয়ত অন্য কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না তাঁর জীবনে। কিন্তু এ যাওয়া যে আমার কতবড় দুঃখের যাওয়া, তা হয়ত তুমি বুঝবে। তোমার কাছ থেকে সরে যাওয়া—এর চাইতে যে আমার মরণও ভালো ছিল! পারো তো ভুলে যেয়ো অভাগীকে।...

টস্‌ টস্‌ ক'রে দু'ফোঁটা চোখের জল প'ড়ে কাগজের একটা পাশ ভিজে গেল। তার এ জীবনের সমস্ত ভালোবাসার শেষ দান।

পরের দিন বর আর কণের যাত্রালগ্নে একান্ত কর্ত্তব্যবশেই নির্ম্মলা এলেন আশীর্ব্বাদ ক'রতে। শুধুই ধানদুর্ব্বো নয়, তার সঙ্গে একজোড়া সূক্ষ্ম কাজ করা শাখা। ধীরে ধীরে ছন্দার হাতে পরিয়ে মাথায় ধান দুর্ব্বো দিয়ে ব'ল্‌লেন, 'চিরায়ুষ্মতি হ'য়ে সুখে থাকো মা। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিও, নইলে একটুও শান্তি পাবো না।'

কথা না ব'লে তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছন্দা।

সান্ত্বনা দিয়ে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'ছিঃ, এমনি ক'রে চোখের জল ফেল্‌তে নেই মা, ওতে অমঙ্গল হয়। সবাই এমনি ক'রেই নতুন স্বামীর ঘরে যায়, তারপর সে ঘর তার নিজেরই হয়।'

নিজের আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে চোখের জল মুছিয়ে দিলেন তিনি ছন্দার।

কিন্তু কেউ দেখলো না—সবার আড়ালে ব'সে অশান্ত হৃদয়ে ছেলেমানুষের মতো কতক্ষণ ধ'রে কাঁদ্‌ছেন রসিকলাল। স্ত্রীর সংসারে দু'গ্রাস ভাতের অভাবে আজ নির্ম্মমভাবে দূরে সরিয়ে দিতে হ'চ্ছে মেয়েটাকে। এর চাইতে পাপ, এর চাইতে পরাজয় আর কি আছে জীবনে?

সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিল। একটা মূর্চ্ছাতুর বিষাদের সুর আছড়ে আছড়ে প'ড়ছে সানাই থেকে।

বেহারাদের কাঁধে একসময় পাল্কি উঠে গেল। তার মধ্যে বর্ষাক্লান্ত রজনীগন্ধার মতো এক পাশে নিথর নিষ্পন্দ অবস্থায় ব'সে রইল ছন্দা। পাল্কি চ'ল্‌লো সাম্‌নের পথ ধ'রে।

আট

যথাসময়েই ছন্দার চিঠি এসে বিজনের হাতে পৌঁছালো। একবার, দু'বার, তিনবার—কতবার ক'রে যে চিঠিখানি প'ড়লো বিজন, তার ইয়ত্তা নেই। প'ড়তে প'ড়তে অভিভূত হ'য়ে গেল সে। এত গভীরভাবে তবে তাকে ভালোবাসতো ছন্দা? সে তবে একাই চেয়েছিল না তাকে, ছন্দাও মনে প্রাণে কামনা ক'রেছিল বিজনকে। আজ তবে তার ভালোবাসা সার্থক হ'লো। কিন্তু এ সার্থকতার সত্যিই কি কিছু অর্থ আছে? অদৃষ্টচক্রে আজ কোথায় চ'লে যেতে হ'লো ছন্দাকে, আর কোথায় অধ্যয়ন-তপস্যায় ডুবে আছে বিজন! কিছু ক'রবার নেই তার, কিছু ক'রবার ছিল না তার কোনোদিনই। শুধু ভালোবেসেই ভালোবাসার মর্য্যাদা দেওয়া ভিন্ন আর কি ক'রতে পারে সে? ভাগ্য নিয়ে তবু বেঁচে গেল ছন্দা। কিন্তু বিজন, বিজন বাঁচবে এরপর কি নিয়ে? যখনই সে গ্রামে ফিরবে, খাঁ খাঁ ক'রে উঠবে ছন্দার জন্যে বুকখানি —যেমন ক'রে খাঁ খাঁ ক'রছে এখন এই মুহূর্ত্তে।

চিঠিখানি হাতে নিয়ে কতক্ষণ যে অভিভূতের মতো ব'সে রইল বিজন, তা সে নিজেও জান্‌লো না। এক একটা দিনের টুকরো টুকরো কথা ভেসে এসে মনটাকে তার আকুল ক'রে তুল্‌লো। সেই এতটুকু বয়স থেকে আজ এই অবধি—কত কথা, কত ঘটনা, এ সে কাকে বোঝাবে? চিঠির শেষে ছন্দা লিখেছে—'পারো তো ভুলে যেয়ো অভাগীকে।' ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ, ইচ্ছে ক'রলেই কি মানুষ ভুলে যেতে পারে তার অতীতকে? অতীতের উপরেই যে দাঁড়িয়ে আছে তার সমস্তটা বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ! চিরদিন নির্য্যাতনের মধ্যে থেকে নিজেকে অভাগী ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে পারে নি ছন্দা, কিন্তু যত ছোট ক'রে নিজের অদৃষ্টকে সে কল্পনা ক'রেছে, বিধাতা হয়ত ঠিক তত ছোট ক'রেই তাকে পৃথিবীতে পাঠান নি। সুখে থাক্ ছন্দা, সুখী হোক্ সে জীবনে, অতীতের সমস্ত ব্যথা ভুলে যাবার অবকাশ দিন তাকে ভগবান, এ ভিন্ন আজ আর কি কামনা ক'রতে পারে সে ছন্দার জন্য?

এই প্রসঙ্গে মনে মনে একবার মার উপরও বড় কম রাগ হ'লো না তার। মা হয়ত ইচ্ছে ক'রেই বিষয়টা চেপে গেছেন তার কাছে, নইলে মা অনায়াসেই এ বিয়ের ব্যাপারটা ইতিপূর্ব্বেই তাকে লিখে জানাতে পারতেন। কিন্তু কেন

যে পারেন নি নির্ম্মলা, সে কথা একটি বারের জন্যও বুঝতে চেষ্টা ক'রলো না বিজন।

আর-একবার চিঠিখানি আগাগোড়া প'ড়ে ভাঁজ ক'রে বাক্সে তুলে রেখে দিল সে। হোষ্টেলের অন্যান্য সীটের ছেলেরা মাঝে মাঝে যা-নয়-তাই নিয়ে বড়-বেশী ইয়ার্কি-ঠাট্টায় জমে ওঠে। তাদের কারুর চোখে চিঠিটা অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে প'ড়লে তাকে নিয়ে হুলুস্থুল বেধে যাবে সারা হোষ্টেলে। এই নিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ক্লাসে গিয়েও তিষ্ঠোনো দায় হ'য়ে উঠবে। চিঠিখানিকে তাই বাক্সে তালাবন্ধ ক'রে রেখে একসময় উঠে প'ড়লো বিজন। ট্যুইশনির সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আবার টিউটোরিয়াল নোট নিয়ে ব'স্‌তে হবে। ক্যালেণ্ডারের পাতার দিকে তাকাতে গেলে চোখ দু'টো ঝাপ্সা হ'য়ে আসে। ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র মাস তিনেকও দেরী নেই, তা ছাড়া সামনেই টেষ্ট। পাশ তাকে ক'রতেই হবে। নইলে তার জীবনের সমস্ত আশাই ধূলায় লুটিয়ে যাবে।

কিন্তু ট্যুইশনি থেকে ফিরে এসে টিউটোরিয়ালের নোটের পাতা খুলে বসাই মাত্র সার হ'লো, এতটুকুও মন ব'স্‌লো না তাতে। ঘুরে ফিরে নানা সূত্রে ছন্দার কথাটাই কেবল বার বার ক'রে মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। চেষ্টা ক'রেও বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগ ক'রতে পারলো না বিজন।

দিনকয়েক কেটে গেলে সমস্ত বিষয় জানিয়ে নির্ম্মলা চিঠি দিলেন তাকে। নিজের স্বাস্থ্যের কথা জানিয়ে লিখলেন :

> '—ইদানীং শরীর আমার মোটেই ভালো যাইতেছে না। গ্রামে আবার ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। কয়েকদিন ধরিয়া কেমন জ্বর জ্বর বোধ করিতেছি। কেবলই ভয় হয়, কখন্ চক্ষু বুজিয়া চলিয়া যাই। এখানকার ইস্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইয়াছে ; তুমি এ বৎসর পাশ করিয়া আসিলে তিনি এখানে ইস্কুলে তোমাকে চাকুরী দিবেন। যদি হয়, ভগবান তবে মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তোমাকে কাছে পাইয়া আমিও তবে দুইদিন নিশ্চিন্তে বাঁচিতে পারিব। পারো তো ইতিমধ্যে বাড়িতে আসিয়া একবার ঘুরিয়া যাইও। ছন্দা নাই, রেবারাও এখান হইতে যাই যাই করিতেছে। আজকাল বড় একা পড়িয়া গিয়াছি। পারো তো ইতিমধ্যে একবার আসিও।'···

চিঠি প'ড়ে নতুন ক'রে আর-একবার ভাবতে বস্‌ল বিজন।—রেবারাও তবে এতদিনে গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবার উদ্যোগ ক'রছে, অথচ কেন ক'রছে—তার কারণ অজ্ঞাত। সময়ের কি অদ্ভুত ক্রিয়া, ইতিহাসের কি অদ্ভুত ধারা! আসা যাওয়ার পথের পাশে মানুষের শেষ পদচিহ্নটুকু পর্য্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকে না, সময় তার নির্ম্মম হাতে একদিন সব কিছু মুছে নেয়। কালস্য কুটিলা গতি—কালের গতি কোথাও মানুষকে জানানি দিয়ে প্রধাবিত হয় না; তার পথ একেবারেই স্বতন্ত্র, একেবারেই অজ্ঞাত তা মানুষের কাছে। এম্‌নি ক'রেই কালস্রোতে ভেসে চ'লেছে মানুষের জীবন।

কিন্তু তার নিজের সম্বন্ধে মা আজ এ কি ইঙ্গিত ক'রে পাঠালেন! তার শিক্ষার সার্থকতা গিয়ে পৌঁছাবে শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের একটা নগন্য স্কুল-মাষ্টারীতে! ত্রিশ টাকা মাইনের শিক্ষক! এই জন্যেই কি মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে উচ্চ-শিক্ষার অভিলাসে একদিন সে পা বাড়িয়েছিল এই কষ্টস্বীকৃত পথে? মা তাঁর নিজের অভাবটাকেই হয়ত আজ বড় ক'রে দেখতে ব'সেছেন, নইলে তার শিক্ষার মূল্য তিনি অনায়াসে বুঝতেন।—মনে মনে বড় অভিমান হ'লো বিজনের। তাকে বুঝবার মতো আজ তবে এ সংসারে একটি প্রাণীও নেই! কিন্তু বেশীক্ষণ যে অভিমান নিয়ে ব'সে থাক্‌তে পারলো বিজন, তা নয়। আর-একবার চিঠির অক্ষরগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে মায়ের জন্য মমতায়, দুঃখে সারা মন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল তার। নিজের কথাটাকেই বরং এতক্ষণ বড় ক'রে ভাবতে গিয়ে মাকে ছোট ক'রেছে সে। বৈধব্যের ভারে অবনত জীবন, আজ আর এমন লোকটি কেউ নেই—যে আপদে বিপদে দেখতে পারে মাকে। এতদিন ছন্দা থাকতে ঐ প্রশ্ন কখনও মনে জাগেনি। ছন্দার উপর নির্ভর ক'রে সুখ ছিল, রেবা সম্পর্কে সে নির্ভরতার প্রশ্ন কোনোদিনই আসে না। যেমন ক'রে ক্রমেই অসুখে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ছেন মা, কবে না জানি সত্যিই তবে হারাতে হয় তাঁকে। মা-ই যদি সংসারে না রইলেন, তবে কি সুখ তার সে সংসারে?

বিরুদ্ধ দুই চিন্তাসূত্রে কতক্ষণ যে আবদ্ধ উর্ণনাভের মতো নিজের মধ্যে বিপর্য্যস্ত অবস্থায় ব'সে রইল বিজন, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না; পরে একসময় হাতের মুঠোয় কাগজ-কলম টেনে নিয়ে চিঠিটার জবাব লিখতে বসলো মাকে। তার মোটামুটি বক্তব্য হ'চ্ছে—মার শরীরের কথা চিন্তা ক'রে সে অত্যন্ত উতলা হ'য়ে প'ড়েছে। এসম্পর্কে সে তাদের ভাগ-চাষি তসর

আলীকে স্বতন্ত্র চিঠি দিচ্ছে, সে যেন সর্ব্বদা এসে মার খোঁজখবর ক'রে প্রয়োজন মতো হাট-বাজারের কাজকর্ম্মগুলো চালিয়ে দেয়। সাম্‌নে পরীক্ষা এসে যাওয়ায় তার পক্ষে এখন আর মাগুরা যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তার ইচ্ছে নয় যে, এত সত্বরই মা সরস্বতীর পায়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে গ্রামে গিয়ে ত্রিশ টাকার মাষ্টারী করে সে। এতে যেন দুঃখ না পান মা; শিক্ষার একটা স্বতন্ত্রই মূল্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সে মূল্য সে আদায় ক'রে নিতে চায়। ছন্দা চ'লে যাবার পর তবু রেবারা ছিল এতদিন, দু'টো কথা ব'ল্‌বারও অন্ততঃ মানুষ ছিল তবু, আজ কেন যে তারাও হঠাৎ চ'লে যেতে উদ্যোগী হ'চ্ছে—এই কথাটাই আজ তাকে বারবার বিস্মিত ক'রছে। এম্‌নি ক'রেই কি গ্রাম একদিন ফাঁকা শ্মশান হ'য়ে যাবে? আর সেই শ্মশান-ভূমিতে ব'সে খেজুর, তাল আর ঝাউয়ের শাখা গুণে গুণে দিনগত পাপক্ষয় ক'রতে হবে তাদের?

* * *

গ্রাম একদিন সত্যিই ফাঁকা হ'য়ে যাবে কিনা, সেটা অবশ্য দূরের কথা; তবে মিঃ মল্লিক যে আর মাগুরায় থাকতে ভরসা পাচ্ছেন না, একথা নিশ্চিত। নিতান্ত অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই ইতিপূর্ব্বে বিজনকে চিঠি লেখেন নি নির্ম্মলা! মিসেস মল্লিকই একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে তুলেছিলেন কথাটা।

ম্যালেরিয়ার বীজাণু উড়ে বেড়াচ্ছে সারা যশোহরের আকাশ দিয়ে। সেই বিষাক্ত বীজাণু এসে আক্রমণ ক'রেছে মাগুরার মাটিকে। দীর্ঘকালের মধ্যে নাকি এ অঞ্চলে এরকম ম্যালেরিয়া দেখা যায়নি। এটা অবশ্য মিঃ মল্লিকের উক্তি, নইলে এ অঞ্চলের মানুষেরা এমন ম্যালেরিয়ার সঙ্গে পরিচিত জন্মাবধি। গা-সওয়া হ'য়ে গেছে, জ্বরের মধ্যেও তাই অন্নপথ্যটা বাদ যায় না। কিন্তু মিঃ মল্লিক একটু স্বতন্ত্র জাতের মানুষ। চিরকাল সৌখীন প্রকৃতির লোক তিনি। তা ছাড়া রোগপীড়া সম্পর্কে আতঙ্কটা তাঁর চিরকালের। বিশেষ ক'রে কি একখানি বিলেতী জার্ণাল থেকে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে কোন্ এক ইউরোপীয় ডাক্তারের একটা থিসিস্ প'ড়ে রোগটা সম্পর্কে তাঁর আতঙ্ক বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। এখানকার মাটি ত্যাগ ক'রে যেতে পারলে তিনি শ্বাস ফেলে বাঁচেন।

নেপথ্যে আর-একটা কারণও যে না ছিল, এমন নয়। রেবা ক্রমেই বয়সের উর্দ্ধসীমায় এগিয়ে চ'লেছে। এখানে থেকে ওকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার সুযোগ নেই। সারা বংশের একমাত্র মেয়ে, নানা আশা পল্লবিত হ'য়ে উঠচে ওকে

কেন্দ্র ক'রে। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, আচারে, সঙ্গীতে রেবা হবে সবার মূর্ত্তিমতী আদর্শ। অভাব নেই জীবনে। অভাবটা শুধু পরিবেশের। মাগুরার মতো গ্রাম্য মহকুমার বুক আঁক্‌ড়ে প'ড়ে থাকলে কোনোদিকেই রেবাকে উজ্জ্বল ক'রে গ'ড়ে তোলা যাবে না। কিছুদিন থেকেই চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রছিলেন তাই মিঃ মল্লিক। কলকাতায় তাঁদের নিজেদের সমাজের বহু লোক র'য়েছে, আত্ম-পরিজনে ছড়িয়ে র'য়েছে সারা কলকাতা। তারাও আগ্রহ ক'রে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। অতএব আর কালবিলম্ব নয়। অকস্মাৎ যদি ম্যালেরিয়ার অতর্কিত আক্রমণে শয্যাশায়ী হ'য়ে প'ড়তে হয়, সমস্ত আশাই তবে ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে।

দিন দেখে একসময় তাই সত্যি সত্যিই রওনা হ'য়ে প'ড়লেন তিনি কলকাতায়।

আক্ষেপ ক'রে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'সুখে দুঃখে জড়িয়ে ছিলাম এতদিন দিদি, রক্তের সম্বন্ধ ভিন্ন ভাবতেই পারিনি কিছু। এমন ক'রেও আজ কাঁদিয়ে যেতে পারলেন ?'

জবাব দিতে গিয়ে কিছুক্ষণ থামলেন মিসেস মল্লিক, তারপর ব'ল্‌লেন, 'আমিই কি আপনাদের ছেড়ে খুব শান্তিতে যেতে পারছি! উনি হঠাৎ কলকাতায় চিঠি লিখে সব কিছু পাকাপাকি ক'রে ফেললেন বলেই না—'

কথাটা শেষ ক'রতে পারলেন না মিসেস মল্লিক।

রেবা এসে একসময় পাশে দাঁড়িয়েছিল। এবারে সে ঢিপ ক'রে নির্ম্মলাকে প্রণাম ক'রে ব'ললো, 'কখনও কলকাতায় গেলে নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের ওখানে যাবেন মাসীমা। আমি ওখানে পৌছেই ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেবো।'

—'আমার অদৃষ্টে হবে আবার কলকাতা দর্শন!' খেদোক্তি ক'রে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'কবে শুনবি মাসীমা তোদের চক্ষু বুজেছে।' আদর ক'রে রেবার চিবুক স্পর্শ ক'রতে গিয়ে অলক্ষ্যে দু'চোখ ছাপিয়ে জল এসে গেল নির্ম্মলার। ব'ল্‌লেন, 'ধরে রাখবার মতো তো জোর নেই, নইলে ব'লতাম—থেকে যা মা।'

কিন্তু যাত্রাপথ ততক্ষণে প্রসারিত হ'য়ে গেছে নবগঙ্গা-প্লাবিত মাগুরার উপলখণ্ড থেকে বহুজনপদ-পরিকীর্ণ কলকাতার রাজন্য-পরিবেশে।

পিছনে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ধ'রে যে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন নির্ম্মলা —কারুরই তা চোখে প'ড়লো না।

একসময় এসে উঠলেন তাঁরা কলকাতায়। মিঃ মল্লিকের পত্রানুযায়ী আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা হ'য়ে ছিল। রাসবিহারী এভিন্যুর উপর কলাপ্‌-সিবল্ গেটওয়ালা দ্বিতল বাড়ি। সামনে লনের মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বাড়িটা নতুন না হ'লেও একেবারে পুরনো নয়। উপরে নীচে মিলিয়ে তিনখানি শোবার ঘর, তা ছাড়া মাঝারি হল-ঘর একটি। সব দিকেই সুবিধে। ইজিচেয়ারে একসময় টান্‌টান্ হ'য়ে শু'য়ে প'ড়ে একবার আরামের নিশ্বাস টান্‌লেন মিঃ মল্লিক।—'আঃ—, ম্যালেরিয়ার হাত থেকে আপাতত মুক্তি পেয়ে বাঁচা গেল।'

সমস্ত দুর্ভাবনা কাটিয়ে উঠে এতদিনে নিশ্চিন্ত হ'লেন মিঃ মল্লিক।

নয়

ট্যুইশনির কাজ ক'দিন আগেই শেষ হ'য়েছিল। এবারে পরীক্ষা শেষ হ'লে ইচ্ছে ক'রেই দিন কয়েক দৌলতপুরে থেকে গেল বিজন। ইচ্ছেটা অহেতুক নয়। এতদিন মনের উপর দিয়ে তার ঝড় ব'য়ে গেছে, এবারে খানিকটা শান্ত পরিবেশে মনটাকে যথাসম্ভব প্রশমিত ক'রে নিতে চায় সে। ট্যুইশনির টাকা থেকে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গিয়েছিল হাতে। তাই ভাঙিয়েই দিন কয়েক সে ঘুরে বেড়ালো এখানে ওখানে। কিন্তু তাতেও যে শান্তি পেলো—তা নয়। বুদ্ধি দিয়ে সে মনের দুর্ব্বলতাকে যতই ছাপিয়ে উঠতে চেষ্টা ক'রলো, ততই সে মনের মধ্যে বার বার পাক খেয়ে মরলো। হোষ্টেলের সীট ছেড়ে দিয়ে এবারে তাই সুবিধে মতো একদিন দেশের দিকেই রওনা হ'য়ে প'ড়লো বিজন।

নির্ম্মলা অনেকেখানিই শুধরে উঠেছিলেন। তবে শরীরে আজ আর আগেকার মতো বাঁধুনি নেই, অনেকখানিই কৃশ হ'য়ে প'ড়েছেন তিনি।

বাড়িতে এসে মাকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই মায়ের স্বাস্থ্যের দিকটা বিজনের চোখে প'ড়লো। ব'ল্লো, 'শরীরের উপর কি এমন ক'রেও অযত্ন ক'রতে হয়! আমি কাছে নেই ব'লে তোমার নিজের চোখেও কি নিজেকে কখনো ধরা পড়ে নি মা?'

স্মিতহাস্যে নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'এমন বেশী কি হ'য়েছে বাবা! অনেকদিন পরে দেখলে এম্‌নিই মনে হয়। এ কিছু নয়।'

—'একে তুমি কিছু নয় ব'ল্ছো?' মায়ের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দেখলো বিজন।

সস্নেহে ছেলের চিবুক স্পর্শ ক'রে নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'শরীরে যেটুকু গলদ আছে, এবারে তুই দু'দিন আমার কাছে থাক্‌লেই সেটুকু কেটে যাবে বিজু।'

—'আচ্ছা, দেখবো কেমন কাটে!'

উপস্থিত মতো এখানেই কথা শেষ হ'লো বিজনের।

দিন কয়েক কেটে গেলে নির্ম্মলা হিসেব ক'রে দেখলেন—এর মধ্যে স্বতোৎ-সারিত হ'য়ে বিজনের মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরোয় নি। ঠাঁই পেতে খাবার দিয়েছেন তিনি, নীরবে খেয়ে উঠে গেছে বিজন। আগে আগে এই

খাবার নিয়ে কী না ক'রেছে সে! ভালো জিনিষকে ভালো ব'লে চেয়ে নিয়েছে, ডালে কি তরকারিতে কখনও লবণ-কাটা হ'লে 'কি ছাই রাঁধো যে' ব'লে নির্ম্মম হাতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যেও কি কম শান্তি পেতেন নির্ম্মলা! আজ খাওয়া নিয়ে এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই বিজনের, কোনো কিছু নিয়েই এতটুকুও আব্দার নেই। এ যেন কেমনই হ'য়ে গেছে বিজন!

একসময় বাটিতে ক'রে গোটা কয়েক পিঠে এনে তুলে ধ'রলেন তার সাম্‌নে নির্ম্মলা: 'নে ধর, মুখে দিয়ে দেখ তো বাবা, কেমন লাগে! কিচ্ছু তো ক'রতে পারি নি, তবু অনেক কষ্টে ক'টা চাল্‌তের পিঠে বানিয়ে রেখেছিলাম তুই এসে খাবি ব'লে। দেখ তো বাবা, কেমন হ'য়েছে!'

—'বেশ হ'য়েছে, রাখো।' ব'লে পাঠরত কি একখানি ইংরেজি ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় পুনরায় মনঃসংযোগ ক'রলো বিজন।

এম্‌নি ভাবেই আজকাল অধিকাংশ সময় কাটে তার। ঘরে থাকলে নিজের পুরোনো প'ড়বার জায়গায় ব'সে কিছু একখানি বই কিম্বা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় ডুবে থাকে সে, কখনও খেয়াল হ'লে ফাঁকা মাঠ কিম্বা নবগঙ্গার পাড় দিয়ে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চেষ্টা ক'রেছে, চিন্তা ক'রেছে, বিচার ক'রে দেখেছে, কিন্তু মনটাকে সে আজও জয় ক'রে উঠতে পারলো না। প্রতিমুহূর্ত্তে সে মনের মধ্যে পাক খেয়ে ম'রছে।

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'বেশ হ'য়েছে কি রে, মুখে না দিয়েই ও আবার কি কথা! এত কষ্ট ক'রে বানালাম, মুখে দিয়েই না হয় বল!' হাত বাড়িয়ে ম্যাগাজিনখানিকে টেনে নিতে গেলেন নির্ম্মলা, কিন্তু পারলেন না।

রাগত কণ্ঠে বিজন ব'ললো, 'আঃ, বড্ড জ্বালাতে পারো তুমি মা। কি চমৎকার ভাবে রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে প্রবন্ধটা লিখেছে উইলোনস্কি, তুমি আরম্ভ ক'রলে বিরক্ত ক'রতে!'

—'মায়ের এ জ্বালাতন তো আজ নতুন নয় বাবা যে, রাগ ক'রছিস্!' থেমে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'আচ্ছা, তোর কি হ'য়েছে, বল্ তো বিজু?'

—'কি আবার হবে, কিছু না।'

—'আমাকে ফাঁকি দিস নে বাবা। পরীক্ষা দিয়ে এতদিন পরে ঘরে ফিরলি, কোথায় হেসে খেলে দিন কাটাবি, তা নয়—দিন রাত কেবল মুখ ভার ক'রে ব'সে থাকিস। এতে কি আমিই শান্তি পাই?' অলক্ষ্যে বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলেন নির্ম্মলা।

—'মুখ ভার ক'রে থাক্‌তে কোথায় দেখলে মা?' বিজন ব'ল্‌লো, 'এতদিন তো বই মুখস্ত ক'রে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাই দিলাম, তার উপরে আত্ম-পরীক্ষাও তো কিছু আছে! জগতে চ'লতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে আজ ভাববার প্রয়োজন আছে বৈ কি অনেকখানি।'

—'সে প্রয়োজন কি এম্‌নি ক'রেই মেটাবি তবে? সে প্রয়োজনের কাছে আমি পর্য্যন্ত কিছু নই?'

—'তুমি ভিন্ন কি আমি কিছু! তুমি তো র'য়েছই মা।' নির্দ্বিধায় এবারে বাটি থেকে পিঠে তুলে নিয়ে মুখে দিল বিজন। ব'ললো, 'বাঃ, ভারী চমৎকার তো? এর আগে নিশ্চয়ই এ জিনিষ তুমি আর বানাও নি মা, কি বলো?'

এবারে না হেসে পারলেন না নির্ম্মলা, ব'ল্‌লেন, 'সেবার না তৃতীয় সনে হাঁড়িভর্ত্তি বানালাম? ছন্দা আর রেবাকে কাছে বসিয়ে নিজের হাতে খাওয়ালি তুই। এরই মধ্যে ভুলে গেলি?'

—'এতদিনও তা আবার মনে থাক্‌বার কথা নাকি, তুমিও যেমন—।'

পিঠের বাটিটা নিঃশেষ হ'য়েই গিয়েছিল। এবারে পুনরায় ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ ক'রলো বিজন। রাশিয়ার এক সাংবাদিক উইলোনস্কির লেখা: নতুন বল্‌শেভিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে কি ভাবে দ্রুত সমাজ-কল্যাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার জনসাধারণ—এই নিয়ে বিস্তৃত এক সারগর্ভ প্রবন্ধ। প'ড়তে প'ড়তে অভিভূত হ'য়ে গেল বিজন। একটা দেশ এমন ভাবেও ভাবতে জানে, এমন সুন্দর ক'রেও গ'ড়ে তুল্‌তে পারে তার অগণিত জনসংখ্যাকে! নিজের দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে হতাশায় একবার বুকখানি ভ'রে উঠলো তার। সুচতুর ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কেমন সুন্দর ভাবে নিরক্ষরতার আফিং খাইয়ে রেখেছে ভারতবর্ষকে! মনে মনেই একবার উচ্চারণ ক'রলো বিজন: 'ক্ষমা ক'রতে নেই এমন গভর্ণমেণ্টকে।' তারপর ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা বুজিয়ে রেখে একসময় বাইরে বেরিয়ে প'ড়লো সে।

রসিকলালের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো সেই পেয়ারা গাছটা। একদিন এই গাছ থেকে ডাল কেটে নিয়ে সে হকি বানিয়ে তবে ম্যাচ খেলতে গিয়ে জিতে এনেছিল মেডেল। নীচে দাঁড়িয়ে সেদিন পাহারা দিয়েছিল ছন্দা। কত সন্তর্পণ, কত ভয় ছিল সেদিন দু'জনের চিত্তে। আজ তা বাসি হ'য়ে গেছে, বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেছে সেদিনের ইতিহাস। কিন্তু কালের সাক্ষি হ'য়ে গাছটা এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু

সেদিনের মতো গাছটার আজ আর যৌবন নেই। বড় বড় ডাঁসালো পাতার পরিবর্তে আজ কতকগুলো পোকায়-কাটা ছোট ছোট লাল্‌চে পাতায় ভ'রে আছে ক্ষীণকায় ডালগুলো। অতীতের নিশ্চিহ্নতার মতো একেও একদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে হবে মহাকালের গর্ভে।

নানাভাবে আজ বারংবার এসে মনের সাম্‌নে দাঁড়ায় ছন্দা। সেদিনের সেই মেডেল জেতা নিয়েই না কী হুলুস্থুলটাই হ'য়েছিল! স্বপ্ন, একটা স্বপ্ন মাত্র আজ সে সব কিছু।

সাম্‌নের বহির্ব্বাটিতে ব'সে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন রসিকলাল। বছরখানেক হ'লো তিনি বাতে কতকটা পঙ্গু হ'য়ে প'ড়েছেন। বাঁ পায়ের উপর বিশেষ জোর দিয়ে আজ আর হাঁটতে পারেন না। সঙ্গে তাই লাঠি ব্যবহার ক'রতে হয়। আইনের ঘরে তাতে স্বার্থের টান প'ড়েছে। দুশ্চিন্তায় আজ নিজের মধ্যে ব'সে হাবুডুবু খাচ্চেন রসিকলাল। অনেকক্ষণ থেকে ব'সে ব'সে গড়গড়ায় তামাক টান্‌ছিলেন আর জানালার পথে বাইরের দিকে কি যেন অন্যমনস্কভাবে লক্ষ্য ক'রছিলেন তিনি। হঠাৎ বিজনকে চোখে প'ড়তেই সাদরে কাছে ডেকে এনে বসালেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'বাড়ি এলে কবে বিজু? শুনেছিলাম এবার তুমি পরীক্ষায় এপিয়ার হ'চ্চো, শুনে আনন্দ পেয়েছিলাম। তা বেশ ভালো পরীক্ষাই দিয়েছ তো?'

প্রশ্ন দু'টোর একসঙ্গে জবাব দেওয়া কঠিন হ'লো বিজনের পক্ষে। প্রথম প্রশ্নটাকে তাই চেপে গিয়ে ব'ল্‌লো, 'ফার্ষ্ট ডিভিসনে যাবো, আশা ক'রছি।'

শুনে খুসী হ'লেন রসিকলাল। ব'ললেন, 'তোমার বাবার একদিন খুব গর্ব্ব ছিল তোমাকে নিয়ে। তখন তুমি একেবারেই ছোট। একদিন তোমাকে কোলে নিয়ে বেড়াতে এলেন আমার এখানে। কথায় কথায় ব'ললেন, বিজুকে আমার মানুষের মতো মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে। আমি হেসে ব'ল্‌লাম, তাতে সন্দেহ কি! কিন্তু এমন ক'রে যে মনের আশা বুকে চেপে হঠাৎ সংসার ছেড়ে চ'লে যাবেন তিনি, ভাবতেই পারিনি। এক সঙ্গে পুরো চল্লিশ বছর কাটিয়েছি আমরা পাশাপাশি। আজ মনে হয়, তিনি বেঁচে থাক্‌লে তোমার পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর মতো সুখী বোধ করি আর কেউ হ'তেন না।'

কথা ব'ললো না এবারে বিজন, রসিকলালের মুখের দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে নীরবে শুধু ব'সে রইল।

স্বল্পক্ষণ থেমে রসিকলাল ব'ললেন, 'এরপর বি. এ প'ড়ছো তো নিশ্চয়ই ? তোমার মা কি বলেন ?'

—'আমার তো ইচ্ছেই, তবে মার তেমন মত নেই। একা একা মার কষ্ট হয় ব'লেই ছেড়ে দিতে চান না মা আমাকে।' বিজন ব'ললো, 'সংসারে আর কেউ দ্বিতীয় লোক না থাকায় মাকে নিয়ে বাস্তবিকই বড় দুর্ভাবনায় প'ড়েছি। অথচ আমারও পড়াশুনো না ক'রে উপায় নেই, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তো !'

কিছুক্ষণ গড়গড়ায় ধুম-উদ্গীরণ ক'রে রসিকলাল ব'ল্‌লেন, 'সত্যিই বড় অসুবিধায় প'ড়েছ তুমি।'

সে কথার জবাব না দিয়ে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আপনার শরীর আজকাল ভালই যাচ্ছে তো ?'

—'আর ভালো !' হাত থেকে এবারে গড়গড়ার নলটাকে নামিয়ে রাখলেন রসিকলাল।—'শরীর কি আর আছে বাবা, বাতেই আমার সর্ব্বনাশটি ক'রেছে। দু'বেলা সমানে কবরেজি তেল মালিস ক'রেও যদি রেহাই পেলাম !'

—'যন্ত্রণা হয় খুব, তাই না ?'

—'আগে নিয়মিতই হ'তো, এখন একাদশী পূর্ণিমায় বাড়ে, ঠাণ্ডা লাগলে আর কথা নেই, প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়। নরম হাতে বাঁ পা খানিকে একবার তুলে ধ'রতে চেষ্টা ক'রলেন রসিকলাল। ব'ললেন, 'এ-ই বোধ হয় আমার কাল হলো !'

প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'ছন্দার চিঠিপত্র পান কিছু ?'

—'হ্যাঁ, পাই বৈ কি !' রসিকলাল ব'ল্‌লেন, 'আগে প্রতি সপ্তাহেই একখানা ক'রে লিখতো, এখন মাঝে মাঝে লেখে। সংসার ঘাড়ে প'ড়েছে, সময় পায় কোথায় ! তবে সুখে আছে, এইটুকুই যা শান্তি। আমার বেয়াই মশাই বড় ভালো লোক। তাঁর সাজানো সংসারে ছন্দা আজ একমাত্র কর্ত্রী। কোনো অভাব নেই, কোনো তাড়না নেই, বেশ আছে মা আমার।'

বেশ আছে ছন্দা, এইটুকু জান্‌বার জন্যেই মনটা এতক্ষণ উন্মুখ হ'য়ে ছিল, এবারে নিজের মধ্যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস চেপে নিল বিজন। তারপর দু'এক কথায় একসময় বিদায় নিয়ে উঠে প'ড়লো সে। উঠে যে বেশী দূরে গেল, তা নয়। সামনের পথে কিছুটা এগিয়ে আসতেই রেবাদের পরিত্যক্ত বাড়িটার

দিকে দৃষ্টি গেল তার। রেবার জন্যও মনটা একবার উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো। তার বাল্য আর কৈশোরের প্রথম সাথী—ছন্দা আর রেবা। তারা চ'লে গিয়ে বিজনের জীবন-নদীতে যেন রৌদ্রদগ্ধ বিরাট একটা চরের সৃষ্টি ক'রে গেছে। সেই রৌদ্রদগ্ধ মরুসদৃশ চরের বুকে খ্যাপার মতো শুধু পরশপাথর খুঁজে ম'রছে আজ বিজন। দেখলো—বাড়িটা ফাঁকা প'ড়ে নেই। নতুন ভাড়াটে এসেছে। কে একজন আধা-বয়সী লোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকুচে, বিজনকে ইচ্ছে ক'রেই যেন লক্ষ্য ক'রলো না। ক্রমেই আবহাওয়া বদ্‌লাচ্ছে গ্রামের, একদিন সারা গ্রামটাই অপরিচিত হ'য়ে যাবে তার কাছে।

এ-পথে সে-পথে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো পায়চারি ক'রলো বিজন, তারপর সোজা ঘরে ফিরে আবার বই নিয়ে ব'স্‌লো। পরীক্ষার চাপে প'ড়ে অনেকদিন সে কবিতার খাতা নিয়ে ব'স্‌তে পারে নি, এবারে ভাবলো—পর পর অনেকগুলো কবিতা লিখবে। আশ্চর্য্য কি, একদিন বাংলাদেশের মাসিক আর সাপ্তাহিকগুলোর পাতা ভ'রে উঠবে তার কবিতায় আর প্রশংসায়। জীবনের বিস্তার ঘটবে তার দিকে দিকে। আত্মখেয়ালেই মনে মনে একবার রবীন্দ্রনাথকে আবৃত্তি ক'রলো সে :

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।'...

জীবন মানেই বিস্তার, যেখানে গতি নেই—বিস্তার নেই, মানুষ সেখানে বেঁচে থেকেও মৃত। তেমন বাঁচা বাঁচতে চায় না সে। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে গ'ড়ে তুল্‌বে জীবন, সেই জীবনের মধ্যে পল্লবিত হ'য়ে উঠবে সোনার এই বাংলা দেশ ! এ কি স্বপ্ন, একি দুরাশা মাত্র ? সংসারের এই গৃহ-পরিবেশ ছাড়িয়ে চোখের পলকে মনটা যে কোথায় কতদূরে ভেসে গেল, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

দিন দু'য়েক কেটে গেলে একসময় নির্ম্মলা একটা খবর নিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন।—'বিলমামুদপুর থেকে একটি বিধবা মেয়ে এসে আশ্রয় চেয়ে দাঁড়িয়েছে। বছর সাতাস-আঠাস বয়েস, সংসারে কেউ নেই, একেবারে নিরাশ্রিত। দেখ্‌লে মায়া হয়। বলিস্‌ তো রাখি বাড়িতে !'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমি কি বাড়ির কর্ত্তা যে আমাকে জিজ্ঞেস্‌ ক'রছো ?'

—'নয়ই বা কেন!' নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'বাড়িতে কেউ থাক্বে, তোর ইচ্ছে অনিচ্ছেটাও তো আছে!'

—'তুমি থাক্‌তে আমার আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে!' তোমার ইচ্ছেতেই আমার ইচ্ছে।' থেমে বিজন ব'ল্লো, 'রাখো না, ভালোই তো! দিনরাত একা একা ঘরে মুখ বুজে থাক্‌তে হয় তোমাকে, তবু কেউ কাছে থাক্‌লে দু'টো কথা ব'লে দিন কাটাতে পারবে। তা—যাকে রাখছো, ভদ্র ঘরের তো?'

—'ভদ্রঘরের ব'লেই তো ব'ল্‌ছি বাবা।'

এবারে খানিকটা ভাবতে হ'লো বিজনকে। যাকে এখনও অবধি চোখে দেখে উঠতে পারে নি সে, উপস্থিত-ক্ষেত্রে সম্বোধনের বালাই নিয়ে কি আচরণ গ'ড়ে উঠবে তার সঙ্গে, এইটেই সমস্যা। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে পরে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'নাম কি কিছু জেনেছ?'

—'জেনেছি বৈকি, নাম ছাড়া আলাপ হ'লো কি ক'রে! স্মিতহাস্যে নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'অতসী, বেশ নাম।'

—'তা তো যেন বেশ, আমাকে তো কিছু ব'লে ডাক্‌তে হবে, কি ব'লে ডাকবো বলো তো?' কিছুক্ষণের জন্য একবার অপলক দৃষ্টিতে তাকালো বিজন মায়ের মুখের দিকে।

হেসে নির্ম্মলা ব'ল্লেন, 'কেন, দিদি ব'লেই ডাক্‌বি, অতসীদি ব'লে।'

—'তা হ'লে তোমার স্নেহে এবার থেকে ভাগ ব'স্‌লো বলো?' ঠোঁটের কোণে মৃদু একটুক্‌রো হাসি টেনে বিজন ব'ল্লো, 'আমার পক্ষে এতবড় ক্ষতি সহ্য করা শেষ পর্য্যন্ত কি সত্যিই সম্ভব হবে মা?'

—'পাগ্‌লা ছেলে।' ব'লে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ালেন না নির্ম্মলা। হাসতে হাসতেই ফিরে গিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলেন তিনি।...

যথাসময়েই অতসী এসে আশ্রয় নিল। প্রথমটা সংশয় থাক্‌লেও দু' একটা দিন কেটে গেলে দেখা গেল—তার সঙ্গে কেমন ক'রেই যেন ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে বিজন। অতসীর কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার আপ্‌নি থেকেই আকৃষ্ট ক'রেছে তাকে। নির্ম্মলা আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন প্রথমদিনের আলাপেই, এবারে দেখে তিনি খুশী হ'লেন। তার খাবারের পাতে যদি দু'খণ্ড তরকারি বেশী প'ড়লো, অম্‌নি হাত সরিয়ে নিয়ে ব'সলো অতসী: 'এ কিন্তু ভারী অন্যায় মা, পথের মেয়েকে এমন ক'রে ঠেসে ঠেসে খাইয়ে নিজে কি উপোষ দিতে চান?'

—'উপোষ কেন দেবো মা, কিচ্ছু বেশী দিইনি, খাও।' সস্নেহে জোর ক'রলেন নির্ম্মলা।

বাধ্য হ'য়ে এবারে মুখে তুল্‌তে হ'লো অতসীকে।

সুযোগ পেয়ে একসময় বিজন ব'ল্‌লো, 'অম্‌নি ক'রে ঐ কথাগুলো আর নাই বা উচ্চারণ ক'রলে অতসীদি! নিজেকে এমন ক'রে কেবল বাইরের ব'লে কেন ভাবো, বলো তো? সংসারে রক্তের সম্বন্ধটাই কি বড়, জীবনের সম্পর্কটা কিছু নয়?'

এবারে থাম্‌তে হ'লো অতসীকে। জীবন ব'লে আজ আর তার সাম্‌নে কিছু নেই। জীবনটা কবেই অতীতের বিস্মৃতির গর্ভে তার তলিয়ে গেছে। আজ শুধু কাঙালচিত্তে দুয়োর থেকে দুয়োরে কেবল ঘুরে মরা। তবু নিজেকে অনেকখানি চেপে নিয়ে তাকে ব'ল্‌তে হ'লো: 'আচ্ছা, আর ব'ল্‌বো না। জীবনে যার ভাইয়ের স্নেহ এত বড়, সে নিঃস্ব কিসে?'

উত্তরে কিছু একটাও আর না ব'লে নীরবে এসে আবার গ্রন্থসাগরে ডুবে গেল বিজন।

যথাসময়ে তার পরীক্ষার ফল জানিয়ে দৌলতপুর হোষ্টেল থেকে চিঠি এসে পৌঁছালো। ফার্ষ্ট ডিভিসনেই সে পাশ ক'রেছে বটে, কিন্তু একটা 'লেটার'ও অদৃষ্টে জোটেনি। বাংলা সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু আশা ছিল তার, কিন্তু সে আশা এবারে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। আত্মধিক্কারে মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠলো। কবিতার খাতায় আর কলম চ'ল্‌তে চাইল না। বিষণ্ণ মনে একসময় খাতাখানি বুজিয়ে রাখল বিজন।

কিন্তু নির্ম্মলার কাছে ছেলের পাশের সংবাদটাই যথেষ্ট হ'লো! তাই নিয়েই তিনি স্থানীয় স্কুলের হেড্‌ মাষ্টার থেকে সুরু ক'রে কাছাকাছি অনেককেই নিমন্ত্রণ ক'রে জলখাবার খাওয়ালেন। সবাই এসে দীর্ঘায়ু আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা ক'রে গেল বিজনের। কিন্তু কোনো আশীর্ব্বাদই প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ ক'রতে পারলো না বিজন। এমন কি, কথা প্রসঙ্গে হেড্‌মাষ্টার মশাই যখন তাকে স্কুল-মাষ্টারী গ্রহণ ক'রবার জন্য নানারকম উৎসাহ বাচক উক্তি ব্যবহার ক'রলেন, তখনও সে নির্ব্বিকার ভাবেই নিজের অক্ষমতা জানিয়ে প্রত্যাখ্যান ক'রলো বিষয়টাকে। মনে মনে সে স্থির ক'রলো—এবারে কল্‌কাতা গিয়ে বি-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হবে। আজব নগরী কল্‌কাতা রাজধানী। বড় হবার এবং অধঃপাতে যাবার দু'টো পথই

প্রশস্ত সেখানে। তার মধ্যে প্রথমটা সম্পর্কে একটা দুরন্ত আশায় মনে মনে ছুটে বেরিয়েছে সে এতদিন কল্‌কাতার রাজপথে। বিশ্ববিদ্যালয়, লাট সাহেবের বাড়ি, মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ, মোহনবাগানের খেলা—সব কিছু মিলিয়ে কল্‌কাতা একটা অদ্ভুত স্বপ্নের দেশ। সেখানে মনটা যে আপনি থেকেই বড় হ'য়ে ওঠে। মনের ইচ্ছেটাকে তাই একসময় মার কাছে ব্যক্ত ক'রে ব'স্‌লো সে।

শুনে মুখখানি শুকিয়ে গেল নির্ম্মলার। ব'ল্‌লেন, 'আমাকে তবে আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই ফেলে রেখে যাবি তো ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'অন্ধকারটাই শুধু দেখ্‌লে, সাম্‌নের আলোর পথটা তোমার চোখে প'ড়লো না ? ত্রিশ টাকার আই-এ পাশ স্কুল-মাষ্টারীই ভালো, না বি-এ, এম্‌-এ পাশ ক'রে জীবিকার্জ্জনের সম্মানজনক উঁচু কোনো পথ বেছে নেওয়াই শ্রেয়, তুমিই বলো মা ?'

কথা ব'ল্‌লেন না নির্ম্মলা।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'ঘরে আজ অতসীদি র'য়েছে, তোমার ভাবনা কি ?'

—'না, ভাবনা কি!' নীরবে বুকের মধ্যে দুঃখ চেপে নিয়ে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'তোর শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো, আমি কি তোর তেমন মা বিজু ? কল্‌কাতা কেন, বড় হ'য়ে একদিন তুই বিলেত যা না, হাসিমুখেই আমি আশীর্ব্বাদ ক'রবো।'

—'এ কি তুমি সত্যিই স্বাভাবিক মনে ব'ল্‌ছো মা ? এটা তোমার দুঃখের উক্তি।'

—'না রে না, দুঃখ ক'র্‌তে যাবো কিসের জন্যে ! যার এমন বুক-জুড়ানো সোনার টুকরো ছেলে, তার আবার দুঃখ কিসে!' কৃত্রিম একবার হাস্‌তে চেষ্টা ক'রলেন নির্ম্মলা, তারপর পুনরায় ব'ল্‌লেন, 'আমি ভাবচি অন্য কথা ; কল্‌কাতার মতো জায়গায় তোর খর্‌চা পোষাবে কি ক'রে ?'

কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রেই বিজন ব'ল্‌লো, 'শুনতে পাই কল্‌কাতার আকাশ দিয়ে টাকা উড়ে যায়। দৌলতপুরে ট্যুইশনি পেলাম, আর কল্‌কাতায় পাবো না ? চেষ্টা ক'র্‌লে দু'চার দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু একটা ক'রে নিতে পারবো, এ তুমি দেখে নিও মা।'

আর কথা বাড়াতে গেলেন না নির্ম্মলা। অতসীকে সঙ্গে নিয়ে একসময় ভাঁড়ারের কাজে গিয়ে মন দিলেন তিনি।

দিন দেখে কল্‌কাতার পথে একসময় রওনা হ'য়ে প'ড়লো বিজন। অতসী ব'ল্‌লো, 'এমন অনাত্মীয় দিদিটাকে গিয়ে ছ'দিনেই ভুলে যাবে তো বিজু ভাই ?'

হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'তুমি মনে রাখলেই দেখবে আমি ভুলিনি। কাছে থেকে যার স্নেহ তুমি শুষে নেবে, এ কি দূর থেকে সত্যিই আমি সহ্য ক'রতে পারবো ? চিঠির আশ্রয় আমাকে বাধ্য হ'য়ে নিতেই হবে, তার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না।'

অতসী না ভাবলেও মনে মনে দুর্ভাবনায় পুড়ে ম'রতে লাগ্‌লেন নির্ম্মলা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে আগে যত উৎসাহ বাক্যই উচ্চারণ করুন্‌ না কেন তিনি, বিজনের যাত্রাপথে কিন্তু চোখের জল গোপন না ক'রে পারলেন না নির্ম্মলা। কাঞ্চনভূমি কল্‌কাতা : বিজনকে একদিন সে সুস্থ ভাবে ফিরিয়ে দেবে তো আবার এই গ্রামে ?

দশ

স্বপ্নের কল্‌কাতা এতদিনে বাস্তবের রূপ নিয়ে ফুটে উঠলো বিজনের চোখে। সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় একসময় এসে উঠলো সে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের একটা মেসে। থ্রি সিটেড রুম। অপর দু'জনের একজন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, নাম অরুণ ; অন্যজন শিক্ষিত বেকার, সঙ্গতি-সম্পন্ন ঘরের মধ্যবয়স্ক যুবক, খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে শেয়ার মার্কেটে গিয়ে ঢু মেরে আসে আর মেসের বোর্ডারদের কাছে আজগুবি সব ফট্‌কা বাজারের গল্প ব'লে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রে তোলে ; নাম মহেন্দ্র। তাই ব'লে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় সে গম্ভীর নয়, বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গেই সে সকলের সঙ্গে যুক্ত। বোর্ডারদের সে মহিন্‌দা। মনটা উদার এবং পরোপকারী। কলেজে ভর্ত্তি হবার পর কিছুদিন কেটে গেলে একসময় এই মহেন্দ্রের সাহচর্য্যেই টাকা ত্রিশেকের একটা ট্যুইশনি সংগ্রহ ক'রে নিল বিজন। এই ত্রিশ টাকাই তার প্রতি মাসের মূলধন। এই দিয়েই কলেজের মাইনে, মেসের খরচা, টিফিন আর ধোপা-নাপিতের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ ক'রে চ'ল্‌তে হবে। গোড়া থেকেই তাই হিসেবের একটা মোটামুটি ফিরিস্তি ক'রে নিল সে।

ঠাট্টা ক'রে একসময় মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'বি-এ পাশ ক'রে আজকাল চাক্‌রীর জন্যে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুড়ে বেড়ায় ছেলেরা। কোন্ বুদ্ধিতে যে আর্টস্ নিয়ে ভর্ত্তি হ'লে, তুমিই জানো। বিজ্ঞানের পথে আজ পৃথিবী কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো না ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'পাচ্ছি বৈ কি ! কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর্টস্ যে পৃথিবীর প্রয়োজনের জগতে একদিন সত্যিই বাতিল হ'য়ে যাবে, একথা গ্রহণ ক'রতে পারছি না মহিন্‌দা। বাষ্পে ইঞ্জিন চলে জানি, কিন্তু মানুষ তো বাষ্প আর ইঞ্জিন নয়, তার যে প্রাণ ব'লে একটা স্বতন্ত্র বস্তু আছে, সেখানে আর্টসেরই একাধিপত্য !'

—'অস্বীকার করি না।' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কিন্তু তাতে আজকের দুনিয়ায় অর্থকরী সুখ নেই। দেশে তো এত গায়ক আর কবি আছে, সুখে দু'গ্রাস ভাত মুখে তুলতে পারছে ক'জন ? বরং তাকিয়ে দেখ একজন ইঞ্জিনিয়ার

কিম্বা একজন কার্পেণ্টারের দিকে, দেহের সমস্ত স্বাস্থ্য জুড়ে তার কি সুখের চিহ্ন ফুটে উঠেছে!'

মনে মনে এবারে অনেকখানি আশাহত হ'য়ে প'ড়লো বিজন। হয়ত তার নির্ব্বাচিত পথ ঠিক পথ নয়, হয়ত পাশ ক'রে বেরিয়ে শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের স্কুলের ত্রিশ টাকা মাইনের মাষ্টারীর মতও একটা চাকরী পাওয়া কঠিন হ'য়ে উঠবে। তবু শিক্ষা সম্পর্কে তার দৃঢ় প্রত্যয় চিরকালের; শিক্ষা মানেই তো কিছু একটা অর্থকরী বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ নয়, শিক্ষা বস্তুটা যে আসলে তার চাইতেও উন্নত কিছু। থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'কিছু একটা কেন্দ্রধর্ম্মী শিক্ষাই গোটা একটা জাতির ঐতিহ্যের পক্ষে যথোপযুক্ত নয় মহিন্‌দা। কোনো একটা দেশের গৌরব শুধু তার কতকগুলো লোহা-লক্করের কারখানা আর বাষ্পযান নিয়েই নয়, গৌরব তার শিল্পী, কবি আর শিক্ষাবিদকে নিয়ে। রাশিয়ার মতো, বৃটেনের মতো স্বাধীন দেশগুলোতে এটা একটা প্রশ্নই নয়।'

কথার সূত্রপাত ক'রেছিল মহেন্দ্র ঠাট্টাসূচক ভাবেই, কিন্তু মধ্যপথে এসে দেখলো—কথাটাকে কেন্দ্র ক'রে বিজন অনেক দূর অবধি এগিয়ে এসেছে। এতটা আশা করেনি মহেন্দ্র, শুধু তাই নয়, এমন সুন্দর ভাবে যে তর্ক ক'রতে পারে বিজন, এটাও কল্পনা ক'রতে পারেনি মহেন্দ্র। স্বল্পক্ষণ থেমে হাতের ঘড়ির দিকে একবার লক্ষ্য ক'রে সে ব'ল্‌লো, 'কিন্তু ভারতবর্ষের মতো দেশে এটাই আজ বড় প্রশ্ন। শুধু এক জীবিকার্জ্জনের সমস্যাতেই এ দেশের শিক্ষা মধ্যপথে এসে থেমে গেছে। দেশের অদৃষ্টে শনিগ্রহ আর কি, তুমি আমি কি ক'রতে পারি বলো?' তারপর থেমে অরুণের দিকে ইঙ্গিত ক'রে ব'ল্‌লো, 'চালাক ছেলে অরুণ, কাজের পথ বেছে নিয়ে দিব্বি বহালতবিয়তে আছে।'

আলোচনায় এতক্ষণ অরুণের কান থাক্‌লেও চোখ দু'টো ছিল কি-একখানি বইয়ের পৃষ্ঠায় নিবদ্ধ। এবারে মুখ তুলে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কি রকম?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'রকম আর কি! দু'দিন পরে পাশ ক'রে বেরিয়ে দেশের একটা এ্যাসেট্ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছ। কোথাও গিয়ে পুল ভাঙছো, কোথাও গিয়ে পুল কন্‌স্ট্রাক্ট্ ক'রছো। মা লক্ষ্মী এসে পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌বেন।'

—'ফুল চন্দন পড়ুক মুখে আপনার মহিন্‌দা।' অরুণ ব'ল্‌লো, 'কিন্তু এই জোড়হাত ক'রছি, এবারে দয়া ক'রে বাইরে কোথাও থেকে কিছুক্ষণ ঘুরে আসুন। চ্যাপ্টারটা ততক্ষণে শেষ ক'রে ফেলি।'

—'ডেঞ্জারাস্ ছেলে রে বাবা, ঘরে ব'সে দু'টো কথা ব'ল্তেও দেবে না দেখছি।' হেসে মহেন্দ্র ব'ল্লো, 'চলো, বাইরে যাবে নাকি বিজন, কিছুটা ঘুরে আসি। একদিনেই কিছু একটা ইঞ্জিনিয়ার না হ'য়ে ছাড়বে না দেখছি ছেলেটা।'

আপত্তি ক'রলো না বিজন। কল্‌কাতার পথঘাটগুলো ভালো ক'রে চিনে নেবার দরকার। পাকা লোক মহেন্দ্র, তার সঙ্গে বেরোলে কাজ হবে। তা ছাড়া যে উপকার ক'রেছে সে, সে জন্য তার কাছে বিজন ঋণী। সার্টটা গায়ে দিয়ে একসময় তাই বেরিয়ে প'ড়লো সে মহেন্দ্রের সঙ্গে।

অরুণ ব'ল্লো, 'ডোণ্ট্ মাইণ্ড্, কিছু মনে ক'রলেন না তো মহিন্দা ?'

—'মনে ক'রলেই কি কথাটা তুমি ঘুরিয়ে নেবে ? নাও, যত পারো ঠেসে পড়ো। আমরা চ'ল্লাম স্কোয়ার প্যারাডাইসে। যা গরম প'ড়েছে, দু'গ্লাস সরবতের অর্ডার দিয়ে পাখার নীচে গিয়ে ব'সে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসি কিছুক্ষণ।'

ইচ্ছে ক'রেই কথাটার উল্লেখ ক'রলো মহেন্দ্র। সে জানে—পৃথিবীতে ঐ একটি মাত্র বস্তু সরবৎ—যার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য অরুণের পক্ষে। এবারে সেও উঠে এলো ব'লে !

কিন্তু যায়গা ছেড়ে এতটুকুও ন'ড়লো না অরুণ, বরং মুখের এমন একটা অদ্ভুত ভাব ক'রলো যে, সরবৎ সম্পর্কে কোনোকালেই যেন তার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই।

পথে এসে মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেমন লাগছে ট্যুইশনি ?'

বিজন ব'ল্লো, 'ও আর লাগালাগি কি ! অভ্যাস আছে, প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। আসলে টাকাটাই আমার দরকার।'

থেমে মহেন্দ্র ব'ল্লো, 'বড্ড সিরিয়াস তুমি যাই বলো।'

—'অর্থাৎ ?'

—'অর্থাৎ—ঠাট্টা ক'রলেও সেটুকু বোঝো না।'

—'মানে, আর্টস্ সম্পর্কে এতক্ষণ আপনি আমাকে ঠাট্টা ক'রছিলেন, এই তো ?'

—'বুঝেছ তবে ?'

দু'জনেই এবারে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি টেনে নিল মুখে। প্রথম দিনের প্রথম দর্শনেই বিজনকে কেন যেন ভালো লেগে গিয়েছিল

মহেন্দ্রের। একথা সে নিজেও বুঝতে পারেনি। সংসারে এমন এক একটি মানুষ আছে, যাকে দেখলেই চিত্তে প্রীতির ছায়া পড়ে। বিজনকে দেখেও এমন্‌টাই হ'য়েছিল মহেন্দ্রের। কিন্তু সে-প্রীতি বেগবতী নদীর মতো খরস্রোতা নয়, শান্তপ্রবাহিত তটিনীর মতো মৃদু। অল্পদিনের মধ্যেই তাই ঘনিষ্ট হ'য়ে উঠতে বাধা থাকেনি। কিন্তু সঙ্কোচ ছিল এক যায়গায়। কেউ কারুর কাছে জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধ'রতে পারেনি। এবারে স্কোয়ার-প্যারাডাইসে এসে সরবতের টেব্‌লে ব'সে সে-সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে কারুরই বড় বেশী সময় লাগ্‌লো না।

সূচনাটা মহেন্দ্রই ক'রলো।—'জানো বিজন, আর্টস্‌ সম্পর্কে তোমাকে ওকথা ব'ল্‌বার মানে আছে। এককালে ভালো ছবি আঁক্‌তে পারতাম আমি, স্কুলে ড্রইং-মাষ্টারের কাছে সবার চাইতে বেশী নম্বর পেতাম। তাই ব'লে যে আর্টস্‌ স্কুলে ভর্ত্তি হ'তে পার্‌লাম, তা নয়। স্কুল ছেড়ে অডিনারী কোর্সেই কলেজে ঢুকলাম, তারপর গ্রাজুয়েট হ'য়ে বেরোলাম। কিন্তু ছবির নেশা যে ত্যাগ ক'রতে পারলাম, তা নয়। একদিন জীবিকার্জ্জনের পথে পা বাড়াতে গিয়ে দেখলাম, বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে আমার কাণাকড়িও মূল্য নেই, না আমার ছবির—না আমার ডিগ্রীর; সংসার আমার কাছ থেকে কোনোদিন কিছু আশা করে না ব'লেই উদরপূর্ত্তির দিকটায় রক্ষা পেয়ে গেছি। আপাতত শেয়ার মার্কেটের দালালরাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বিজন এবারে তার পাল্টা জবাবে নিজের কাব্যসাধনা থেকে ভবিষ্যৎ-জীবনের আশা অবধি কোনো কিছুই না লুকিয়ে পরে একসময় ব'ল্‌লো, 'গ্রাজুয়েট হ'য়েও আপনি জীবনে সাচ্চা কিছু ক'রে নিতে পারলেন না মহিন্‌দা? শেষ পর্য্যন্ত শেয়ার মার্কেট?'

—'কেন, খারাপ কি?' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'মস্তিষ্কে কিছু ঝানু বৈষয়িক বুদ্ধি থাকলে ওখান থেকে অবস্থা ফিরিয়ে নিতে বেশীক্ষণ নয়। মাছের তেলে মাছ ভাঁজা। বিনে মূলধনে এমন সসম্মানী রোজগার তুমি কল্পনাই ক'র্‌তে পারো না বিজু।'

হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'তবে দিন না আমাকেও কিছু ব্যবস্থা ক'রে!'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাতের এক বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'ও পথ তোমার পথ নয়। তুমি ভিন্ন জগতের মানুষ। একদিন নিজের পথ তুমি নিজেই আবিষ্কার ক'রে নিতে পারবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজকের

জীবনটাকে মাটি ক'রে দিও না। জীবনের এ দিনগুলো গেলে আর ফিরে আসে না।'

—'কিন্তু সব কিছুর চূড়ান্ত অধ্যায় যে অর্থনীতি, এ কথা ইকোনমিক্স্ প'ড়েই বুঝতে পারছি।' সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে খানিকটা কথালো হ'য়ে উঠলো বিজন : কাব্যসাধনা আর অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন, জীবনধর্ম্মের একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ই বটে !'

সরবতের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে মহেন্দ্র ব'ল্লো, 'বোঝা কেবল সুরু, আগে শেষ করো, পরে না হয় আর্থিক দুনিয়ায় প্রবেশের পথ খুঁজবে! কল্কাতার আকাশ দিয়ে টাকা উড়ে যায়, মগজে বুদ্ধি থাকলে ধ'রতে কতক্ষণ !'

বিষয়টা নিয়ে আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না বিজন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগেই। আলোকোজ্জ্বল কল্কাতার রাজপথ। আবার এসে পথে নেমে প'ড়লো দু'জনে। পরের দিন কলেজে পড়ার চাপ নেই বিশেষ। বেশ লাগছে বাইরের আবহাওয়াটাকে। বিজন ব'ল্লো, 'কি হবে এক্ষুণি আবার ঘরে ফিরে, চলুন না খানিকক্ষণ বেড়াই মহিন্দা! রাস্তা-ঘাটগুলো তবু কিছু চিনে নিতে পারবো।'

আপত্তি ক'র্লো না মহেন্দ্র, জিজ্ঞেস্ ক'র্লো, 'কোন্ দিকে যাবে বলো ?'

—'দিক কি আমার কিছু জানা আছে!' থেমে কি একটা চিন্তা ক'রে বিজন ব'ল্লো, 'রাসবিহারী এভেন্যুটা কোন্দিকে, চলুন না, চিনে আসা যাবে !'

কৌতূহলের দৃষ্টি তুলে মহেন্দ্র জিজ্ঞেস ক'র্লো, 'কেন, আছে নাকি কেউ?'

—'না, কে আবার থাকবে!' সত্যকে চাপা দিয়ে বিজন ব'ল্লো, 'বালিগঞ্জ অঞ্চলে নাকি সেরা রাস্তা, দেখতে কৌতূহল হয় বৈ কি!'

মহেন্দ্র ব'ল্লো, 'বালিগঞ্জে তো এমন একাধিক রাস্তাই নাম করা, তা ফেলে হঠাৎ রাসবিহারী এভেন্যুই বা কেন ? কোকিল ডাকে নাকি সেখানে ?'

—'কল্কাতার অভ্যস্ত জীবনে সে তো আপনিই ভালো জানেন।' থেমে বিজন বল্লো, 'নিন্, ঠাট্টা রাখুন, যাবেন তো চলুন !'

—'চলো।'

সাম্নেই একখানি ডবল ডেকার পেয়ে দু'জনে এসে চেপে ব'সলো তাতে। এই প্রথম চাপলো বিজন ডবল ডেকারে। উপরতলার সীটে ব'সে বেশ লাগতে লাগলো দু'পাশের আলোময়তাকে। এ না হ'লে কলকাতা! কিন্তু তক্ষুণি

একটা বিষয় অলক্ষ্যে হঠাৎ খচ্ ক'রে এসে মনে বিঁধলো। বাংলার শত শত গ্রামকে শুষে নিয়ে তবে গ'ড়ে উঠেছে এমন ঐশ্বর্য্যময়ী নগরী। অন্ধকারে পঙ্কিলতা নিয়ে ম'রছে গ্রামগুলো। গ্রামবাসীদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে কিছুমাত্র জড়িত নয় রাজধানীর নাগরিকেরা। কিন্তু এ চিন্তা বেশীক্ষণ অভিভূত ক'রে রাখতে পারলো না তাকে।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে যেতেই টাল সাম্‌লাতে না পেরে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে প'ড়েছিল বিজন, দু'হাতে মহেন্দ্র তাকে তুলে ধ'রে ব'ল্‌লো, 'একেই বলে বাঙাল। সবে বালিগঞ্জে যাত্রা, কতবার যে বেসামাল হ'তে হয়, তার কি কিছু ঠিক আছে!'

লজ্জিত কণ্ঠে বিজন ব'ললো, 'হাত ফস্কে যাবার ব্যাপারে কি বাঙাল অবাঙালের কোনো প্রশ্ন আছে! এমন বেসামাল কখনো আপনাকেও হ'তে হয়। হয় না কি বলুন?'

—'ব'লবার মতো মনে প'ড়ছে না কিছু।'

ড্রাইভারের হাতে মুহুর্মুহুঃ বেজে উঠচে ভ্যাঁপু। দ্রুত গতিতে ছুটে চ'লেছে বাস: ডবল ডেকার।

রসা রোড আর রাসবিহারী এভেন্যুর মোড়ে এসে বিজনকে নিয়ে পথে নেমে প'ড়লো মহেন্দ্র। আঙুলের নির্দ্দেশে বুঝিয়ে দিয়ে ব'ললো, 'এদিকটা সোজা গিয়ে মিশেছে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে। যেতে হ'লে আবার নতুন ক'রে বাস ধ'রবার দরকার। তার চাইতে এস, ডাইনে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে কেওড়াতলায়; চলো, মহাপ্রলয়ের রূপ দেখিয়ে আনি তোমাকে।'

ক্রমে এসে দাঁড়ালো তারা কেওড়াতলা শ্মশানভূমিতে।—দাউ দাউ ক'রে উঠেছে চিতাগ্নি। বিলাপের সুর ভেঙে প'ড়ছে মানুষের কণ্ঠ থেকে। কেমন একটা শ্মশানবৈরাগ্যে ধীরে ধীরে যেন বিজনের মনটা আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে লাগলো। চুল্লীর ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছিল। আর অপেক্ষা না ক'রে পিছনের পথ ধ'রলো মহেন্দ্র। ব'ললো, 'জীবনের শেষ পরিণতির সঙ্গেই আজ প্রথম পরিচয় ঘটলো তোমার বিজু, কিন্তু জীবনের স্বপ্নময় প্রারম্ভ দেখবারও অবকাশ আছে এখানে; সেটা বালিগঞ্জ লেক। অন্য কোনোদিন সন্ধ্যাসন্ধ্যি এসে বসা যাবে সেখানে। আজকের মতো ফিরি চলো।'

—'চলুন।' কথাটা ব'লতে গিয়ে গলায় একবার বাধলো বিজনের। আসলে এমন আবহাওয়ায় এসে দাঁড়াবার জন্য মনটা তার প্রস্তুত ছিল না।

রাসবিহারী এভেন্যুটা চিন্‌বার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তার রেবাদের বাড়িটা খুঁজে বার করা। ঠিকানাটা ইতিপূর্ব্বেই মার কাছ থেকে পেয়েছে সে। পয়ষট্টির চারের তিনের এক। কিন্তু মনের কথাটা বাধ্য হ'য়েই মনের মধ্যে চেপে যেতে হ'লো তাকে। উপায় নেই। জান্‌তে পারলে মহেন্দ্র তাকে বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত ক'রে মারবে। তার চাইতে পথের নিশানাটাই আজকের পক্ষে যথেষ্ট।···

আবার এসে চেপে বস্‌লো তারা গাড়িতে। এবারে আর বাসে নয়, ট্রামে।

মেসে যখন এসে পৌঁছালো তারা, রাত তখন দশটা বেজে গেছে। খাওয়া দাওয়ার পাট প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল; শুনতে পেলো মহেন্দ্র—ভাত ঢেকে রাখা নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা বিরক্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে তুলেছে উড়ে ঠাকুর। অন্যদিন হ'লে তার সঙ্গে প্রাত্যহিক নিয়মে ঝগড়া ক'রতো মহেন্দ্র, কিন্তু আজ কেন যেন কিছুমাত্র প্রতিবাদ না ক'রে শুধু ঘরে এসে নিঃশব্দে জামা কাপড় ছাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো সে।

এগারো

সামনেই একটা ছুটির দিন পেয়ে বিজন এবারে একাই রওনা হ'য়ে প'ড়লো রাসবিহারী এভেন্যুতে। কল্‌কাতার বড় রাস্তাগুলো চিনে উঠ্‌তে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে। একদিকে মহেন্দ্র, অন্যদিকে অরুণ—মহানগরীর সঙ্গে বিস্ময়কর পরিচয়ের ব্যাপারে দু'জনের সাহচর্য্য এসে যুক্ত হ'য়েছে দু'দিক থেকে। রাস্তাগুলো তাই অল্প দিনের মধ্যেই সহজ হ'য়ে উঠ্‌লো তার কাছে।

রাসবিহারী এভেন্যুতে এসে বাড়িটা খুঁজে পেতে বিলম্ব হ'লো না তার। পঁয়ষট্টির চারের তিনের এক। কলাপ্‌সিবল্‌ গেট্‌ওয়ালা দ্বিতল বাড়ি। সাম্‌নে লনের মতো খানিকটা ফাঁকা জায়গা। গেট্‌ পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল মিঃ মল্লিকের সঙ্গে। বিজন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে তাঁকে প্রণাম ক'রতে যেতেই বাধা দিয়ে সোৎসাহে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'হ'য়েছে, হ'য়েছে, পায়ে হাত ছোঁয়ালেই কি বেশী কিছু ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো হয় নাকি! তারপর—কল্‌কাতায় এলে কবে?

—'এই কিছুদিন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিজন ব'ল্‌লো, 'দৌলতপুর থেকে আই, এ পাশ ক'রে এখানেই এখন বি, এ পড়ছি।'

—'বাঃ, চমৎকার, 'ইট্‌ ইজ এ ভেরি গুড নিউজ।' খুসীর হাসি হেসে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'চলো, ভিতরে চলো, তোমার মাসীমার সঙ্গে দেখা করবে; কত খুসী হবেন তিনি!' এবং ভিতর মহলে প্রবেশ ক'রতে ক'রতেই স্ত্রীর উদ্দেশে গলা তুললেন তিনি: 'ওগো শুন্‌ছো, দেখ কে এসেছে! সেদিনের বিজু আজ বি, এ, প'ড়ছে, হাউ স্‌প্লেন্‌ডিড!'

মিঃ মল্লিকের অনুগমন ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'কেন, চিরকালই ছোট থাক্‌বো, তাই কি ব'ল্‌তে চান মেসোমশাই? তা ছাড়া আই, এ, প'ড়তে তো দেখেই এসেছিলেন আমাকে। আই, এ'র পরে বি, এ ছাড়া স্বাভাবিকতার দিক দিয়ে আর কিই বা হতে পারতো!'

—'না, না, বেশ ক'রেছ, ভালো ক'রেছ তুমি। আফটার অল্‌ ইউ আর এ্যান্‌ আইডিয়াল।'

সাম্‌নে এসে মিসেস্‌ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'উঃ, কতদিন পরে তোমাকে দেখলাম বিজু! তুমি যে কল্‌কাতায় আস্‌বে, ভাবতেই পারি নি।'

—'নিজে উদ্যোগ না ক'রলে অবিশ্যি আসা হ'তো না, মার মত ছিল না।' ব'লে মিসেস্ মল্লিককে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো বিজন।

—'ষাট ; দীর্ঘজীবী হও।' বিজনের মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিয়ে মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'রলেন: 'দিদির শরীর ভালো আছে তো ?'

—'খুব ভালো বলা চলে না, আছেন কোনোরকম।'

—'বড় দেখতে ইচ্ছে হয় দিদিকে, কতদিন দেখি না।' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'তোমাকে ছেড়ে দিদির খুব কষ্ট হবে।'

বিজন ব'ল্লো, 'জানি। এবারে তাই বাড়িতে একজন প্রতিভূ রেখে তবে ঘর থেকে বেরিয়েছি।'

—'তবু ভালো।'

দ্বিতলের সিঁড়ি ভেঙে রেবাকে নেমে আস্‌তে দেখা গেল এই সময়ে। কাছে এসে কিছু ব'ল্‌বার আগেই বিজন ব'ল্লো, 'খবর কি, ভালো আছো ?' সঙ্গে সঙ্গে রেবার বেশ-বাসের পরিবর্ত্তনটাও লক্ষ্যে প'ড়লো বিজনের। নাগরিক আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে তার সর্ব্বাঙ্গে। মনে হ'চ্চে—লম্বায় চওড়ায় আরও অনেকখানি বেড়েছে সে ইতিমধ্যে। আজ আর মাগুরার সেই রেবা নেই, তার উজ্জ্বল মুখখানিতে কল্‌কাতার রাজকীয় ছাপ ঝ'ল্‌সে যাচ্ছে। আগের চাইতে আরও সুন্দর হ'য়েছে রেবা !

কাছে এসে মিষ্টি হেসে রেবা ব'ল্লো, 'আমাদের খবর তো ভালোই, তা—তুমি হঠাৎ কল্‌কাতায় উড়ে এলে কেমন ক'রে ?'

—'যদি বলি এরোপ্লেনে, সেটা বিশ্বাস্য হবে না, অতএব ট্রেনে। এবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারো।'

—'আছো তো কিছুদিন, না হঠাৎই আবার চ'লে যাবে ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলো রেবা।

এবারে বিজনের কথাটা মিঃ মল্লিকই ব'লে দিলেন : 'চ'লে যাবে কি রে, বিজু যে এখানে বি, এ প'ড়ছে !' তারপর থেমে জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'তোমার নতুন কবিতা কবে শোনাচ্ছ বিজু, বলো ? বহুকাল তোমার কবিতা শুনি না।'

জবাব দিতে দিয়ে এবারে প্রথমটা থাম্‌তে হ'লো বিজনকে। পরে ব'ল্লো, 'কবিতা লেখা প্রায় ভুলেই গেছি মেসোমশাই। অনেকদিন আর ওকাজে কলম ধরিনি।'

মিঃ মল্লিক ব'ল্লেন, 'সে কি, ফ্যাকাল্টি থেকে বিরত থাকা, সে তো সহজ কথা নয়! একদিন আমি যে যশোহরে নতুন মাইকেলের সম্ভাবনা বোধ ক'রেছিলাম! সে কি আমার তবে সেদিনের একটা দুরাশা মাত্র ছিল?'

—'হয়ত ছিল না!' বিজন ব'ল্লো, 'কিন্তু ভেবে দেখলাম মেসোমশাই, বাংলা সাহিত্যে বীরবলের কথাটাই হয়ত খাঁটি সত্য: দেশ যতো বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথে অগ্রসর হবে, দেশের কাব্যপ্রতিভা ততই স্তিমিত হ'য়ে আস্‌বে।'

—'রেখে দাও তোমার বীরবল।' মিঃ মল্লিকের কণ্ঠে এবারে কিছুটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল: 'এই যে রেবা এত চমৎকার চমৎকার সব গান শিখচে, এর কি তবে কোনই মানে হয় না? পৃথিবীর কোনো অসম্ভব বিষয়কেই আমি কখনও বিশ্বাস করি না। ইচ্ছে ক'রে তুমি তোমার কবি-প্রাণকে হত্যা ক'রবে, এ অসহ্য।'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে থাম্‌লো বিজন। আসলে জবাব খুঁজে পেল না সে। মিঃ মল্লিকের কথাটা তার ভালো লাগলো। প্রথম জীবনের সার্থক প্রশংসা একদিন তাঁর মুখ থেকেই পেয়েছিল বিজন। দেখলো—কল্‌কাতার চিম্‌নির কালিতে আজও তাঁর মন ঢাকা প'ড়ে যায়নি।

রেবা ব'ল্লো, 'মিথ্যে কথা দিয়ে বাবাকে শুধু ভোলাতে চেষ্টা ক'রছো বিজুদা। এরপর যেদিন আসবে, কবিতার খাতা সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে, ভুল্‌লে চ'ল্‌বে না।'

—'তা না হয় হ'লো, কিন্তু এই মাত্র মেসোমশাই'র মুখে যে কথা শুন্‌লাম, তার পরিচয় পাচ্ছি কবে?'

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'রেবার গান তুমি যেদিন আসবে সেদিনই শুন্‌তে পাবে বাবা। দক্ষিণ কল্‌কাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এরই মধ্যে ছ'টা মেডেল পেয়েছে রেবা।' থেমে মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লেন, 'যা না, মেডেলগুলো এনে একবার তোর বিজুদাকে দেখা না, মা?'

—'ও আবার দেখাবার মতো কিছু নাকি?' ব'লে অপাঙ্গে একবার বিজনের দিকে তাকালো রেবা! তারপর হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'আজকাল হকি খেল না বিজুদা?'

—'কেন, সেদিনের কথা বুঝি ভুল্‌তে পারো নি?' ব'লে মুখ টিপে একবার হাসলো বিজন।

স্মিতহাস্যে রেবা ব'ল্‌লো, 'তোমার মেডেল জেতার সেই ইতিহাস কখনও ভুল্‌তে পারি ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আজ তোমার মেডেল পাওয়ার যে কৃতিত্ব, তার কাছে আমার সেদিনের মেডেল পাওয়া কবেই ম্লান হ'য়ে গেছে। মিথ্যে আর সেদিনের কথা ব'লে লজ্জা দিচ্ছ কেন ?'

—'লজ্জা দিচ্ছি না, আনন্দ পাচ্ছি।' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'পুরনো কথা ভাবতে কী যে ভালো লাগে, ব'লে বুঝোতে পারবো না।'

বিজন এবারে কিছু একটা বলার আগে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'নিশি কোথায় গেল দেখ্‌তো মা, বিজুকে চা ক'রে দিতে বল।'

কথা না বাড়িয়ে রেবা এবারে নিশির খোঁজেই উঠে প'ড়লো। নিশি অর্থাৎ নিশিকান্ত : মিঃ মল্লিকের সংসারে বেয়ারা, বাবুর্চি, ঠাকুর, চাকর ব'ল্‌তে একাধারে সব।

নিশিকান্ত ভিতরেই ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে চায়ের সঙ্গে কিছু ক্রিম-ক্রেকার এনে বিজনের সাম্‌নে টিপয়ে সাজিয়ে দিল।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'চা খাও বিজু।'

—'চা কি শেষ পর্য্যন্ত শুধু আমার জন্যেই হ'লো ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার চোখ দু'টো তুলে ধ'রলো বিজন। সঙ্গে সঙ্গে সে খাবারের তারতম্যটাও লক্ষ্য ক'রলো। মফঃস্বল-জীবন আর সহর-জীবনের মধ্যে কত পার্থক্য ! রেবার পুতুল-বিয়েতে খাবারের অনুষ্ঠানে চায়ের যোগ ছিল না, সে খাবারের মধ্যে ছিল একটা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি ; আজকের চায়ের আয়োজনটা নিতান্তই ভদ্রতা-সূচক, খানিকটা যেন বাহ্যিক আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। তাতে মন ভরে, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করে না ! কত পার্থক্য কল্‌কাতায় আর মফঃস্বলে !

চায়ের ব্যবস্থা ক'রে রেবা আবার যথাস্থানে এসে ব'সে ছিল। এবারে বিজনের কথার জবাবে ব'ল্‌লো, 'ভেবেছ আমরা এতক্ষণ চা না খেয়ে ব'সে আছি ! কখন্ ও পাট শেষ হ'য়ে গেছে আমাদের ! নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে এবারে সলজ্জে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল বিজন।

মিঃ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'র্‌লেন, 'কি কম্বিনেশন নিলে বি, এ'তে ?'

—'হিষ্ট্রি আর ইকোনমিক্স্। ইকোনমিক্সে অনার্স।'

—'ছাট্‌স্ গুড্। ইট্ ইজ্ এ্যান্ ইজি এ্যাণ্ড নাইস্ কম্বিনেশন। আমিও একদিন নিয়েছিলাম। ভেরি ইন্‌টারেষ্টিং সাব্‌জেক্ট।'—স্বভাবসুলভ কণ্ঠেই কথাগুলো উচ্চারণ ক'রলেন মিঃ মল্লিক। কল্‌কাতায় এসে তাঁর ইংরেজি কথালাপ খানিকটা বেড়েছে। প্রায় প্রতিকথাতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'সামনের শুক্রবার তো রেবার জন্মদিন! ঐ দিন সন্ধ্যায় বিজুকে খাবার নেমন্তন্ন ক'রে রাখি, কি বলো?'

—'এর মধ্যে আর ব'ল্‌বার কি আছে! নেমন্তন্ন না ক'রলেই বা কি? রেবার জন্মদিনে বিজু এসে খাবে-দাবে আনন্দ-ফুর্ত্তি ক'রবে, এইটেই তো স্বাভাবিক।' থেমে এবারে নিজের মুখেই নিমন্ত্রণের পাঠটা সেরে রাখলেন মিঃ মল্লিক।

বিজন ব'ল্‌লো, 'বাঃ, এ তো আনন্দের বিষয়! এসে আজ যা-হোক্ কিছু মিষ্টি খাবার যোগ ঘটানো গেল! সেদিন তুমি নিশ্চয়ই গান শোনাচ্ছ, না কি বলো রেবা?'

হেসে রেবা ব'ল্‌লো, 'জন্মদিনে কেউ বুঝি আবার নিজে গায়, সে তো শুধু শোনে! তুমিই বরং সেদিন তোমার কবিতা শোনাবে।'

সোৎসাহে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'ভেরি নাইস্ প্রোপোজাল।' তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ দু'টো একবার তুলে ধ'রলেন: 'রেবা হ্যাজ্ এ সার্প্ ব্রেইন, যাই বলো।'

কথায় কথায় চায়ের কাপ অনেক্ষণই শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে ক্রিম-ক্রেকারও। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এবারে সম্ভবতঃ একবার ঘড়ির সন্ধান ক'রলো বিজন। কারণ, সে যখন প্রথম এসে ঘরে ঢুকেছিল, ক্লকের আওয়াজ শুন্‌তে পেয়েছিল সে। আসলে ক্লক্‌টা এ ঘরে নয়, পাশের ঘরে। সময় একেবারে কম অতিবাহিত হয় নি অনুমান ক'রে এবারে বিজন ব'ল্‌লো, 'আজ উঠি মাসীমা, গিয়ে আবার পড়াশুনো আছে।'

—'এস বাবা। তা—শুক্কুরবার কিন্তু সন্ধ্যায় এখানেই খাবে। রেবার জন্মদিন, আমাদের সকলের পক্ষেই আনন্দের বিষয়।'

—'আস্‌বো বৈ কি, নিশ্চয়ই আস্‌বো! একদিন রেবার পুতুল বিয়ের খাওয়াই শুধু খেয়েছি, এবারে জন্মদিনের খেয়ে তার সুদ তুল্‌বো বৈ কি!'

স্মিতহাস্যে উঠে দাঁড়িয়ে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালো বিজন। সাম্‌নের গেট পর্য্যন্ত এসে তাকে পৌছে দিল রেবা। ফুটপাতে পা বাড়াবার আগে একবার ফিরে তাকালো বিজন রেবার দিকে। কিছু ব'লবার জন্য নয়, যাবার আগে তার কমনীয় অনিন্দ্যকান্তি মুখখানিই শুধু আর একবার দেখ্‌বার জন্য।

উজ্জ্বল মুখের হাসি দিয়ে তাকে বিদায় দিল রেবা।

বার

এতদিনে যেন একটা শান্ত তৃপ্তিকর সরোবরে অবগাহন ক'রে উঠ্‌লো বিজন। সামান্য একটা খণ্ডকালের স্মৃতি, তার মূল্যই বা কম কি! রেবার সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে এসে অন্ততঃ সেই স্মৃতিসুখেই খানিকক্ষণ ম'জে রইল বিজন। আগামী শুক্রবারের কথাটা মনে এসে সমস্ত চেতনা যেন তার সহসা একবার অনুরণিত হ'য়ে উঠলো। রেবার জন্মদিন। মাগুরায় থাক্‌তে কখনও রেবার জন্মদিনের উৎসব হ'য়েছে ব'লে মনে পড়ে না। এটা কলকাতার জীবনের আকস্মিক ঘটনা। তা' হোক্। তবু একটা বিশেষ দিনকে স্মরণ ক'রে আত্মস্থ হওয়া চলে, দশের শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলার উন্মাদনা জাগে সাম্‌নের পথে। কিন্তু শূন্যহাতে এ'দিনে কি রেবাকে শুভেচ্ছা জানাতে যাওয়া চলে? কি আছে তার, কি দিতে পারে সে, কি দেওয়া উচিৎ তার পক্ষে? ভাবতে গিয়ে একবার বাগেরহাটের কলেজ-জীবনের কথা মনে প'ড়লো বিজনের। পূজোর প্রীতিউপহার দিতে ছন্দা আর রেবার জন্যে ব'য়ে এনেছিল দু'খণ্ড কলেজ-ম্যাগাজিন—যার প্রধান আকর্ষণ ছিল তার কবিতা। জন্মদিনেও অবিশ্যি রেবা তাকে গিয়ে কবিতা শোনাতেই অনুরোধ ক'রেছে। কিন্তু কবিতা শোনানোই কি প্রীতিউপহারের সব কিছু?

সমস্তটা পথ, সমস্তটা রাত্রি এই চিন্তাই তাকে বিশেষ ভাবে উতলা ক'রে তুল্‌লো। ট্যুইশনি ক'রে যে অর্থ তার হাতে আসে, তাতে সারা মাসের খরচ বাঁচিয়ে অন্ততঃ উপহার যে দেওয়া চলে না, এ কথা নিশ্চিত। প্রতিমুহূর্ত্তেই নিজের দারিদ্র্য তার বিভৎস রূপ নিয়ে এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়, গুঁড়িয়ে দেয় তার সমস্ত চেতনাকে।...

সকালের ডাকে অকস্মাৎ মাগুরার চিঠি এসে উপস্থিত। বিজনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উতলা হ'য়ে নির্ম্মলা লিখেছেন:

> '...কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠি। তুমি সুস্থ আছ কি না, আমাকে পত্রপাঠ লিখিয়া নিশ্চিন্ত করিবে। একটা মুহূর্ত্তও আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।
>
> এদিকে আজ সকালেই আবার খবর পাইলাম, রাজসাহীতে ছন্দার বরের বড় অসুখ, কাঁদিয়া কাটিয়া ছন্দা তাহার কাকাকে চিঠি

লিখিয়াছে। শুনিয়া অবধি এতটুকুও শান্তি পাইতেছি না। তোমার কুশল জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিতে এতটুকুও যেন বিলম্ব করিও না বাবা।…'

স্বতন্ত্র একটুক্রো কাগজে অনুযোগ তুলে অতসী লিখেছে:

'… এই বুঝি মনে রাখিবার নমুনা, বিজু ভাই? মা'র স্নেহ যে আমি পুরাপুরি কাড়িয়া লইতে পারি নাই, মা'র চিঠিতেই তাহার পরিচয় পাইবে। অভাগিনী দিদিটাকে যে ইতিমধ্যেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি। তবু অনুরোধ, ভাই, ভুলিবার আগে একটিবার শেষ চিঠি দিও।…'

অতসীর চিঠিটা প'ড়তে গিয়ে একবার হাসি পেলো বিজনের। কিন্তু সহজভাবে মন খুলে হাস্‌তে পারলো না; মা'র চিঠির অক্ষরগুলো খচ্‌ ক'রে এসে বুকে বিঁধলো। মা অবিশ্যি তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিথ্যাই উতলা হ'য়েছেন; মায়ের প্রাণ তো! কিন্তু ছন্দার স্বামী শ্যামলকান্তির অসুখের কথা জানিয়ে মা যে তাকেও বড় কম চিন্তায় ফেল্‌লেন না! দুঃখের জীবন থেকে বেরিয়ে গিয়ে সুখের নীড় রচনা ক'রে সংসার-জীবনে কেবল প্রথম পা বাড়িয়েছে ছন্দা, তার মধ্যে এ আবার কী দুঃখের অভিঘাত। শ্যামলকান্তির অসুখ কিছু-একটা বাড়াবাড়ির দিকে না গেলে ছন্দাই বা অমন কেঁদেকেটে চিঠি দেবে কেন রসিকলালকে! ইচ্ছে হ'লো—এক্ষুণি সে একটা টেলিগ্রাম করে ছন্দাকে। কিন্তু সম্ভব হ'লো না, সঙ্কোচ এলো, ঠিকানা সম্পর্কে সন্দেহ হ'লো। বাধ্য হ'য়ে মাকেই সে নিজের কুশল জানিয়ে অবিলম্বে ছন্দার কাছে চিঠি দিয়ে খবর জান্‌তে লিখলো। সেই সঙ্গে অতসীর চিঠির জবাবেও দু'কলম লিখে দিল বিজন:

'অতসীদি, মিথ্যা অনুযোগ তুলিয়া তুমি নিজের মনে আঘাত পাইয়াছ। কলিকাতার মতো কর্ম্মব্যস্ত সহরে ছাত্র পড়াইয়া আমাকে লেখাপড়া করিতে হয়। এখানে না থাকিলে কেউ বুঝিতে পারে না—মানুষের সময় কত অল্প! তাই বলিয়া তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি, একথা তুমি কেমন করিয়া মনে করিলে? মা'র স্নেহ তুমি সমস্তটুকুই কাড়িয়া নাও, তাহাতে আমি সুখীই হইব। তুমি ভিন্ন মাকে দেখিবার আর কে আছে বলো?…'

লেখা শেষ ক'রে নিজের হাতে গিয়ে চিঠিটা ডাকে দিয়ে এলো বিজন।

এসে খানিকটা আত্মস্থ হ'য়ে ব'স্‌তে চেষ্টা ক'রলো সে। চিন্তাসূত্র নানা গ্রন্থীতে গাঁথা, উর্ণনাভের মতো সে আপনার জাল আপনি বিস্তার ক'রে চলে ; সময় বা কালের প্রতীক্ষা সে রাখে না। সেই গ্রন্থীবদ্ধ জালের গিঁঠে গিঁঠে মানুষ হামা দিয়ে চলে রাত্রিদিন। বিজনও তা-ই চ'লেছে। রেবার জন্মদিনের উপহারের কথাটা নিয়ে সারাদিনের মধ্যে একবারও কিছু-একটা ভাবতে পারেনি সে। মাঝখানে একটা দিন শুধু বাকী, অথচ কিছুই স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারেনি বিজন। মিঃ মল্লিকের সম্ভ্রান্ততার দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রতে গিয়ে তার নিজের ত্রুটিতে পাছে রেবার ঐতিহ্যে কোথাও আঘাত লাগে, এ সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতা আবশ্যক বৈ কি! নিমন্ত্রিতের মধ্যে সে-ই কিছু একজন অদ্বিতীয় হবে না নিশ্চয়ই ; মিঃ মল্লিকের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই কল্‌কাতায়, তারাও কিছু বাদ প'ড়বার মানুষ নয়। তাদের থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে সত্যিই কি সুন্দর কিছু উপহার দেওয়া যায় না রেবাকে?

ইতিমধ্যে কোথা থেকে হঠাৎ মহেন্দ্র এসে ঘরে দাঁড়াল। ঘরে ব'সে থাক্‌বার লোক নয় সে, ব'সে থাক্‌লেই জড়তায় সে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, ততক্ষণে সেয়ার মার্কেটের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে তার পেশীতে আসে রক্তের জোয়ার, মনে আসে দুর্ব্বার গতি। ঘোড়ার মতো ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত পরিশ্রম ক'রতে পারে মহেন্দ্র, তাতে তার ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। এসে ঘরে ঢুকেই গা থেকে জামা খুলে ব্রাকেটে টাঙিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে ব'ল্‌লো, 'ব্রাদারকে যেন কিছুটা নৈর্ব্ব্যক্তিক চেতনার মানুষ ব'লে মনে হ'চ্চে? ব্যাপার কি, কোনো মেয়ের বাপের কাছ থেকে কিছু অফার পেলে না কি হঠাৎ?'

অফারই বটে! সঙ্কোচের কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'মুখের ত ট্যাক্স নেই, বলুন—শুনে যাই। মাঝে মাঝে বড়-বেশী রসিকতা ক'রে বসেন আপনি মহিন্‌দা।'

—'রসিকতা? ভালো কথা ব'ল্‌লেও যদি রসিকতা মনে করো, তবে আর কি ব'ল্‌তে পারি, বলো?' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'বয়সের ঔদাস্য দেখলেই বোঝা যায়।'

—'হ'য়েছে, থামুন।'

—'বেশ, থাম্‌লাম।'

টান্ টান্ হ'য়ে নিজের বিছানায় শুয়ে প'ড়লো মহেন্দ্র।

অরুণ আজ ঘরে নেই। দু'দিনের জন্য কী কাজে গেছে চন্দননগরে। নইলে এতক্ষণে সেও কিছু-একটা কথায় যোগ দিত।

থেমে মহেন্দ্র ব'ল্লো, 'সেয়ারের বাজারে আজ যা ভিড় গেল, গত ছ'মাসে এমন ভিড় চোখে পড়ে নি। নতুন এক অসমীয়া পার্টি আজ দু'লাখ টাকা হেরে গিয়ে সে কি হাউ হাউ ক'রে কান্না! তার পাঁতিপুকুরের প্যালেসখানি এবারে হাত-ছাড়া হ'লো।'

—'মানে?' খানিকটা উৎসুক্ হ'য়ে উঠলো বিজন।

—'মানে আর কি! সেয়ার বাজারের হাল্‌ফিল্‌ই এই। দু'লাখ টাকা হেরে গিয়ে লোকটির বাড়ি বাঁধা প'ড়লো, তা আর উদ্ধার হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।' মুখ টিপে একবার হাস্‌লো মহেন্দ্র।

বিজন ব'ল্‌লো, 'এম্‌নি ক'রেই আপনাদের ফট্‌কার বাজার তবে মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করে? লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে মানুষ তবে যায় ওখানে নিজেকে বলি ক'রতে? নমস্কার আপনাদের সেয়ার মার্কেটকে মহিন্‌দা।'

—'একেবারেই ছেলেমানুষ তুমি।' ব'লে হাসলো মহেন্দ্র, তারপর স্বল্পক্ষণ থেমে ব'ল্‌লো, 'তোমার অত্যুগ্র ইচ্ছে সত্ত্বেও এই জন্যেই বাধা দিয়েছিলাম সেদিন বিজন। সংসারে সব পথ সব মানুষের জন্যে নয়, জানো তো?'

—'জানি।' ব'লে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা ক'রলো বিজন।

মহেন্দ্রও আর কিছু একটা দ্বিরুক্তি ক'রলো না। উঠে নিজের জামার পকেট থেকে সেয়ার সংক্রান্ত কি একখানি কাগজ বার ক'রে একাগ্র চোখে সেখানি প'ড়ে যেতে লাগ্‌লো।

আকস্মিক নিস্তব্ধতায় ঘরখানি মনে হ'লো গুমোট হ'য়ে উঠেছে। কেমন বিশ্রী লাগতে লাগলো বিজনের। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে আর একবার গলা তুল্‌লো সে: 'বলি মহিন্‌দাও কি শেষ পর্য্যন্ত পড়াশুনোয় মন বসালেন নাকি?'

—'কি আর করি বলো, ফিল্ড-ওয়ার্কে নামতে গিয়ে আগে থাক্‌তে কিছু প্রিপারেশন দরকার বৈ কি!' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'গোটা জীবনটাই একটা প্রিপারেশনের বস্তু।'

অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ল্‌লো, 'আপনি কেন ফিলজফার হ'লেন না মহিন্‌দা?'

—'এবারেই হাসালে তুমি। একদিন তুলি ছেড়ে ছবি আঁকা বন্ধ ক'রলাম; ফিলজফার হবার সুযোগ ছিল কোথায় জীবনে?' ব'লে চোখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রলো মহেন্দ্র।

কথাটাকে অধিকদূর না বাড়িয়ে স্বল্পক্ষণ থেমে বিজন ব'ললো, 'আমি যে একটা মুস্কিলে প'ড়ে গেছি মহিন্দা, কি করি বলুন তো? জন্মদিনের একটা উপহার মনে মনে কিছুতেই সাব্যস্ত ক'রে উঠতে পারছি না।'

—'কার? ছেলের, না মেয়ের?' বিজ্ঞের মতই প্রশ্ন ক'রলো মহেন্দ্র।

—'আবার তো বাজে ব'কতে সুরু ক'রলেন!' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌লো বিজন।

—'এতেও বাজে বকা হ'লো? উপহারের ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের তারতম্য আছে বৈকি!'

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'ধরুন, মেয়েদের উপযোগিই কোনো উপহার।'

না হেসে পারলো না এবারে মহেন্দ্র, ব'ল্‌লো, 'এই নিয়েই সমস্যায় প'ড়েছ? বলি, পথে কি চোখ বুজে হাঁটো, না চোখ দু'টো খোলা রাখো! সারা বাজারটাই তো মেয়েদের জন্যে, ডিজাইন আর রঙের ছড়াছড়ি পথে।'

—'তা দেখেছি, ওসবে চ'লবে না।' বিজন ব'ল্‌লো, 'দামে সস্তা অথচ খুব লাভ্‌লি হয়, এরকম কিছু চাই।'

—'একটু বাজে বকি তবে এবারে!' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'প্রণয়ের ব্যাপারে কিন্তু ওটা নিরাপদ নয়। সামান্য জিনিষকেও মহার্ঘ্য ব'লে না চালাতে পারলে প্রণয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হয়। জানি না, কোন্ সম্পর্কের জগতে তোমার উপহার গিয়ে পৌঁছাবে!'

এবারে নিজের মধ্যে কিছুটা সঙ্কুচিত হ'য়ে প'ড়লো বিজন। ব'ল্‌লো, 'নিন্, হ'য়েছে, কাজ নেই আমার উপহার দিয়ে, এবারে দয়া ক'রে থামুন দিকিনি মহিন্দা।'

—'মহেন্দ্র থাম্‌লেই কি আর মন থামে! যাকেই হোক্, যেখানেই হোক্, উপহার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তুমি দেবেই।' খানিকটা সহানুভূতির কণ্ঠে এবারে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'ঝামেলা না বাড়িয়ে দু'পাঁচ টাকার একটা ফুলের তোড়াই না হয় দাও না—যার স্থায়িত্ব কম, অথচ পূর্ণতার দিক দিয়ে যার তুলনা নেই।'

কথাটা মন্দ নয়। ফুলের সত্যিই তুলনা নেই। কিশোর-জীবনে একদিন মাষ্টারের গলায় মালা দেবার জন্য রেবাকে বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে দিতে ব'লেছিল বিজন। সেদিন সে-অনুরোধ সে রাখেনি, রেখেছিল ছন্দা। রেবার জন্মদিনে তাকে এবারে ফুলের উপহার দিয়ে জব্দ করা যাবে। মনে

মনে উপহার নির্ব্বাচন ঠিক হ'য়ে গেল বিজনের। ব'ল্‌লো, 'দি আইডিয়া, ভালো সাজেস্‌সান দিয়েছেন এতক্ষণে মহিন্‌দা।'

মহেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না ক'রে বিজনের চোখের উপর দিয়ে একবার নরম দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার নিজের কাজে মনঃসংযোগ ক'রলো।…

শুক্রবার যথাসময়ে মিঃ মল্লিকের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'লো বিজন। যাবার আগে নিউ মার্কেট থেকে ভালো দেখে বিলেতি ফুলের একটা তোড়া নিয়ে গেল অয়েল-পেপারে মুড়ে, তার সাথে স্বরচিত আট লাইনের একটা কবিতা: জন্মদিনের শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা দিয়ে গাঁথা তার অক্ষরগুলো।—

পুষ্পময়ী হোক্ আজ তোমার জন্মদিন
হও প্রেমময়ী ;
জীবনে লঙ্ঘিতে হবে দুস্তর বন্ধুর পথ,
হ'তে হবে জয়ী।
তোমার কল্যাণী-মূর্ত্তি ঢেলে দিক্ সর্ব্বলোকে
পারিজাত সুধা,
শুভক্ষণে আমি আজ সাজালাম পুষ্পরাগে
তোমার বসুধা।

উপহার পেয়ে রেবা খুসীতে উপচে প'ড়লো। নানা ডিজাইনের শাড়ী, কাস্কেট আর সোনার জিনিষ সে কম পায়নি। তাদের স্থায়িত্ব শুধু একটি দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ভবিষ্যতের অনেকগুলো স্মৃতিমুখর দিনের নানা প্রহরে প্রহরে তারা ব'য়ে নিয়ে আস্‌বে অপরূপ আনন্দের ধারা। তবু এই ক্ষণস্থায়ী একগুচ্ছ ফুলের মধ্যে যেন নবজীবনের একটা সন্ধান পেলো রেবা। অন্য কারুর উপহারের সঙ্গেই এমন একটি উদ্দীপনাময়ী কাব্য কিছু নেই। কতবার যে মনে মনে আবৃত্তির সুরে কবিতাটি প'ড়লো রেবা, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'কবিতার এই ছোটখাটো স্পর্শই কি আজকের দিনে যথেষ্ট বিজু? কথা ছিল, আজ তুমি নিজের খাতা থেকে কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাবে।'

লজ্জিতকণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'নতুন কিছু যে আর লিখিনি, তা তো

সেদিনই ব'লেছি মেসোমশাই। পুরনো লেখাগুলো আজ নিজের কাছেই ভালো লাগে না। দেখলাম—সেগুলো লোকসমাজে বার ক'রবার মতো নয়।'

মিঃ মল্লিকের পাশ থেকে একটি যুবক প্রশ্ন ক'রলো, 'উনি তবে সত্যিকারের জাত-কবি?'

—'এ বাডিং পোয়েট অব বেঙ্গল। একদিন মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথও ওর মতই ছিলেন। সবে সুরু; অতুল সম্ভাবনা র'য়েছে বিজুর জীবনে। কে ব'ল্‌তে পারে, এই বেড়ালই বনে গেলে বন-বেড়াল হবে কিনা!' ব'লে যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন মিঃ মল্লিক।

বিজন বল্‌লো, 'জীবন-তপস্যায় শেষ পর্যান্ত যে বিড়ালত্ব প্রাপ্তি, সে সম্বন্ধে সত্যিই ভুল নেই মেসোমশাই।'

আসলে মিঃ মল্লিক উপমা টানতে গিয়ে কিছু বাক্যবিভ্রাট ক'রে বসে-ছিলেন; তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন—এই কবিই যে একদিন বিলেত গেলে পোয়েট-লরিয়েট হবে না, কে ব'ল্‌তে পারে!

সেদিকে ইঙ্গিত ক'রে এবারে যুবকটি ব'ল্‌লো, 'নট্‌ টু বি ক্যাট্‌, বাট্‌ টু বি লরিয়েট, সম্ভবতঃ এ কথাই উনি ব'ল্‌তে চেয়েছেন।' ব'লে মিঃ মল্লিকের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ব'ল্‌লেন, 'একজাক্টলি সো। বেড়াল মানে কি, বিজু হবে একদিন বিপুল বিশ্বের বিরাট বাণীসাধক। তোমার সঙ্গে তো আলাপ নেই দিলীপ, এস আলাপ করিয়ে দিই।'

ততক্ষণে বিজন এবং দিলীপ দু'জনেই নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের ভঙ্গীতে যুক্ত হাত সাম্‌নে প্রসারিত ক'রে ধ'রেছে।

মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'আমরা এতকাল মাগুরায় এক পাড়াতেই বাস ক'রেছি। বিজনের বাবা কুঞ্জবিহারী বাবু ছিলেন আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু। বিজু তার বাবার গুণ পেয়েই বড় হ'য়েছে। বিজুর মাও বড় নিষ্ঠাবতী মহিলা। রেবার মার মুখে তাঁর কথা শুন্‌তে পাবে। বিজু আমাদের ঘরের ছেলের মতো।'

স্মিতহাস্যে দিলীপ ব'ললো, 'বড্ড খুসী হ'লাম পরিচয় জেনে। এখানেই কোথাও সার্ভিসে আছেন নিশ্চয়ই?'

—'এই বয়সেই সার্ভিস্‌, বলো কি তুমি?' মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'বিজু এখনও কলেজ-ষ্টুডেণ্ট, কলকাতায় বি-এ প'ড়ছে।'

বিজন ব'ল্লো, 'পরিচয়টা শেষ পর্য্যন্ত এক-তরফাই থেকে গেল না কি মেসোমশাই ?'

—'গুড গড। তাও তো বটে। দিলীপের পরিচয়টা যে দেওয়াই হয় নি তোমাকে!' থেমে মিঃ মল্লিক ব'ল্লেন, 'সম্প্রতি বিলেত থেকে নতুন ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে দিলীপ। এ পাড়ায় দত্ত বাড়ি ব'ল্তে ওদের বাড়িকেই বোঝায়। বাড়িটা পাশেই, লক্ষ্য ক'রলে এখান থেকেই দেখতে পাবে।' ব'লে পাশের খোলা জানালার ভিতর দিয়ে সাম্‌নেই একটা বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রলেন মিঃ মল্লিক।

পাশাপাশি দু'খানি বাড়ির পরে তৃতীয় বাড়ি। তিন তলার উপরেও ছোট একটি চিলে কোঠা। এখান থেকে বাড়িটা সম্পূর্ণ চোখে না প'ড়লেও ত্রিতল থেকে চিলে কোঠা অবধি স্পষ্টই চোখে ভেসে ওঠে। নতুন হাল-ফ্যাসানের কার্নিসে বাড়িটা বিলেতি রুচিরই পরিচয় দেয়। সেদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে বিজন ব'ললো, 'আপনারা তবে একেবারেই নেক্‌ষ্ট-ডোর-নেইবার ?'

মিঃ মল্লিক ব'ললেন, 'যেমন তোমরা আর আমরা ছিলাম মাগুরায়। এখানে এসে প্রথম কথা ব'লবার লোক পাই দিলীপদের। ওর বাবা দাশরথি বাবু যেমন মিশুক লোক, তেমনি একেবারে মাটির মানুষ।'

উত্তরে বিজন কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে নিশিকান্ত এসে খবর দিল—'খাবার প্রস্তুত।'

পাশের ঘরে ডাইনিং টেবলে খাবার ব্যবস্থা। জীবনে চেয়ার-টেবলে ব'সে খাওয়া বিজনের এই প্রথম। পিঁড়িতে ব'সে গ্রাসের পর গ্রাস তুলে খাবার অভ্যাস চিরকাল, আজকের এই ব্যবস্থায় তাই কিছুটা অসুবিধেই বোধ ক'রলো সে।

পাশে ব'সে মিসেস মল্লিক ব'ললেন, 'লজ্জা ক'রে খেয়ো না যেন বিজু!'

লজ্জা যে না ক'রছিল, এমন নয়। তবু স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ললো, 'রেবার জন্মদিনের খাওয়া, এখানে লজ্জার অবকাশ কোথায়!'

খাবার পরিবেশন ক'রছিল রেবা নিজের হাতে, ব'ললো, 'কবি মানুষদের কথাই সব, পাকস্থলী ঠন্‌ঠনে। লজ্জাই যদি না ক'রবে তো পাতের খাবার মুখে উঠছে না কেন ?'

—'কেন, না-ই বা উঠছে কি!' মুখ তুলে বিজন বললো, 'বলি, হঠাৎ এমন

আতিথেয়তা দেখাবার আর কি লোক পেলে না? পাশে তো আরও কেউ র'য়েছেন!'

দিলীপ ব'ল্‌লো, 'আমাকে যে কোনো জিনিষ সাধতে হয় না, তা ওঁরা জানেন; আর জানেন ব'লেই এতক্ষণে সমস্ত আতিথেয়তাটা গিয়ে চেপেছে আপনার ঘাড়ে। আপনি বরং হাত-চালনাকে কিছু দ্রুত ক'রতে চেষ্টা করুন বিজনবাবু।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'খাদ্যবস্তুর সঙ্গে তবে যে বক্সিং ল'ড়তে হয়!'

কথা শুনে এবারে না হেসে পারলো না কেউ।

মিঃ মল্লিক ব'ললেন, 'না, না, তোমাকে তাড়াতাড়ি ক'রতে হবে না বিজু, ধীরে সুস্থেই তুমি পেট পুরে খাও।'

পেট পুরেই খেয়ে উঠলো বিজন। তার সকল লজ্জার মধ্যেও খাদ্যসূচীর দীর্ঘতা পীড়া দিতে পারে নি তার পাকস্থলীকে, বরং কিছুটা পীড়নই ক'রছে এখন। অনেকদিন এমন সুললিত খাদ্যে এত অত্যধিক আহার ঘ'টে ওঠে নি তার। ওয়েলিংটনের মেসে উড়ে ঠাকুরের রান্না খেতে খেতে খাবারের পরিমান তার ইদানীং একেবারেই ক'মে এসেছিল। অকস্মাৎ খাদ্যের পরিমাণ কিছু বেশী হ'লে পাকস্থলীকে এখন পীড়নই করে।

দিলীপ বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা ক'রলো না। একসময় বিদায় নিয়ে সে উঠে গেল। হাঁটা-চলার মধ্যে তার বিশেষ একটা সাহেবী ভঙ্গী জড়িত। সেটুকু লক্ষ্য এড়ালো না বিজনের। বিলেত গেলে মানুষের রুচি যে কী অদ্ভুত ভাবে বদ্‌লায়, শুধু সেই কথাটাই ভাবতে লাগলো সে। আর শুধু বিলেত কেন, কলকাতাই কি কম!

নিমন্ত্রিতের সংখ্যাটা শুধু দিলীপ আর বিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিকটতম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাও বাদ যান নি অনেকেই, যথাসময়ে এসেই তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে গিয়েছিলেন। ব্যাচের শেষে প'ড়েছিল দিলীর আর বিজন।

মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'তাড়াতাড়ি যাবার তাগিদ নেই তো কিছু বাবা, দু'দণ্ড ব'সে বরং রেবার সঙ্গে গল্প ক'রে যাও। সেই ভোর থেকে এই অবধি একটু ক্ষণের জন্যেও ব'স্‌তে পারেনি মেয়েটা। এতক্ষণে তবু যা-হোক্ কাজ চুক্‌লো।'

উঠবার সত্যিই তাগিদ ছিল না বিজনের। আবার গিয়ে তো সেই

একঘেয়ে মেসের জীবনযাত্রা, তার চাইতে এখানে বরং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্যকে ঘিরে মনটা কিছুক্ষণের জন্যও স্বপ্ন-সায়রে অবগাহন ক'রে উঠতে পারছে।

একটু বাদেই রেবা এসে পাশে ব'স্‌লো। এতক্ষণে দু'টো ভালো ক'রে থা বলার অবকাশ হ'লো তার।

বিজন লক্ষ্য ক'রে দেখলো—কপাল থেকে এখনও তার চন্দন-সজ্জা মুছে যায় নি। কাজল-পরা চোখের দু'পাশ দিয়ে এসে মিশেছে সেই চন্দন-সজ্জা। উপহার এনে হাতে তুলে দেবার সময় এমন সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য ক'রতে পারে নি বিজন। লোকজনের সাম্‌নে সে-দৃষ্টি হারিয়ে গিয়েছিল। পাশে মিসেস্ মল্লিকের চেয়ারের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলো—কখন্ তিনি নিঃশব্দে উঠে চ'লে গেছেন। খেয়ে উঠে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম না নিয়ে পারেন না মিঃ মল্লিক। মিসেস্ মল্লিক উঠে একসময় স্বামীর পাশে গিয়েই ব'সেছেন।

রেবা ব'ল্‌লো, 'এমন সুন্দর ফুলের তোড়া তুমি কোথায় পেলে বিজুদা ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'কল্‌কাতার বাজারে শুনি সমস্ত পৃথিবীটাকেই খুঁজে পাওয়া যায়, ফুল তো সামান্য জিনিষ। এমন আর কি সুন্দর !'

—'বাঃ, সুন্দর নয় ? আমার সমস্ত উপহারকে আলো ক'রে দিয়েছে তোমার ফুলের তোড়া আর কবিতা।'

—'আয়নায় হয়ত তা হ'লে আজ নিজেকে একটি বারও ভালো ক'রে দেখবার অবকাশ পাওনি তুমি !' বিজন ব'ল্‌লো, 'ফুল সুন্দর হ'য়েও যে কত কুৎসিৎ হ'তে পারে, তোমার মুখের দিকে না তাকালে তা বিশ্বাস করা কঠিন। কোনো উপহারই তোমার সৌন্দর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে উঠতে পারে না।'

অকস্মাৎ এতখানি আত্মপ্রশংসা রেবা কল্পনা ক'রতে পারে নি। কিছুক্ষণের জন্য এবারে থাম্‌তে হ'লো তাকে। পরে ব'ল্‌লো, 'এমন ক'রেও তুমি বাড়িয়ে ব'ল্‌তে পারো বিজুদা ! তোমার এমন সুন্দর উপহারের সঙ্গে তুমি তুলনা ক'রছো আমাকে ! তোমার কবিতা প'ড়ে মা আর বাবা যে কতখানি মুগ্ধ হ'য়েছেন, তা তুমি জানো না। ওটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে আমি আমার ছবির পাশে রেখে দেবো।'

—'রেখে দিলে তুমি ভুল ক'রবে, মানাবে না। এত তুচ্ছ জিনিষও নাকি আবার বাঁধিয়ে রাখে মানুষ !'

—'তুচ্ছ ?' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'আমার জন্মদিনটাও তবে মিথ্যে বলো ?'

উত্তরে কি একটা ব'ল্‌তে গিয়ে এবারে কথা হারিয়ে ফেল্‌লো বিজন।

পরে ব'ল্লো, 'আজ সমস্ত আনন্দের মধ্যেও একটা অভাব থেকে গেল, রেবা।'

—'কিসের অভাব ?'

—'তোমার গান।'

ম্লান হেসে রেবা ব'ললো, 'তোমার কাছে সত্যিই আমি অপরাধী বিজুদা। ভোর থেকে সব কিছু নিজের হাতে ক'রে-ক'র্ম্মে শেষ পর্য্যন্ত আর গান গাইবার মতো সুযোগ পেয়ে উঠলাম না। অনেকেই ব'লেছিল, কাউকেই সুখী ক'রতে পারিনি। এরপর যেদিন আস্‌বে, কোনো আপত্তি তুলবো না। কিন্তু কথা দিয়ে যাও—অন্ততঃ পাঁচটা নতুন কবিতা লিখে এনে শোনাবে ?'

এবারে ইচ্ছে ক'রেও বিজন না ব'লতে পারলো না, বরং স্বাভাবিক কণ্ঠেই ব'ললো—'শোনাবো।'

ইতিমধ্যে পাশের দরজা দিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো নিশিকান্ত।

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি খবর নিশি ?'

নিশিকান্ত ব'ললো, 'আমি কিছুক্ষণের জন্যে একবার বাইরে যাবো দিদিমণি। আপনাকে একবার ভাড়ার ঘরে আসার দরকার।'

—'যাচ্ছি, যাও।'

বিজন ব'ললো, 'আমি আজ তবে উঠি রেবা। তোমার এখন রেষ্ট নেওয়া দরকার।'

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'আবার কবে আস্‌চো এদিকে ? মাসীমার চিঠি-পত্র পাও তো ?'

—'পাই। ভালোই আছেন। আস্‌বো কবে ঠিক ব'ল্‌তে পারি না। শনি রবিবার ছাড়া সময়ও পাই না বড়-একটা। ট্যুইশনি ক'রতে হয়, তাতেই সময় চ'লে যায়। এর মধ্যে যদি এসে পড়ি, তবে জান্‌বে—তা তোমার গানের আকর্ষণেই।' ব'লে আর অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। পথে এসে সাম্‌নেই বাস পেয়ে সে উঠে প'ড়লো।

রেবা ততক্ষণে তাদের ভাড়ার ঘরে ঢুকে নিশিকান্তের সঙ্গে কথালো হ'য়ে উঠেছে। একটা একটা ক'রে তাকে হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছে নিশিকান্ত।

তের

দিন দু'য়েক কেটে গেলে অরুণ একদিন কী খেয়ালে বিজনের পড়ার টেবলে এসে ঝুঁকে দাঁড়াতেই আবিষ্কার হ'য়ে গেল বিজনের কবিতার খাতা, শুধুই খাতা নয়, তার উপর বিজনের দৃঢ় অঙ্গুলিবদ্ধ ব্ল্যাক্‌বার্ড কলমটি পর্য্যন্ত। মেসে এসে অবধি এমন ক'রে কোনোদিন খাতার পৃষ্ঠা খুলে কবিতা লিখতে বসেনি বিজন। তার জীবন থেকে কবিতা একরকম অন্তর্হিতই হ'য়েছিল; আবার যেন খানিকটা নব জোয়ারের স্পর্শ এসেছে এতদিনে! অরুণের এই আকস্মিক দর্শনে প্রথমটা তাই সলজ্জে খাতাখানি বুজিয়ে রাখতে গেল সে। কিন্তু অরুণ ছাড়বার পাত্র নয়। স্বভাবতঃই কথা সে কম বলে, কিন্তু আজ যেন হঠাৎ বড় মুখর হ'য়ে উঠেছে অরুণ। ব'ললো, 'ঘরে কবি থাকতে প্রতিদিনের এই দুর্ব্বিসহ জ্বালা তবে ভুগচি কেন আমরা? নিরানন্দ এই মেস-জীবনে এবার থেকে কিছু সুরের স্পর্শ পাওয়া তবে অসম্ভব কিছু নয়! খাতা বোজালে চলবে না ভাই। কি লিখেছ, পড়ে শোনাও।'

কিছুদিন থেকে অরুণ আর বিজন উভয়ে উভয়কে নাম ধ'রে ডেকে 'তুমি' ব'লেই সম্বোধন ক'রছিল।

সসঙ্কোচে বিজন ব'ললো, 'এ এমন কিছু প'ড়ে শোনাবার মতো নয়। সময় কাটাবার মতো এটা আমার একটা বাজে খেয়াল ব'লতে পারো। তোমাদের মতো তাস-পাশা পেটাতে জান্‌লে এমন ক'রে বসে বসে আত্ম-প্রবঞ্চনায় সময় ব্যয় ক'রতে হতো না।'

—'আত্মপ্রবঞ্চনা না ব'লে বলো আত্মপ্রসাদ।' অরুণ ব'ল্‌লো, 'কবিতা বনিতাশ্চৈব—কাব্য হ'চ্চে নারীর মতই কমনীয়, রস আর রহস্যময়তা তার প্রতি ছত্রে। এই রস আর রহস্যের যে সন্ধান পেয়েছে, তার কাছে দাঁড়ায় নাকি আবার তাস-পাশা! কি যে বলো! আজ আমি কলেজ যাওয়া ড্রপ ক'রলাম, সারাদিন ব'সে ব'সে তোমার কবিতা শুন্‌বো।'

—'আচ্ছা পাগল তুমি যাহোক্‌।' মৃদু হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'সারাদিন কবিতা শুনে শেষ পর্য্যন্ত আমারও পার্সেন্টেজগুলো নষ্ট করাবে?'

—'তাও তো বটে, তোমারও যে কলেজ আছে!' গলার স্বর খানিকটা বিমর্ষ শোনালো এবারে অরুণের।

বিজন ব'ল্লো, 'খালি কলেজই নয়, সামনে পরীক্ষা। লেক্চারগুলো এ্যাটেণ্ড্ ক'রে যদি নোট না নিই, তবে পস্তাতে হবে শেষে। কবিতা তখন নাগ-কন্যা হ'য়ে দংশন ক'রবে। তুমি বরং অবকাশ মতো কখনও খাতা থেকেই প'ড়ে নিও।'

—'বেশ, খাতাখানি তবে রেখে যেয়ো। দুপুরের একটা রিক্রিয়েশন হবে।'—এসে আবার নিজের পড়ার টেব্‌লে আশ্রয় নিল অরুণ।

কলেজ বন্ধ করা বিজনের পক্ষে সত্যিই সম্ভব ছিল না। তার উপর র'য়েছে ঘড়ি-ধরা ট্যুইশনি। খেয়ে দেয়ে ঘর থেকে বেরোবার মুখে খাতাখানি তুলে দিয়ে গেল সে অরুণের হাতে, সাবধান ক'রে দিয়ে গেল—পড়া শেষ ক'রে খাতাখানিকে যেন বাক্সে তুলে রেখে তবে কোথাও বেরোয় অরুণ।

—'তথাস্তু' ব'লে সানন্দে সম্মতিসূচক ঘাড় বেঁকিয়ে নিল একবার অরুণ, নতুন কিছু-একটা ব'লে আর কথা বাড়াতে গেল না সে। ··

সমস্ত দুপুরটা কাটিয়ে দিল সে বিজনের 'কাব্য মালিকা'কে নিয়ে। খাতাখানির শিরোনামায় এই নামই র'য়েছে, বিজনের অনেক সাধ ক'রে রাখা নাম। ছোট বড় মিত্রাক্ষর, পয়ার আর সনেট মিলিয়ে প্রায় একশোর কাছাকাছি কবিতা। আনন্দের সঙ্গেই বেশ আবৃত্তি ক'রে ক'রে প'ড়লো অরুণ। প'ড়ে মুগ্ধ হ'লো, বিস্মিত হ'লো, অভিভূত হ'লো। বয়সটা তাদের প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু শক্তির কি পার্থক্য! বিজনকে আজ একবার মনে মনে নতুন ক'রে চিনতে চেষ্টা ক'রলো অরুণ। খাতার শেষের দিকের একটা কবিতার উপর হঠাৎ তার দৃষ্টি হোঁচট খেয়ে দাঁড়ালো।—'দুটি তারা' :

জীবনের দু'টি তারা তুমি আর তুমি,
আমার হৃদয়াকাশে উঠেছ কুসুমি'।
কমলের মুখ চেয়ে বিজনে কখন্
নীরব সাহাহ্নে এসে দিয়ে গেছ মন,
আবার রাত্রিশেষে প্রভাতের দ্বারে
কখন্ গিয়েছ মিশে এই সংসারে!
আর তুমি, গেছ চুমি' কমলের আঁখি,
ভাবি তবু জীবনের কতদিন বাকী!

দু'টি চঞ্চল সুচারু জীবনকে নিয়ে একটি মুগ্ধ হৃদয়ের ভাবোল্লাস; শেষের দিকে খানিকটা অতৃপ্তিকর কঠিন আত্মজিজ্ঞাসা। ভাব্‌লো কিছুক্ষণ অরুণ,

প্রথমটা ঠিক অর্থ বুঝে উঠ্‌তে পারলো না সে, আবার প'ড়লো, তারপর পরোক্ত ধরণের একটা অর্থ ক'রে নিল মনে মনে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ মিনিট দু'য়েকের জন্য একবার মহেন্দ্র এসে ঘরে ঢুকলো। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'ব্যাপার কি, কলেজে যাওনি আজ ?'

—'না, কাব্য-মালিকার প্রেমে প'ড়ে আজ আর কলেজে যাওয়া হ'য়ে উঠলো না।' স্বাভাবিক কণ্ঠে খানিক কৌতুকের সুর মিশিয়ে জবাব দিল অরুণ।

ট্রাঙ্ক থেকে কি একখানি হুণ্ডির কাগজ বার ক'রতে ক'রতে পুনরায় খানিকটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধ'রলো মহেন্দ্র: 'কাব্য-মালিকাকে আবার জোটালে কোত্থেকে ?'

—'এক ঘরে কবিকে নিয়ে বাস ক'রেও তার কাব্যমালিকার সন্ধান পেলেন না আজ পর্য্যন্ত, মহিনদা! ইউ আর সো রেচেড, আই সি। এই দেখুন।' ব'লে মহেন্দ্রের চোখের উপর খাতার প্রচ্ছদপৃষ্ঠাখানি মেলে ধ'রলো অরুণ।

মহেন্দ্র প'ড়লো: 'কাব্য-মালিকা'—শ্রীবিজন বন্দ্যোপাধ্যায়। থেমে বল্‌লো, 'বিজু তবে রবি ঠাকুরের জাতের লোক ?'

অরুণ ব'ল্‌লো, 'তা তো যেন হ'লো, কিন্তু জাত বাছ্‌তে গিয়ে আমরা একেবারেই বজ্জাত না হ'য়ে দাঁড়াই!'

—'জ্ঞানরাজ্যে আমি তো চিরকালের হরিজন, তোমার তবু পেটে কিল মারলে দু' পাতা পণ্ডিতি বেরোয়। বজ্জাত হ'লে তুমি হ'তে যাবে কেন, সে আমি।' ব'লে ঠোঁট বেঁকিয়ে একবার হাসলো মহেন্দ্র। তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'আফ্‌টার অল বিজন ইজ্‌ এ জিনিয়াস। ওর ভিতরের মানুষটির সন্ধান অন্ততঃ আমি পেয়েছি।'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণ ব'ল্‌লো, 'আপনার মতো লোকনির্বিশেষে হৃদয়ে প্রবেশ ক'রতে পারে ক'জন ?'

—'পারি নাকি!' ব'লে আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না মহেন্দ্র। ট্রাঙ্ক থেকে হুণ্ডির প্রয়োজনীয় কাগজ গুছিয়ে নিয়ে ব'ল্‌লো, 'আচ্ছা, চলি এবার। বাজার আজ কিছু ভালো ব'লেই মনে হ'চ্ছে। বিজুকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ো।'

সোজা আবার পথে নেমে প'ড়লো মহেন্দ্র। তখনও অরুণের কানে তার কথাটা বাজছে: 'আফ্‌টার অল বিজন ইজ এ জিনিয়াস।' তার জিনিয়াসের কাছে নিজেকে আজ একেবারেই হেয় ব'লে মনে হ'লো অরুণের!

সন্ধ্যার দিকে একসময় বিজনকে চেপে ধ'রলো সে : 'তোমার কাব্য-মালিকা প'ড়ে সত্যিই মুগ্ধ হ'য়েছি, দুপুরটা বাস্তবিকই ব্যর্থ যায় নি। কিন্তু তোমার দু'টি তারা কারা ?'

কিছুক্ষণের জন্য অরুণের মুখের দিকে একবার বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ধর্‌লো বিজন : 'বুঝতে পারলুম না তোমার কথা।'

অরুণ ব'ল্‌লো, 'তোমার হৃদয়াকাশে কুসুমের মতো যারা ফুটে উঠেছে, এমন দুটি উজ্জ্বলন্ত তারার কথাই ব'ল্‌ছি। কারা তারা ?'

সত্যকে চাপা দিতে চেষ্টা ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'এবারেই হাসালে দেখচি। কাব্যের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনকে জড়িয়ে তুমি দেখছি প্রমাদ সৃষ্টি ক'রতে চাও। দু'টি তারায় নিতান্তই একটা কাল্পনিক রোমান্স্‌ ফুটে উঠেছে। তোমার শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই।'

কিন্তু এতটুকু যুক্তিতেই নিরস্ত হবার লোক নয় অরুণ, ব'ল্‌লো, 'কল্পনা তো বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে কিছু নয় ! আসলে তুমি নিজেকে চেপে যাচ্ছ।'

—'ক্রিমিনাল সায়ান্স সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি কিছু প'ড়ে থাক্‌বে।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তার আওতায় অন্ততঃ নিজেকে ফেল্‌তে পারছি না, অতএব স্বভাবতঃই বুঝতে পারছো—নিজেকে চেপে যাবার কোনো কারণ নেই, ওটা তোমার একটা সাপোজিশন্‌ মাত্র। কল্পনা কখনও বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে নয়, ঠিকই ; কিন্তু সে বাস্তব সর্ব্বত্রই যে কবির ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ, এ কথাই বা পেলে কোত্থেকে ?'

এবারে কথা কাট্‌বার মতো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে প্রথমটা চুপ ক'রে যেতেই চেষ্টা ক'রলো অরুণ, পরে ব'ল্‌লো, 'কবিতাটি খুব এ্যাপিলিং হ'য়েছে। প'ড়তে গিয়ে স্বভাবতঃই মনে হয়—কবি তার নিজের জীবনকেই তুলে ধ'রেছে !'

হেসে বিজন ব'ল্‌লো, 'পাঠকের জীবনও তো হ'তে পারে !'

এ কথার জবাব না দিয়ে অরুণ ব'ল্‌লো, 'মহিন্‌দা তোমাকে তাঁর সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন।'

—'হঠাৎ ?'

—'হঠাৎ নয়, তোমার কাব্য-মালিকার প্রচ্ছদপটের জন্যে।'

—'মহিনদাকেও তবে পড়িয়েছ ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখের পাতা দু'টো একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো বিজনের।

অরুণ ব'ল্‌লো, 'পড়াই নি, শুধু প্রচ্ছদপটটুকু পর্য্যন্তই তাঁর পরিচয় ঘ'টেছে।

হঠাৎ এসে গেলেন কি না! তা ছাড়া মহিন্দার কাছে লুকোচুরি ক'রবারই বা কি আছে?'

—'না কিছু নেই।' ব'লে হাত মুখ ধোয়ার অছিলায় একসময় কল-ঘরের দিকে চ'লে গেল বিজন।

অরুণও আর অপেক্ষা ক'রলো না। সকাল থেকে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও ঘর থেকে বেরোয়নি সে। এবারে হাফ সার্ট গায়ে দিয়ে কিছু সময়ের জন্য সাম্‌নের পার্ক থেকে ঘুরে আসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে প'ড়লো অরুণ।…

রেবা ব'লেছিল—অন্ততঃ পাঁচটা নতুন কবিতা লিখে নিয়ে তাকে শোনাতে, কিন্তু এ ক'দিনে বিজন অন্ততঃ আটটারও বেশী কবিতা লিখেছে, অধিকাংশই রোমাণ্টিক্ মনোধর্ম্মী। যথাসময়ে খাতা নিয়ে সে রেবাদের বাড়িতে গিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু রেবার দেখা পাওয়া গেল না, গঙ্গায় বেরিয়েছে সে হাওয়া খেতে। সহসা সমস্তটা মন একবার বিষণ্ণতায় ভ'রে উঠলো বিজনের। নিশিকান্তের হাতের তৈরী চা খেয়ে মিসেস্ মল্লিকের সঙ্গে উপস্থিত মতো দু'একটা কথা ব'লে আবার এসে বাস ধ'রলো সে।

একসময় ঠাট্টার সুরে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কবির মুখে শুধু যদি বিষাদের ছায়াই দেখবো, তবে দেশকে হাসাবে কে?'

অরুণ ব'ল্‌লো, 'ডি, এল, রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ হাস্‌তে ভুলে গেল। এটা জীবন-ধর্ম্মের লক্ষণ নয়।'

বিজন ইচ্ছে ক'রেই কারুর কথার কোনো জবাব দিল না। পাশ কাটিয়ে একসময় অন্য কোথায় একদিকে উঠে গেল।

একটা দিন বাদ দিয়ে আবার গিয়ে উঠলো সে রেবাদের বাড়িতে। আজও রেবার দেখা পাওয়া গেল না। শুন্‌লো—দিলীপ দত্তদের কি একটা চ্যারিটি ফাংশনে গানের প্রোগ্রাম র'য়েছে তার। কে যেন একবার ভিতর থেকে চাবুক মারলো বিজনকে। মনে হ'লো--রেবা যেন ইচ্ছে ক'রেই তাকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে চাইছে। বিকেলের দিকে ভিন্ন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট থেকে রাসবিহারী এভেন্যুর এতটা পথ আসা বিজনের পক্ষে সম্ভব নয়। ইচ্ছে ক'রেই যেন ইদানিং এ সময়টাকে এড়িয়ে যেতে যাচ্ছে রেবা! হাতের মুঠোর মধ্যে কবিতার খাতা-খানিকে সহসা একখণ্ড প্রস্তর ব'লে মনে হ'লো বিজনের। ফিরে এসে আবার সে পথে দাঁড়ালো। ঠিক ক'রলো, এর পর যেদিন আস্‌বে, খালি হাতেই

আস্‌বে ; রেবা বাড়িতে না থাক্‌লেও অন্ততঃ এমন ব্যর্থতা নিয়ে ফিরতে হবে না।

দিন দু'য়েক পরে সময়টা পরিবর্ত্তন ক'রে নিয়ে রবিবারের সকালে বেরিয়ে প'ড়লো সে রাসবিহারী এভেন্যুর দিকে। এসময়টা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে উপাসনায় আর ব্রহ্মসঙ্গীতে তৎগতমন হ'য়ে ওঠেন আচার্য্য পুরুষ। প্রতি রবিবারে নিয়মিত এ সময়টা উপাসনা সভায় গিয়ে যোগ দেন মিঃ মল্লিক। সঙ্গে যায় দিলীপ দত্ত। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান হ'লে রেবাকে নিয়ে মিসেস্ মল্লিকও গিয়ে কোনো কোনো দিন ঘুরে আসেন সমাজ-মন্দির থেকে। আজ কিন্তু ব্যর্থ হ'তে হ'লো না বিজনকে। রেবা ঘরেই ছিল। দুঃখ প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌লো, 'শুনেছি, দু'দিন এসে তুমি ঘুরে গেছ বিজুদা। দোষ তোমার নয়, আমার ; দু'দণ্ড সময় ক'রে ব'সে তোমার কবিতা শোনা হ'য়ে ওঠেনি। খাতা সঙ্গে নিয়ে এসেছ তো ?'

রেবার এ অনুগ্রহ, না আগ্রহ ? সংশয়ের দোলায় একবার দোল খেয়ে গেল বিজনের মনটা। ব'ল্‌লো, 'খাতা সঙ্গে আনলে হয়তো আজও তোমার দেখা পেতাম না। দেখলাম—খাতাটা একেবারেই অলক্ষুণে।'

—'এম্‌নি ক'রে ব'ল্‌ছো কেন, বিজুদা ?' কিছুটা চঞ্চলতা প্রকাশ ক'রলো রেবা।

বিজন ব'ল্‌লো, 'স্কুল কলেজের মতো তোমার ফাংশন্‌স্ থেকেও নিশ্চয়ই কখনও ছুটি আছে। ছুটির অবকাশে কবিতার মন নিয়েই কবিতা শুনো, এখন থাক্।'

কিন্তু রেবার গান ? গানের মন নিয়েও গান শুন্‌বার অবকাশ চাই কি তেম্‌নি ? কথাটা ব'লে হঠাৎ থেমে গেল বিজন।

রেবা ব'ল্‌লো, 'এ তুমি অভিমানের কথা ব'ল্‌ছো বিজুদা। আমার এই দু'দিনের আকস্মিক অনুপস্থিতিকে কি তুমি ক্ষমার চোখে দেখতে পারো না ?'

দেখতে দেখতে অভিমানের পাহাড় ভেঙে এবারে কুয়াসাবৃত রাত্রির বুক থেকে বরফ নেমে এলো। বিজন ব'ল্‌লো, 'অভিমানটাই শুধু বোধ ক'রলে, আর কিছু নয় ?'

উত্তরে কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল রেবা, ইতিমধ্যে মিসেস মল্লিক এসে সামনে দাঁড়ালেন। এতক্ষণের কথা তাদের সহসা একটা দম্‌কা হাওয়ার মতই কোথায় যে উড়ে গেল—বুঝতে পারলো না তারা।

চৌদ্দ

অদৃষ্টের পরিহাস আর কাকে বলে! রাজসাহীর দাম্পত্য-জীবনে অতর্কিতে একদিন সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল ছন্দার। শ্যামলকান্তির রোগটা গোড়ার দিকে ধরা পড়ে নি, পরে বোঝা গেল প্লুরিশি। শ্যামলকান্তি নিজে ডাক্তার হ'য়েও নিজের রোগ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। স্থানীয় চিকিৎসকদের মধ্যে নিজেকে সার্থক নামে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে দিবারাত্রির অক্লান্ত শ্রমকে সে হাসিমুখেই বরণ ক'রে নিয়েছিল। চৈত্রের খর-রোদ কি শ্রাবণের মুষল-ধারা তাকে ঘরে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। তেম্‌নি পারেনি ছন্দা। কতদিন ব'লেছে, 'এত পরিশ্রম তোমার সইবে না। এ সহরে ডাক্তার তো আরও কতই আছে, তোমার এত রোগী ঘাটবার দরকার কি? যা তুমি রোজগার করো, তাতেই আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে সারা জীবন কেটে যাবে।' হেসে জবাব দিয়েছে শ্যামলকান্তি: 'আমাদের তো সরকারী চাকরী নয় যে, বুড়ো বয়সে ঘরে ব'সে পেন্সন ভোগ ক'রবো! এখন থেকে যদি কিছু সঞ্চয় ক'রতে না পারি, তবে বুড়ো বয়সে কিসের উপর নির্ভর ক'রে বাঁচবো বলো তো?' উত্তরে ছন্দা ব'লেছে, 'সবাই যেভাবে যে অবলম্বন নিয়ে বাঁচে!'—'অর্থাৎ?' কৌতুকের দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছে শ্যামলকান্তি ছন্দার মুখের দিকে।' ছন্দা আর দ্বিরুক্তি করেনি, শুধু মুখ টিপে হেসেছে! অর্থাৎ—সন্তান, তাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা, তাদের একমাত্র বংশধর। অলীক ছিল না এ আকাঙ্ক্ষা ছন্দার জীবনে। কিন্তু বিধাতা সে সম্ভাবনা আজও তার দেহের কোথাও ফুটিয়ে তোলেননি।

কথা রাখেনি শ্যামলকান্তি। যোগ্যতার সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠাকে সে বড় ব'লে মনে ক'রেছিল জীবনে। শীতাতপ আর রৌদ্র-তাপকে তাই ভ্রূক্ষেপ করে নি সে। কিন্তু বিধাতা যাকে দুঃখ দেবেন, তাকে রক্ষা ক'রবে কে? অকস্মাৎ একদিন সেই দুঃখই নেমে এলো ছন্দার জীবনে। তার এত সুখের আকাশে কখন্ কৃষ্ণমেঘ ডেকে এলো! শয্যা নিল শ্যামলকান্তি। বৃদ্ধ তারিণীমোহন ছুটোছুটি ক'রে ডাক্তারের পর ডাক্তার জড় ক'রলেন ঘরে। অষুধে, পথ্যে, ব্যাণ্ডেজে ঘর ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। অলক্ষ্যে হয়ত একবার বিধাতা-পুরুষ হাস্‌লেন। অসহ্য যন্ত্রণা বুকে চেপে একসময় শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌লো

শ্যামলকান্তি। ছন্দার হাত দু'খানিকে বুকে চেপে ধ'রে একবার শেষ কথা ব'ল্তে চেষ্টা ক'রেছিল সে: 'নিয়তি। তার উপর মানুষের হাত নেই। তোমার কথা রাখিনি কোনোদিন, সেই অপরাধের হয়ত শাস্তি দিলেন ভগবান। তুমি দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি।' আরও হয়ত অনেক কথাই বলার ছিল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল শ্যামলকান্তির।

অশ্রুবন্যায় বুক ভেসে গেল ছন্দার। স্থির রাখতে পারলো না সে নিজেকে, শ্যামলকান্তির পরিত্যক্ত দেহের পাশেই কখন্ অলক্ষ্যে সে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়লো। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখলো—চার পাশে তার পাড়া-প্রতিবেশিনীদের ভিড়। শ্যামলকান্তির নশ্বর দেহকে ততক্ষণে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। শোকের আঘাতে নিজের ঘরে তারিণীমোহন ভেঙে প'ড়েছিলেন। পাড়ার লোকেরাই সৎকারের কাজ ক'রে ফিরলো। সংসারের দিক থেকে শুধু ছন্দাই সর্ব্বস্ব হারালো না, নিঃস্ব হ'য়ে গেলেন তারিণীমোহনও। তাঁর বার্দ্ধক্য-জীবনের শেষ অবলম্বন ছিল শ্যামলকান্তি। স্ত্রী সংসার থেকে চক্ষু বুজে গিয়েছেন আজ নয়। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরোটা বছরই একরকম হ'তে চ'ল্লো। শরিকি হিস্যায় জ্ঞাতি-ভাইদের সংসার র'য়েছে, এতদিন আপদে বিপদে তারাই দেখেছে। ছন্দাকে নিজে দেখে নিজের হাতে আশীর্ব্বাদ ক'রে ঘরের বউ ক'রে এনেছিলেন তিনি। সেই থেকে দুঃখেরও কিছু লাঘব হ'য়েছিল তাঁর। স্ত্রীর পরিত্যক্ত সংসারকে আবার লক্ষ্মীশ্রীতে ভ'রে তুললো ছন্দা। সেবা দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, যত্ন দিয়ে ভ'রে তুল্লো সে আবার তারিণীমোহনের বিষাদক্লান্ত ভাঙা মনখানিকে। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ঝোড়ো বাতাস এসে সব কিছুকে অকস্মাৎ ওলট পালট ক'রে দিয়ে গেল। মেরুদণ্ড ভেঙে গেল তারিণীমোহনের, শেষ অবলম্বনের ভিৎ ভেঙে গেল তাঁর জীবনে। এতদিনে তাঁর জীবনে সত্যিকারের সন্ন্যাসমুহূর্ত্ত উপস্থিত।

দিন কয়েক কেটে গেলে একদিন বিনা কারণেই শ্বশুর মশায়ের সাম্নে এসে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে আধো অবগুণ্ঠনে দাঁড়ালো ছন্দা।

তারিণীমোহন জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কিছু ব'ল্বে মা?'

মনের কথা মুখ ফুটে ব'ল্তে গিয়ে একবার বাধা পেল ছন্দা। তারিণী-মোহনের মুখের দিকে তাকাতে দিয়ে নিজের কথাটাকে কিছুতেই সে প্রকাশ ক'রতে পারলো না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললো, 'ডিসপেন্সারীটা বিক্রী ক'রে দিলে হয় না বাবা?'

—'হ্যাঁ, দিতে হবে বৈ কি মা!' অভিভূত কণ্ঠে তারিণীমোহন ব'ল্লেন, 'কাল সন্ধ্যায় বীরেশ্বর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার এসেছিল তার চিঠি নিয়ে। ওষুধপত্র ফার্নিচার কি কি আছে, কিরকম দাম, জান্তে চায়। কিছু সুবিধেয় ছেড়ে দিলে বীরেশ্বর ডাক্তার নিজেই নিয়ে নেয়। অদৃষ্টের কি পরিণাম, তাই ভাবি মা। এতদিন এখানে এই বীরেশ্বরই ছিল শ্যামলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।'—কথার শেষে সারা বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিলেন তারিণীমোহন।

আর দ্বিরুক্তি ক'রলো না ছন্দা। সে জান্তো, দুর্ব্বল মনকে নাড়া দিতে গেলে না পারবে সে শ্বশুর মশাইকে সান্ত্বনা দিতে, না পারবে নিজেকে। নীরবে তাই কিছুক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিঃশব্দে নিজের ঘরের দিকে ফিরে এলো ছন্দা। কিন্তু তাতেই কি সে শান্তি পেলো? যে অশান্তি নিয়ে তিলে তিলে নিজের মধ্যে নিজে দগ্ধ হ'চ্ছে সে, সে আগুন ক্রমে বাইরে এসেও যে তাকে প্রতিমুহূর্ত্তে পুড়িয়ে মারছে! তা থেকে সে মুক্তি পাবে কেমন ক'রে? ঘরের মধ্যে বিষিয়ে উঠছে সে প্রতিমুহূর্ত্তে। শ্যামল-কান্তির স্মৃতি আগুনের শিখা হ'য়ে তাকে দগ্ধে' দগ্ধে' মারছে! খণ্ডকালের একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্তও অসহ্য তার কাছে। কি নিয়ে থাক্‌বে সে, কি দিয়ে সান্ত্বনা দেবে সে নিজেকে? এ ক'দিন ধ'রে কত কান্নাই না কাঁদলো ছন্দা, কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু বরফ হ'য়ে গেছে। কেঁদেই কি সান্ত্বনা আছে, কান্নাই কি পরম প্রশান্তি? কিন্তু পথ কোথায়, মুক্তি কোথায়, মনের আশ্রয় কোথায়? মনটা যে বল্‌গা ঘোড়া, সে যে কোথাও বাধা মানে না!

মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেলে আর-একবার এসে নিঃশব্দে দাঁড়ালো সে শ্বশুর মশায়ের সাম্‌নে।

আজও সেই একই প্রশ্ন ক'রলেন তারিণীমোহন: 'কিছু ব'ল্‌বে মা?'

আজ আর চেষ্টা ক'রেও নিজেকে চেপে যেতে পারলো না ছন্দা। ব'ল্‌লো, 'আমি ক'দিন মাগুরায় গিয়ে থেকে আসি বাবা?'

আপত্তি ক'রতে পারলেন না তারিণীমোহন। সংসারে নিজের রিক্ততাকে বড় ক'রে দেখতে গিয়ে পুত্রবধুর হৃদয় সম্পর্কে অন্ধ ছিলেন না তিনি। ব'ল্‌লেন, 'তাই এস মা। আমিও ক'দিন ধ'রে ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো ভেবেছি। তোমার যে এখানে কত কষ্ট হ'চ্ছে, তা কি বুঝি না? কেউ কি পারে এভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে!'

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'কিন্তু—আমি চ'লে গেলে আপনার যে কষ্ট হবে বাবা!'

—'আমার আবার কষ্ট!' অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিয়ে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'জ্ঞাতি কুটুমেরা আছে, দরকার মতো তারাই দেখবে। তুমি কিছুদিন থেকে এস'গে কাকার কাছে। এখানে থেকে শুধু কর্ত্তব্য ক'রেই যাবে, মনেরও যে পরিবর্ত্তন দরকার মা!'

কেন যেন এবারে আর কিছু-একটাও ব'ল্‌তে পারলো না ছন্দা।

থেমে তারিণীমোহন ব'ল্‌লেন, 'শ্যামলের মা একদিন তিল তিল ক'রে সাজিয়ে তুলেছিল এই সংসারকে। যেদিকে তাকাতাম, সুস্পষ্ট লক্ষ্মীর ছাপ ভেসে উঠতো চোখের উপর। অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম—নারীর কি অসামান্য শিল্পকুশলতা! কিন্তু থাকলো না, সেও চক্ষু বুজে গেল, তার সাজানো ঘরও ভেঙে গেল একে একে। তারপর এলে তুমি, তোমার স্নেহকোমল হাতে আবার সেজে উঠলো ঘর, দেখে বুক জুড়ালো। সে ঘর যে আবার এম্‌নি ক'রেই ভাঙবে, এও কি ভাবতে পেরেছিলাম! অদৃষ্ট মা, সব আমার এই অদৃষ্ট।' ললাটে একবার করাঘাত ক'রলেন তারিণীমোহন। সাথে সাথে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে গালের দু'পাশ ভিজে গেল তাঁর।

ছন্দাও নিজেকে সম্বরণ ক'রতে পারেনি, অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠেই সে ব'ল্‌লো, 'আমি যাবো না বাবা।'

হাতের তেলোয় অশ্রু মুছে নিয়ে তারিণীমোহন ব'ললেন, 'তা হয় না মা। এখানে এই যক্ষপুরি আগ্‌লে এম্‌নি ক'রে তুমি থাকতে পারো না। মন জিনিষটা তো পাথর নয়, সেখানে উত্থান পতন আছে, তাকে আত্মস্থ হবার সুযোগ দিতে হয়। আমি হাজার হ'লেও পুরুষ মানুষ, দিন আমার একরকম চ'লে যাবেই। তুমি বরং এই বুড়ো বাপটার মাঝে মাঝে খোঁজ নিও, তা হ'লেই আমার শান্তি।'

নীরবে মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা। বিকেল গড়িয়ে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছিল। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে একসময় সে তুলসীমঞ্চ থেকে প্রণাম সেরে এলো।...

এর পর একটা সপ্তাহও কাটলো না।

মাগুরায় কাকার আশ্রয়েই আবার ফিরে এলো ছন্দা। সেই চিরপরিচিত শ্যামল তরুশ্রেণী, ছোটবেলার খেলার সেই প্রাণময় পরিবেশ, নবগঙ্গার সেই ঢেউখেলানো স্নিগ্ধ জলরাশি, মাসীমা নির্ম্মলার সেই বুকভরা স্নেহ, তার সাথে

মিশে আছে বিজুদার অনন্ত ভালবাসা। মনটাকে আবার যদি তবু ফিরিয়ে আনা যায় সেই শিশুজীবনের মাঝখানে !

* নির্ম্মলা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদটা জেনেছিলেন, জেনে অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে-ছিলেন নিজের মনে : 'হায়রে হতভাগিণী! মানুষকে এত দুঃখও দেন ভগবান !' যে দুঃখের অনলে সারাজীবন পুড়ে ম'রলেন তিনি, সেই দুঃখ-সাগরে অবশেষে ছন্দাকেও ঝাঁপ দিতে হ'লো ! এত বড় দুঃসংবাদটা চেষ্টা ক'রেও বিজনকে পৌঁছে দিতে পারেন নি তিনি। নির্ম্মলা জান্‌তেন—কলকাতার মেসের ঘরে ব'সে ছন্দার এতবড় শোক বিজন সহ্য ক'রতে পারবে না। ইচ্ছে ক'রেই তাই ছেলের কাছে গোপন ক'রে গেছেন তিনি সংবাদটা। ছন্দা এসে এবারে যখন তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো, তখন সান্ত্বনা দেবার ভাষাটুকু পর্য্যন্ত খুঁজে পেলেন না তিনি। সস্নেহে মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শুধু ব'ল্‌লেন, 'এ তোর কপাল পোড়েনি মা, পুড়েছে আমাদের। কাঁদিসনে, কেঁদে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। কাঁদলাম তো এতকাল আমিও, কিন্তু পেয়েছি কি ? কপালের সিঁদুর মুছে এলি, এ তোর জীবনের যত বড় সত্য হ'লো, তার চাইতেও বড় সত্য হ'লো—আজ থেকে তুই এই পোড়া বাংলাদেশের হতভাগিনী বিধবা। জানিস তো—এ সংসারে বিধবার কি জ্বালা ! কোথাও তার মাথা উঁচু ক'রে কথা বল্‌বার অধিকার নেই ।' ব'লতে গিয়ে নিজেকে সম্বরণ ক'রতে পারলেন না নির্ম্মলা। টশ্‌ টশ্‌ ক'রে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে ছন্দার কপালের এক পাশ ভিজে গেল। থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'সংসারের নানা বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে এপথ যেন ভুলে যাস্‌নে মা। রোজ অন্ততঃ একবারটি এসে মাসীমাকে দেখা দিয়ে যাস্।'

—'না এলে আমিই বা কি নিয়ে বাঁচবো মাসীমা !' বল্‌তে গিয়ে অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল ছন্দার।

ঘরে এলে একসময় রসিকলাল কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন ছন্দাকে। শরীরে বাত এসে আজ প্রায় একেবারেই পঙ্গু ক'রে ফেলেছে রসিকলালকে। আগের চাইতে বুড়িয়েও গেছেন অনেকখানি। সংসারবৈরাগ্য-মন নিয়ে এখনও তবু তাঁকে সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রতে হ'চ্চে বাইরের বৈঠক-খানা ঘরে ব'সে। সেদিকে এতটুকু সহানুভূতি নেই অঞ্জনার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার জিহ্বা তাঁর প্রশমিত না হ'য়ে আরও শাণিত হ'য়েছে। ছন্দার বিয়ে হ'লে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি ; হতভাগিকে বিদায় ক'রে

নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলেন তিনি চিরদিনের মতো। কিন্তু ভগবান তাতে বাদ সাধলেন। এতদিনে সাশ্রনেত্রে ছন্দা এসে আবার তাঁকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই কপালে চোখ তুল্লেন অঞ্জনা, মনে মনে অভিসম্পাত ক'রলেন: শ্যামলকান্তি না গিয়ে ছন্দা কেন গেল না চক্ষু বুজে! হাড় তবে জুড়োতো অঞ্জনার। সংসারে বৈধব্যের যে আরও বেশী জ্বালা, তার জন্যে চাল-চুলোর ব্যবস্থা চাই স্বতন্ত্র, ছোঁয়া-ছানার বালাই আছে পদে পদে। এমন জ্বালায় মানুষ পড়ে!

কিন্তু অঞ্জনার জ্বালা কোনকালেই যেমন রসিকলালকে বেঁধেনি, আজও তেম্নি বিঁধলো না। বরং ছন্দার দিকে তাকাতে গিয়ে দুঃখে বুকখানি তাঁর ভেঙে গেল। নিজের হাতে একদিন বিয়ের আসরে তিনি সম্প্রদান ক'রেছিলেন ছন্দাকে, তার পিছনে এমন অভিঘাত লুকোনো ছিল, এও কি জান্তেন তিনি?

ছন্দাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে কণ্ঠ তাই আদ্র্র হ'য়ে উঠলো রসিকলালের। ব'ল্লেন, 'মনকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা কর্ মা। হিন্দু জাতি আমরা আত্মায় বিশ্বাসী, আত্মা অমর, তার মৃত্যু নেই। গীতায় ভগবান ব'লেছেন—বাসাংসি জীর্ণানী, অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ ক'রে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র পরে, তেমনি জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে নতুন দেহ ধারণ করে আত্মা। দেহ পচনশীল, কিন্তু আত্মা অমর। শ্যামলের সেই অমর আত্মা অমৃতলোকে শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা কর্ মা।'

দিনরাত যে সেই প্রার্থনাই ক'রছে ছন্দা। তার কি ভাষা আছে, তার কি অভিব্যক্তি আছে! তিলে তিলে সেই প্রার্থনা যে তার ধমনীর রক্তে রক্তে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হৃদয় তবু প্রশমিত হচ্ছে কই? এখানে যাঁর সঙ্গে তার প্রতিমুহূর্ত্তের সম্পর্ক, তাঁর মুখ কালো মেঘের মতো থম্থমে, গম্ভীর। তিনি অঞ্জনা। আর যে ছিল, সে সবিতা, কিছুদিন হ'লো তার বিয়ে হ'য়েছে। রাজসাহীর ঘরে ব'সে সংবাদ পেয়েছিল সে যথাসময়েই, কিন্তু এসে বিয়েতে যোগ দেওয়া হয় নি তার। কাকা নিজেই উৎসাহ দেখাননি। না দেখাবার পিছনে তাঁর যে কতখানি ব্যথা লুকিয়ে ছিল, সে কি জানতে বাকী আছে ছন্দার! দু'চোখের বিষ কি সবিতারই কম ছিল সে! খবর এসেছে—আট ন মাসের পোয়াতি সে, শীগগিরই মার কাছে আসবে। এসে আবার কোন্ নজরে দেখবে সে তাকে, ভগবানই জানেন। কিন্তু যাকে দেখলে, যার মুখের দুটো কথা শুন্লে এই থম্থমে নিস্তব্ধতার মধ্যেও বুকখানি শান্তিতে ভরে যেতো, সে

আজ গ্রামে নেই। সে বিজুদা : বিজন। প্রতি মুহূর্ত্তে আজ তার অভাবটাই বড় ক'রে বাজছে বুকে। মনের শান্তির জন্য মানুষ এমন ক'রেও মাথা খুঁড়ে মরে!

এক কথা ভাবতে গিয়ে সহস্র কথার জাল এসে ঘিরে ধরে সারা মনটাকে। চিন্তাধারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। রসিকলালের কথার জবাবে একটি কথাও এসে অধরোষ্ঠকে কাঁপিয়ে তোলে না।—বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু ক'রে নিল ছন্দা।

ভাঁড়ার ঘরের সাজসরঞ্জাম নিয়ে তখন উদ্দীপ্ত কণ্ঠ জ'লে উঠেছে অঞ্জনার। কাকার পাশ থেকে উঠে ত্রস্তে একসময় কাকিমার পাশে গিয়েই দাঁড়ালো ছন্দা, ব'ল্‌লো, 'আপনি ঘরে গিয়ে বসুন কাকিমা, আমি গুছিয়ে রাখছি সব।'

পনের

কল্‌কাতার জীবনে মহেন্দ্র ততক্ষণে বিজনকে নিয়ে মুক্ত হওয়ায় মুখর হ'য়ে উঠেছে বোটানিকাল গার্ডেনে। বিজনের 'কাব্য-মালিকা' যথাসময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল মহেন্দ্রের। অরুণই উৎসাহী হ'য়ে সংযোগটা ঘটিয়েছিল। সেই থেকে অরুণেরও বিজনের কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে কৌতুহল বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। মনে মনে সেও কবিতা রচনার প্রয়াস খুঁজছিল, কিন্তু আকাশ-পাতাল ভেবে একটা পংক্তিও কলমের ডগায় ফুটিয়ে তুল্‌তে পারছিল না। শেষ পর্য্যন্ত কাব্যসৃষ্টিকে ঈশ্বরপ্রদত্ত বস্তু ব'লে মনে মনেই কাব্যলক্ষ্মীকে নমস্কার ক'রে আত্মসম্বরণ ক'রেছিল। কিন্তু মহেন্দ্রের দিকটা একেবারেই স্বতন্ত্র। এককালে কবিতা সে ভালবাস্‌তো, কবিতা রচনায় হাতও ছিল তার; কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে একদিন সেই কবিতা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল তার জীবনে। সেটা সে ভিন্ন সংসারের দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কেউ জানে না। মাঝে মাঝে স্মৃতির পথ বেয়ে সেই জীবনটা এসে সাম্‌নে দাঁড়ায়, অলক্ষ্যেই আবার সে চঞ্চল কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে কখন্ হারিয়ে যায়। বোটানিকাল গার্ডেনের মনোরম পরিবেশে আবার সেই জীবনটা যেন মনের কোন্ নিভৃত কোণে হঠাৎ এসে উঁকি দিয়ে গেল। নিজেকে সম্বরণ ক'রে যেতে চেষ্টা ক'রলো মহেন্দ্র। ব'ল্‌লো, 'তোমার কবিখ্যাতি একদিন দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনাই করি বিজন। কিন্তু সংসারের পথ বড় ক্ষুরধার, জীবনে কাব্যকে টিকিয়ে রাখা সেখানে মস্তবড় শক্তিসাপেক্ষ।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'সামান্য একটা খণ্ডকালেই যার সমাধি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, গোটা জীবনের প্রশ্নটা সেখানে একেবারেই অসার্থক। কবিতা লেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছি মহিন্‌দা, তা নিয়ে আমার জীবনে কোনো প্রশ্নই নেই। আপনি লিখ্‌লেই বরং তা শোভা পায়।'

—'ফট্‌কা বাজারের মানুষ হ'য়ে আমি লিখবো কবিতা, এবারেই হাসালে তুমি।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'এখন জীবন নেই, শুধু জীবিকা।'

—'কোনোদিন তবে জীবন ছিল বলুন?' চ'লতে চ'ল্‌তে হঠাৎ একবার থ'ম্‌কে তাকালো বিজন মহেন্দ্রের মুখের দিকে।

আত্মসম্বরণের বাঁধ বুঝি এবারে একেবারেই ভেঙ্গে যেতে ব'স্‌লো!

কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। তোমার কাব্য-মালিকার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিতে নিতে সেই জীবনটার দিকেই হঠাৎ একবার কখন্‌ দৃষ্টি প্রসারিত হ'য়ে গেল। ফেরাতে পারলুম না।'

—'কবিতা তবে আপনিও লিখতেন?'

গাছের ডালে ডালে দক্ষিণা বাতাস একবার দোলা দিয়ে গেল। সেদিকে কারুর লক্ষ্য গেল কিনা ব'ল্‌তে পারি না।

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'লিখতুম। উঠ্‌তি যৌবনের জোয়ারে তখন কেবল স্নান ক'রে উঠেছি। কবিতার মতো একটি সুন্দরী মেয়েকে একদিন ভালোবাসলাম হঠাৎ, হাসি ছিল তার শরতের শিউলীর মতো। সেই প্রথম জীবনে আমার কবিতা এলো। রোজ একটি ক'রে কবিতা লিখতাম আর তাকে উপহার দিতাম। দু'বছরে প্রায় সাতশো ত্রিশটা কবিতা জমা হ'য়েছিল তার হাতে, সেই সাথে ভালোবাসা দিয়ে ঘেরা দু'একটুক্‌রো চিঠি। কিন্তু আমি কি জানতুম, শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণ ক'রতে চ'লেছি! আমার জীবনে মল্লিকার আবির্ভাব ঘট্‌লো না। কোথায় একদিন তার মালাবদলের অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে চুকে গেল। মনে মনে ব'ললাম—সুখী হও তুমি মল্লিকা।'

পা দু'খানি হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে এসেছিল বিজনের, মুহূর্ত্তের জন্য একবার থ'মকে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লো, 'ব'ল্‌তে পারলেন একথা মহিন্‌দা?'

—'পারলুম বৈ কি! তার অকল্যাণ কি কোনোদিন চেয়েছি?' ব'লে ম্লান একটুক্‌রো হাসলো মহেন্দ্র।

বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আর কোনোদিনই কি তার দেখা পাননি?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'পেয়েছি, শুধু একবার এবং শেষবার। ব'ল্‌লাম, 'কবিতাগুলো এবারে ফিরিয়ে দাও, ওগুলো দিয়ে বই ছাপিয়ে তোমার নামে উৎসর্গ ক'রে প্রেমকে আমার অক্ষয় ক'রে রাখবার অন্ততঃ কিছুটাও সুযোগ পাই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন বজ্রপাত ঘট্‌লো। ব'ল্‌লো—অতীতের ছেলেখেলাকে এতদিনও কি সযত্নে সাজিয়ে রাখতে বলো? সংসারদুর্গে প্রবেশ ক'রবার দিন সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলেছি। শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে ফিরে এলাম সেদিন মল্লিকার সাম্‌নে থেকে। ভালোবাসা হ'লো ছেলেখেলা, তাই নির্ব্বিবাদে তার বুকে অগ্নিসংযোগ ক'রে দিতে পারলো সে। ভাবলাম—কবিতা দিয়ে নিজের জীবনটাকে অন্ততঃ আর কোনোদিনই প্রতারণা ক'রবো না। বেছে নিলাম পথ, জীবনটা ফট্‌কা ভিন্ন আর কিছুই নয় বিজন। ঢুকলাম

তাই এই ফটকার কারবারে শেয়ার মার্কেটে। এ ব্রিলিয়েণ্ট লাইফ্, বেঁচে থাক্‌বার পক্ষে অন্ততঃ চমৎকার জীবন।'

একটা দুরন্ত জিজ্ঞাসা হঠাৎ যেন কেমন রুদ্ধ হ'য়ে গেল বিজনের কণ্ঠে। মনে মনে শুধু একবার উচ্চারণ ক'রলো সে—অদ্ভুত বিচিত্র মানুষ এই মহেন্দ্র। বাইরে কঠিন কর্ম্মব্যস্ততার প্রলেপ দিয়ে প্রশমিত ক'রে রেখেছে অন্তরের ব্যথা-দীর্ণ ভালোবাসাকে। স্বল্পক্ষণ থেমে পরে ব'ল্‌লো, 'আপনি শক্তিমান পুরুষ, মহিন্‌দা।'

—'অর্থাৎ ?'

—'অর্থাৎ—এমন ক'রে যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে, সংসারে সে যথার্থই শক্তিমান বৈ কি ?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'প্রেমের ব্যাপারে আত্মবলি দেওয়াকে চিরকালই আমি কাপুরুষতা ব'লে ঘৃণা করি। মল্লিকাকে না পেয়ে তাই মনে দাগ রাখতে দিই নি।'

এবারে না হেসে পারলো না বিজন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'হাস্‌লে যে বড় ?'

—'হাসির কথা ব'ল্‌লেন কি না, তাই।' বিজন ব'ল্‌লো, 'যেটাকে দাগ ব'ল্‌লেন, সেটা ঠিকই অন্তরে বিঁধে আছে, তাকে শুধু ছাই চাপা দিয়ে রেখেছেন, এই পর্য্যন্ত।'

—'ধ্যেৎ।' কৃত্রিম বকুনির সুরে হঠাৎই শব্দটা উচ্চারণ ক'রলো মহেন্দ্র। তারপর থেমে ব'ললো, 'চলো, এবারে ফিরি।'

বিজন বুঝলো, ইচ্ছে ক'রেই নিজেকে চেপে যেতে চাইল মহেন্দ্র। তাই আর কথাটা নিয়ে বড়বেশী ঘাটাঘাটি ক'রলো না সে ; কথার তাল রেখে শুধু ব'ল্‌লো; 'চলুন।'

বোটানিকাল গার্ডেনের বুকে তখন চাঁদের আলো এসে ঠিক্‌রে প'ড়েছে। এমন অপূর্ব্ব পরিবেশে চাঁদটাকে আজ নতুন চোখে দেখতে পেলো বিজন। কল্‌কাতায় এসে অবধি এমন ক'রে এর আগে কখনও চন্দ্র-দর্শন ঘটে ওঠে নি। চাঁদের জ্যোৎস্নালোকিত আর্শিতে প্রথম যার মুখখানি তার মনে ভেসে উঠলো, সে ছন্দা। সহসা ছন্দার জন্য মনটা কেমন অস্থির হ'য়ে উঠলো তার। শ্যামলের অসুখের কথাটাই শুধু শুনেছিল সে, তার নিরাময়ের সংবাদ এসে তার কানে আর পৌছায় নি। আর একবার উর্দ্ধাকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন

লক্ষ্য ক'রলো সে চন্দ্রাননের মধ্যে! এবারে যার মুখখানি অকস্মাৎ ভেসে উঠলো তার মনে, সে রেবা। চাঁদের মতই শুভ্রকান্তি। মনে প'ড়লো—কিছুদিনের মধ্যে আর বড়-একটা যাওয়া হয়নি রেবাদের বাড়িতে। এই মুহূর্তে এই চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় মুখোমুখি ব'সে যদি অবকাশ পেতো সে রেবার স্বভাব-সুন্দর কণ্ঠের গান শুন্‌বার, আরও শুভ্রসুন্দর হ'য়ে উঠতো না কি তবে এই জ্যোৎস্নাবিধৌত সন্ধ্যা?

চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'খানিকটা যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়লে তুমি, দেখতে পাচ্ছি।'

ছোট্ট ক'রে বিজন শুধু ব'ল্‌লো, 'উপভোগ ক'র্‌ছি এই সুন্দর সন্ধ্যাটাকে।'

সহসা অদ্ভুত একটা প্রশ্ন ক'রে ব'স্‌লো মহেন্দ্র, 'আজ যদি অমাবস্যা হ'তো?'

—'শ্মশানে গিয়ে তবে আত্মদর্শন ক'রতাম।' জবাব দিতে এতটুকুও বিলম্ব হ'লো না বিজনের। ব'ল্‌লো, 'অন্ধকারের গর্ভ থেকে যখন চিতাগ্নি জ'লে উঠতো, তার স্ফুলিঙ্গকে তারার মতো উড়িয়ে দিতাম এম্‌নি একটা চাঁদের প্রচ্ছন্ন রূপের উদ্দেশ্যে। অমাবস্যারও একটা আলাদাই রূপ আছে বৈকি মহিন্‌দা?'

মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কবি মানুষ তুমি, তোমার কাছে রূপ আর অ-রূপ এক হ'য়ে গেছে। আমরা বাস্তব জগতের মানুষ, আমাদের কাছে অমাবস্যাটা বিভীষিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়।'

ইতিমধ্যে সাম্‌নে এসে বাস দাঁড়াতেই দু'জনে উঠে প'ড়লো। কণ্ডাক্টারের হাঁকাহাঁকিতে কণ্ঠ এবারে তাদের চাপা প'ড়ে গেল। ভ্যাঁপুর কর্ণবিদারি শব্দে দ্রুত বেগে ছুটে চ'ল্‌লো বাস: বোটানিকাল গার্ডেনকে পিছনে ফেলে একেবারে শিবপুর বাজার, তারপর হাওড়া ষ্টেশন, তারপর—

যখন এসে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে পৌছালো তারা, সাম্‌নের একটা বড় টাওয়ার ক্লকে তখন জলতরঙ্গের মতো সাড়ে আটটার ঘণ্টা বেজে যেতে শোনা গেল।...

ষোল

পরদিন ছাত্র পড়িয়ে ফেরার পথে মেসে না এসে সোজা গিয়ে উপস্থিত হ'লো বিজন রেবাদের বাড়িতে। মাঝের হল-ঘরে ব'সে মিঃ মল্লিক তখন কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন তরুণ ব্যারিষ্টার দিলীপ দত্তের সঙ্গে। উপরে নিজের ঘরে ব'সে 'গীত-বিতান'-এর পৃষ্ঠা থেকে নতুন কি একটা গানের কলি মুখস্থ ক'রছে রেবা। মিসেস্ মল্লিক মাঝে মাঝে সাম্‌নের বারান্দা দিয়ে এসে ঘুরে যাচ্ছেন।

মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যেতেই বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'শরীর ভালো আছে তো মাসীমা?'

—'হ্যাঁ বাবা, ভালই আছি।' মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'তোমার খবর কি, নিয়মিত কলেজ চ'লেছে?'

—'শুধু চ'লেছে নয়, পরীক্ষাও এসে গেছে।' স্মিতহাস্যে বিজন ব'ললো, 'আজকাল আর বডবেশী সময় পাই না। মা সরস্বতী শেষ পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ক'রবেন কি না, কি জানি!'

—'মা সরস্বতী না হ'লেও মায়ের আশীর্ব্বাদ তো র'য়েছে পিছনে! তোমার মতো ছেলের মনে সংশয় আস্‌বে কেন!' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'চলো, উপরে গিয়ে বসি, রেবাও উপরে আছে।'

মাঝের হল-ঘর পেরিয়ে মিসেস্ মল্লিকের অনুগমন ক'রতে গিয়ে মিঃ মল্লিক ও দিলীপ দত্তের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল বিজনের। দিলীপ দত্ত ব'ললো, 'গুড্ ডে, ওয়েল ইউ আর?'

—'এ্যাজ্ ইউজুয়াল।' থেমে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আপনাদের খবর কি?'

—'ট্যু বিজি উইথ্ ফাংশন্, তা ছাড়া ফিজিকালি ও. কে।' ব'লে আবার নিজের কাজে মন দিল দিলীপ দত্ত।

উপরে আস্‌তেই রেবার দেখা পাওয়া গেল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে রুমখানি। হঠাৎ দেওয়ালের দিকে চোখ প'ড়তেই দেখা গেল—সুন্দর রূপালী কাঠের ফ্রেমে কার্ডবোর্ডে বাঁধানো র'য়েছে রেবার জন্মদিনে উপহার দেওয়া

বিজনের সেই আট লাইনের কবিতাটিঃ ‘পুষ্পময়ী হোক্ আজ তোমার জন্মদিন…।’ রেবা সত্যিই মর্য্যাদা দিয়েছে তাকে!

ততক্ষণে ‘গীত-বিতান’-এর পৃষ্ঠা বুজিয়ে রেখে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সেছে রেবা।

বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, ‘সঙ্গীতচর্চ্চা হচ্ছিল নিশ্চয়ই?’

রেবা ব'ললো, ‘চর্চ্চা ঠিকই ব'লতে পারো, তবে সুর নয়, শুধু কথা।’

মেয়ের হ'য়ে এবারে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, ‘কথা ছাড়া সুর আস্‌বে কোত্থেকে বলো বিজু? ঠাণ্ডা লেগে ক'দিন ধ'রে টন্‌সিল বেড়েছে রেবার, ভয় হ'চ্চে—উৎসবের দিনে গিয়ে ও সত্যিই কিছু গাইতে পারবে কি না!’

বিজনের চোখ দু'টো এতক্ষণ রেবার দিকেই নিবদ্ধ ছিল, ব'ললো, ‘ভয় নেই, গাইতে ব'লবো না।’

শুনে ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু এক টুক্‌রো হাসি চেপে গেল মাত্র রেবা।

থেমে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, ‘কিসের উৎসব মাসীমা? মিঃ দত্তও ফাংশনের কথা উল্লেখ ক'রলেন!’

—‘আমাদের সমাজের মাঘোৎসব।’ মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, ‘সমাজমন্দিরে ফাংশন, যাবতীয় কাজের ভার প'ড়েছে এবারে রেবার বাবা আর দিলীপের উপর। আসলে দিলীপই সব ক'রছে, উনি শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমার কিন্তু সেদিন বিশেষ নেমন্তন্ন, কাল পরশু বাদ দিয়ে সামনের সোমবার। আশা করি, নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধে হবে না!’

বিজন ব'ললো, ‘জীবনে নতুন জিনিষ দেখবো, নতুন আনন্দের মধ্যে যোগ দেবার সুযোগ পাবো, এর জন্যে অসুবিধে যদি কিছু হয়ই, সে অসুবিধে বরণ ক'রে না নেয় কে? নিশ্চয়ই আস্‌বো আমি।’

—‘এলে খুব খুসী হবো। রাত্রে একেবারে এখান থেকে খেয়ে দেয়ে মেসে ফিরবে।’ থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, ‘নিশিকে ডেকে বিজুকে চা দিতে বল, রেবা।’

বাধা দিয়ে বিজন ব'ললো, ‘চা এখন থাক মাসীমা, এই কিছুক্ষণ আগেই ছাত্রবাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। যখনই আসি, তখনই তো কত কিছু খেয়ে যাই, খাবার উপরেই তো আছি!’

স্নেহকণ্ঠে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, ‘খাবার এই তো বয়স চ'লে যায়। ছোট-

বেলার দিনগুলির কথা একবার মনে করো তো বাবা, খাবার নিয়ে তোমরা তিনটিতে কী না ক'রতে?'

সলজ্জ হাসিতে মুখখানি একবার রাঙা হ'য়ে উঠলো বিজনের, অপাঙ্গে একবার রেবার মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা ক'রলো সে।

থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ললেন, 'ভালো কথা, ছন্দার খবর কিছু রাখো? মেয়েটার জন্যে বড্ড মায়া হয়।'

বিজন ব'ললো, 'কিছুদিন আগে মার চিঠিতে জেনেছিলাম, ছন্দার বরের বড় অসুখ, কি অসুখ শুনিনি। মাকে লিখেছিলাম তাড়াতাড়ি খোঁজ নিয়ে কুশল জানাতে, কিন্তু মার আর কোনো চিঠি এপর্য্যন্ত পাই নি।'

ইতিমধ্যে নীচে থেকে মিসেস্ মল্লিকের ডাক প'ড়লো। বিজনও আর অপেক্ষা ক'রলো না, ব'ল্লো, 'অতর্কিতে এসে তোমার কথা-চর্চ্চায় কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি ক'রে গেলাম রেবা; এবারে নিজের স্বার্থেই উঠতে হ'লো, পরীক্ষার প্রিপারেশনের দিকে মন দিতে হচ্ছে।'

রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'সোমবার তা হ'লে আস্‌চো নিশ্চয়ই!'

—'আস্‌বো।' ব'লে মিসেস্ মল্লিকের সঙ্গেই আবার সিঁড়ি গলিয়ে নীচে নেমে এলো বিজন।

দিলীপ দত্ত ব'ল্লো, 'আমাদের ফাংশনে আপনি কিছু রিসাইট করুন না, স্বরচিত কোনো ভালো কবিতা?'

বিজন ব'ল্লো, 'যেমন ক'রে ব'ল্লেন, তাতে কবিতাকেও অমর্য্যাদা করা হ'লো, আমাকেও ঠাট্টা করা হ'লো। আমি রিসাইট্ ক'রতে পারি, এ আইডিয়া আপনার হ'লো কেমন ক'রে?'

—'আপনার কাব্যচর্চ্চা থেকে।' অতি সহজ সুরেই দিলীপ দত্ত ব'ললো, 'কবিরা ভালো আবৃত্তি ক'রতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস ছিল।'

—'কাব্যচর্চ্চা আমি ছেড়ে দিয়েছি, তা ছাড়া কবিতা লিখলেই যে কবি হওয়া যায় না—এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।' থেমে স্মিতহাস্যে বিজন ব'ল্লো, 'আপনি বরং সত্যিকারের কোনো জাত-কবিকেই এ ভার দিয়ে তৃপ্ত হ'ন্।'

উত্তরে দিলীপ দত্ত কি একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রে মিঃ মল্লিক ব'ল্লেন, 'বিজুর কথা শোন।'

—'শুনেছি, খারাপ কিছু বলেনি। অভ্যাস না থাকলে ও কেমন ক'রে

আবৃত্তি ক'রবে?' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'উৎসবের দিন বিজু আসবে, রাত্রে এখান থেকে খেয়ে যেতে ব'লে দিলাম।'

মিঃ মল্লিক ব'ল্লেন, 'কাজের কাজ ক'রেছ, নানা ঝঞ্ঝাটে আমি হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ব'লতেই ভুলে যেতাম। বিজু আমাদের ঘরের ছেলে, উৎসবের দিন ও না থাক্‌লে কি হয়!'

বিজন কিছু-একটাও আর ব'ল্লো না। নীরবে একসময় বিদায় নিয়ে পথে এসে গাড়ীর জন্য ষ্টপেজে দাঁড়ালো। মাঘের হিমশীতল রাত্রি। কন্‌কনে শীতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে নিচ্ছিল। সঙ্গে শীতবস্ত্র ব'ল্‌তে কিছু নেই, কলকাতার জীবনে একখানি লেপমাত্র তার সম্বল। প্রতি পদে পদে দীনতার উদ্বেল আবর্ত্ত। সংস্কৃতিগত মন নিয়ে জীবনে বড় হ'য়ে উঠতে হ'লে অবস্থারও যে উন্নতির দরকার! অবস্থার সেই পরিপূরক সামর্থ্য কোথায় তার?

অকস্মাৎ সাম্‌নে একখানি ট্রাম এসে দাঁড়িয়ে প'ড়তেই ত্রস্তে উঠে প'ড়লো বিজন।···

পুরো ছু'টো দিন তার একরকম আত্মবিশ্লেষণেই কেটে গেল। রাশিকৃত পড়ার চাপ মাথায় থাকতেও বইয়ের সঙ্গে ঠিক মনঃসংযোগ ক'রতে পারলো না সে। জীবনে আর একবার এম্‌নি একটা মুহূর্ত্ত এসেছিল, ছন্দা তখন রাজসাহীতে বউ হ'য়ে যাচ্ছে। দৌলতপুরের নিঃসঙ্গ হষ্টেল-জীবনে ব'সে এম্‌নি ক'রেই উন্মনা হ'য়ে উঠেছিল সে। সেখানে ছিল কলেজ-হষ্টেল, এখানে পাব্‌লিক-মেস। দৌলতপুর আর কল্‌কাতা। আজ নিজেকে নিয়ে ভাবতে ব'সে চিন্তাসূত্রকে আরও অর্থগর্ভ, আরও জটিল ব'লে মনে হ'চ্চে বিজনের কাছে। আজ হৃদয়ের সমস্ত কামনা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে রেবার মধ্যে। যত ঐতিহ্যের মধ্যেই সে মানুষ হোক্, সেই ঐতিহ্যকে জয় ক'রে নিতে হবে তাকে, তবেই তার জীবনের যথার্থ বিকাশ, জীবনের যথার্থ বিস্তৃতি। সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যেও সে প্রাণ দিয়ে আজ ভালোবাসে রেবাকে। ছন্দাকে ভালোবাসাটা আজ এ ভালোবাসার একেবারেই উল্টো পিঠ। তাকে শুধু দূর থেকেই শুভকামনা জানাতে পারে বিজন, কিন্তু রেবাকে চায় সে প্রণয়ের নিবিড় রসের মধ্যে পরিণীতা বধূরূপে। ভালোবেসে দূর থেকে আত্মপ্রসাদ লাভকে দার্শনিক প্লেটো যতবড় সংজ্ঞাই দিয়ে থাকুন না কেন, তাতে আজ আর অন্ততঃ বিশ্বাস রাখতে পারছে না সে। রেবাকে পেলে সংস্কৃতি-জগতের বৃহৎ আকাশটা খুলে যাবে তার ছু'চোখে; সেই আকাশে প্রাণরক্ত বলাকার মতো

উড়ে যেতে পারবে সে কবিতা হ'য়ে। আবার কবিতার প্রতিষ্ঠা হবে তার জীবনে। একদিন বড় হবার আশা নিয়েই অনাত্মীয় এই মহানগরীর পথে পা বাড়িয়েছিল বিজন, আজ সেই অনাত্মীয়তা অনেকখানিই আত্মীয়তায় সিক্ত হ'য়েছে। ঐশ্বর্য্যময়ী এই মহানগরীকে নিবিড় ক'রে পাওয়া এতই কি শক্ত?

একসময় মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি ভাবছো বিজু?'

নিজেকে খানিকটা প্রকৃতিস্থ ক'রে বিজন ব'ল্‌লো, 'না, কিছু না।'

পাশ থেকে অরুণ ব'ল্‌লো, 'না কেন, নিশ্চয়ই নতুন কোনো প্লট। সৃষ্টির উন্মাদনায় অধীর বসুন্ধরা। অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই এ কথা, কাব্য-মালিকার দ্বিতীয় পর্ব্ব নইলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।'

—'কিন্তু—লক্ষ্মী ভিন্ন মালিকাই বা কার গলায় দুল্‌বে?' ব'লে ঠোঁটের ফাঁকে চাপা একটুক্‌রো হাসি গোপন ক'রে নিল মহেন্দ্র।

বিজন ব'ল্‌লো, 'এমন ক'রেও ঠাট্টা ক'রতে পারেন মহিনদা?'

—'ঠাট্টা নয় ভাই, খানিকটা রসিকতা।' মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'সারাদিনে রসালাপের ক্ষেত্র তো কোথাও পাইনে, তোমাকে উদ্দেশ্য ক'রে নিজের বুকের জ্বালা তবু খানিকটা মিটিয়ে নেবার অবকাশ পাই।'

অরুণ ব'ল্‌লো, 'মহিন্‌দার বুকেও তবে আগুন জ্বলে? শুধুই তবে বরফের ধোঁয়া নয়?'

—'তারও একটা তাপ আছে—যদিও দাহ নেই।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'লুকোও ক্ষতি নেই, কিন্তু সত্যিই দু'দিন ধ'রে তোমাকে বড্ড টায়ার্ড মনে হ'চ্ছে বিজু; পরীক্ষা সাম্‌নে, খানিকটা চিয়ারফুল হ'তে চেষ্টা করো।'

—'শরীরটা ক'দিন ধ'রে কেমন যেন ভালো যাচ্ছে না মহিনদা, মনে হ'চ্চে—খুব শীগ্‌গিরই কিছু-একটা বড় রকমের অসুখে প'ড়বো আমি।' ব'লে কোথায় একদিকে বেরিয়ে প'ড়বার জন্য পা বাড়ালো বিজন।

মহেন্দ্রও সাথে সাথে উঠে প'ড়লো, ব'ল্‌লো, 'শরীর খারাপ বোধ ক'রছো তো ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন? এটা বাড়ি নয়, কলকাতা সহর; অসুখ হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে থাকলে মায়ের মতো শিয়রে ব'সে কেউ স্নেহের হাত বুলিয়ে দেবে না।'

—'আপনি তো র'য়েছেন, ও হাত দু'খানিতেই কি কম স্নেহ?' মুহূর্ত্তের

জন্য একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালো বিজন মহেন্দ্রের মুখের পানে, তারপর দ্রুত পায়ে কোথায় একদিকে চ'লে গেল।

মহেন্দ্রও আর অপেক্ষা ক'রলো না। যাবে সে মৌলালীর দিকে কি কাজে, কিন্তু ভুল ক'রে চেপে ব'স্‌লো ধর্ম্মতলার ট্রামে। বিজনের কথাটা তার মনের মধ্যে ঘুরছিল। অনাসক্ত স্নেহহীন জীবনে বিজন আজ তার মধ্যে এমন কি প্রাণরস খুঁজে পেল? কিন্তু বেশীক্ষণ এ চিন্তায় ডুবে থাকতে পারলো না সে। ধর্ম্মতলায় এসে এস্‌প্লানেডের দিকে ট্রামটা বাঁক নিতেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে খানিকটা চঞ্চল হ'য়ে উঠল মহেন্দ্র। এখান থেকে গ্যালিফ ষ্ট্রীটের গাড়ী ধ'রে তবে তাকে গিয়ে নামতে হবে মৌলালীতে।…

সতের

মাঘী পূর্ণিমার সুন্দর প্রশান্ত বেলা। শীতের মিঠে রোদে স্নান ক'রে উঠেছে কলকাতা। ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উৎসবের নহবৎ বাজছে। সোমবার দিনটা ভুল হবার কারণ নেই। দুপুরের রোদ ধীরে ধীরে স্তিমিত হ'য়ে আস্‌চে। যথাসময়েই বিজন গিয়ে উপস্থিত হ'লো সমাজ-মন্দিরে। ফুলে আর পাতাবাহারে সুসজ্জিত মন্দির-গৃহ। সামনে দাঁড়িয়ে দিলীপ দত্ত সমস্ত কিছু ব্যবস্থা ক'রছে। অফুরন্ত উদ্যম আর কর্ম্মশক্তি, প্রতিভার দীপ্তি ঝ'রে প'ড়ছে দু'চোখে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে বসাচ্ছে গিয়ে সে কক্ষাভ্যন্তরে।

একটু বাদেই কার্য্যসূচী অনুযায়ী আরম্ভ হ'য়ে গেল অনুষ্ঠান। আচার্য্যের স্বস্তিবাচনের পর উদ্বোধন সঙ্গীত। ঘোষকের কণ্ঠে উচ্চারিত হ'লো কুমারী রেবা মল্লিকের নাম। মঞ্চের একপাশে একটি অর্গান শোভা পাচ্ছিল। একটু বাদেই রেবা এসে ব'স্‌লো সেই অর্গানে। বেজে উঠ্‌লো অর্গান: একটা সুন্দর নরম সুর। টন্‌সিল তবে আজ আর যন্ত্রণা দিচ্ছে না রেবাকে! ভগবানকে ধন্যবাদ। অধীর আগ্রহে খানিকটা গলা উচিয়ে ব'স্‌লো বিজন। তন্ময় হ'য়ে গেল সে রেবার গানের মধ্যে:

কি আছে আমার, দেবো যে তোমারে প্রভু!
শূন্য হৃদয়ে ব্যর্থ গানের সুর তুলে ধরি তবু।...

নীরবতায় থম্‌থম্ ক'রছে মন্দিরকক্ষ, তার মধ্যে নিবেদনের নরম সুরে কণ্ঠ ভ'রে উঠছে রেবার। এতদিন তিলে তিলে প্রতি মুহূর্ত্তে যে গানের প্রতীক্ষায় ঘুরে ম'রেছে বিজন, আজ এতদিনে সেই অধীর প্রতীক্ষা তার সার্থক হ'লো। কি অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা, কি অপূর্ব্ব সুর-বিস্তার, কি অনুপম আবেগময় কণ্ঠ। পারবে না কি এই সুর দিয়ে তার জীবনকে ধুয়ে নিতে বিজন, খেলাঘরের পুরোনো জীবনকে আবার কি পারবে না সে নতুন ক'রে গ্রন্থীবদ্ধ ক'রতে? গানের সুর বেয়ে মনটা অলক্ষ্যে কখন্ আকাশচারী হ'য়ে গেল বিজনের, তা সে নিজেও জান্‌তে পারলো না।

উৎসব ভেঙে গেলে সাম্‌নের গেটে এসে মিঃ মল্লিকের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা

ক'রতে গিয়ে বিজন দেখলো—গাড়ীতে তিল ধারণেরও যায়গা নেই। মিসেস্ মল্লিক জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'তুমি আস্ছো তো বিজু?'

বিজন ব'ল্লো, 'আপনারা যান মাসীমা, আমি পিছনে ট্রামে বা বাসে আস্চি।'

ট্রাম বাস ভিন্ন গতি নেই। মিঃ মল্লিকের গাড়ীতে তাঁর সংসারের তিনটী প্রাণী ছাড়াও দিলীপ দত্তের জন্য একটা বিশেষ স্থান র'য়েছে, তাছাড়া ফুলের তোড়া আর বিশেষ সৌখীন সজ্জাদ্রব্যে ড্রাইভারের পাশের সামান্য ফাঁকা জায়গাটা পর্য্যন্ত ভ'রে উঠেছে। এখানে জোর ক'রে গাড়ীতে গিয়ে চেপে ব'সতে নিজের মনেই কেমন যেন বড় একটা সাড়া পেলোনা বিজন।

গাড়ী ছেড়ে দিল।···উৎসবকক্ষ ধীরে ধীরে খালি হ'য়ে গেল। কল্‌কাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের বিশেষ একটা ছায়াপাত ঘ'টে গেল চোখের উপর দিয়ে। পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষনীয় বিষয়গুলির মতো দু'চোখ মেলে একে একে লক্ষ্য ক'রতে লাগ্‌লো বিজন। এরাই কল্‌কাতা সহর, এদের নিয়েই কল্‌কাতা ঐশ্বর্য্যময়ী হ'য়ে উঠেছে। পারবে না কি এদের মধ্যে একদিন আকর্ষনীয় ব্যক্তি হ'য়ে মাথা উচু ক'রে দাঁড়াতে সে? যে কারণে গ্রামের স্কুলের মাষ্টারীকে সে ঘৃণা ক'রেছিল, যে মন নিয়ে একদিন ছুটে এসেছিল সে শিক্ষালাভের আশায় এখানে, সে শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় কি মানুষ হ'য়ে মানুষের মধ্যে মাথা উচু ক'রে দাঁড়ানো? সত্যিই একদিন যদি সে দ্বিতীয় মাইকেল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, মানুষের সুখ-দুঃখ আশা আনন্দের সার্থক শিল্পীরূপে অর্ঘ্য পাবে না কি একদিন সে দেশের এই মানুষদেরই কাছে? তার সঙ্গীতে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে রেবার কণ্ঠ, এম্‌নি ক'রে উৎসবের নহবৎ বাচ্‌বে সেদিন তাদের কেন্দ্র ক'রে।

বল্গাহীন ঘোড়ার মতো মনটা আবার যে কখন উধাও হ'য়ে গেল, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পারলো না। যখন সম্বিৎ ফিরে পেলো—দেখলো, সাম্‌নের পথটা এরই মধ্যে অনেকখানি নির্জ্জন হ'য়ে উঠেছে। নিজের কাছেই কেমন যেন খানিকটা লজ্জাবোধ হ'লো এবারে বিজনের। অনেকখানি সময় পেরিয়ে গেছে এরই মধ্যে। নিমন্ত্রণ রক্ষার ব্যাপারে অন্ততঃ একটা সময় বাধা থাকা বাঞ্ছনীয়। কি ভাবচে এতক্ষণ তাকে নিয়ে সবাই? আর অপেক্ষা না ক'রে সাম্‌নেই একটা বাস পেয়ে উঠে ব'স্‌লো বিজন। ট্রামের চাইতে অন্ততঃ কিছুটাও আগে গিয়ে পৌছানো যাবে।···

রাসবিহারী এভেন্যুর ফুটপাতে এসে পা দিতেই একটা বড় দোকানের ঘড়িতে দেখা গেল—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন'টা।

মিঃ মল্লিক ইতিমধ্যেই খেয়ে শুয়ে প'ড়েছেন। শীতের রাত্রে এ বাড়িতে খাওয়া দাওয়া চুকে যেতে আটটার বেশী দেরী হয় না। দিলীপ দত্তও আজ এখান থেকে খেয়ে বাড়ি ফিরছে, সেই সাথে ভদ্রতার খাতিরে রেবাকেও খেয়ে নিতে হ'য়েছে। মিসেস্ মল্লিক নিশিকান্তের সঙ্গে ব'সে কি সমস্ত গুছাচ্ছিলেন, বিজন এসে কাছে দাঁড়াতেই ব'ল্লেন, 'বেশ ছেলে তুমি যা-হোক্, মন্দির থেকে কি তুমি হেঁটে এলে যে এত দেরী হ'লো! অপেক্ষা ক'রে ক'রে শেষ পর্য্যন্ত তোমার মেসোমশাই খেয়ে শুয়ে প'ড়েছেন। এতক্ষণে ঠাণ্ডা হিম হ'য়ে গেছে সব কিছু।'

লজ্জা এড়াতে গিয়ে এবারে কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হ'লো বিজনকে। ব'ল্লো, 'কে জান্তো মাসীমা, আস্তে গিয়ে এমন এ্যাক্সিডেণ্টে প'ড়তে হবে!'

—'এ্যাক্সিডেণ্ট, বলো কি?' সুর পাল্টে গেল এবারে মিসেস্ মল্লিকের কণ্ঠে।

—'তাই তো বলি মাসীমা।' বিজন ব'ল্লো, 'জগু বাবুর বাজারের সাম্নে এসে আমাদের বাসের সঙ্গে ডালহৌসির একটা ট্রামের সে কি জোর ধাক্কা! বাসটা সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি তুম্‌ড়ে গেল। পুলিশ এলো, লোক দাঁড়িয়ে গেল রাস্তা জুড়ে। আপনার হাতের সুপাচ্য আজ হয়ত আমার অদৃষ্টেই জুটতো না। শরীরের কাঁপুনি এখনও যায়নি মাসীমা।'

ব্যস্ত হ'য়ে এবারে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস্ মল্লিক, ব'ল্লেন, 'বসো, বসো, ব'সে একটু শান্ত হ'য়ে নাও দিকি এবারে!'

নিশিকান্ত ব'ল্লো, 'কল্‌কাতায় জীবন নিয়ে চলা এক মস্ত বিপদ দাদাবাবু।'

উত্তরে বিজন কি একটা ব'ল্তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'নে, কথা না ব'লে তুই ততক্ষণে খাবার ব্যবস্থা কর্ দিকি নিশি। পাশের ঘরের টেব্‌লে আমাকে আর বিজুকে দিয়ে তুই নিজেও রান্না ঘরে ব'সে পড়্ গিয়ে। উপর থেকে তোর দিদিমণিকে ডেকে দিয়ে যা, তা হ'লেই হবে!'

বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন, রেবা খাবে না?'

—'তার কি এতক্ষণ বাকী আছে, রেবা তার বাবার সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছে।

দিলীপের সঙ্গে ব'সেছিল ওরা।' থেমে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্লেন, 'দলীপ আর উনি না হ'লে উৎসব এত সুন্দর হ'তো না। কেমন লাগ্‌লো, ব'ল্লে না তো বিজু?'

—'আমার কথাটা আপনিই তো ব'লে দিলেন, মাসীমা। তা ছাড়া রেবার গান বিস্মিত ক'রে দিয়েছে শ্রোতাদের।'

এবারে কিছু একটাও আর জবাব দিলেন না মিসেস্ মল্লিক। নীরবে শুধু একবার তৃপ্তির হাসি হাসলেন তিনি।

খাবার টেবলে রেবা এসে নিজের হাতে পরিবেশন ক'রলো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়ে দিয়ে অপ্রস্তুত ক'রে তুল্‌লো সে বিজনকে।

বিজন ব'ল্‌লো 'তোমার পুতুল বিয়ের নেমন্তন্ন খাইয়ে একদিন জব্দ ক'রেছিলে, মনে আছে রেবা? আজও কি ইচ্ছেটা তেম্‌নি নাকি?'

পাশ থেকে মিসেস মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'আহা, কী বা দিয়েছে, ওটুকু খাও; মাংসের দোপেয়াজী খেতে খারাপ লাগবে না।'

—'ভালো লাগলেই কি পাকস্থলীটা বেড়ে যাবে মাসীমা?' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায় রেবা।'

—'ন্যায় অন্যায় মা বুঝবে, আমি উপরে চ'ল্‌লাম। খেয়ে উঠে একটু বরং বিশ্রাম ক'রেই যেয়ো।' ব'লে সিঁড়ি বেয়ে আবার নিজের ঘরে গিয়ে ব'স্‌লো রেবা।

খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়েই এসেছিল। আঁচিয়ে উঠে মিসেস্ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'এবারে আমি একটু কাৎ না হ'য়ে আর পারছি না বাবা। তুমি উপরে গিয়ে দু'দণ্ড ব'সেই বরং যাও, নইলে অনুযোগ তুলবে রেবা।'

—'না, হ'য়েই যাচ্ছি।' ব'লে সিঁড়ি ভেঙে বিজন উপরে উঠে গেল।

রেবা ব'ল্‌লো, 'কিছুই খেলে না বিজুদা, শুধু বাক্য ব্যয় ক'রেই উঠে এলে।'

—'বাক্য ব্যয়টা বেশী খাবারের ব্যাপারেই প্রয়োজন।' বিজন ব'ললো, 'তা যাক্। জীবনে আজ আমার একটা শুভদিন, যাবার আগে এই কথাটাই আজ জানিয়ে যাই তোমাকে।'

—'মানে?'

—'মানে তোমার গান। জীবনে আজ এই প্রথম শুন্‌বার অবকাশ পেলাম।'

—'কেমন লাগলো বলো ?' খানিকটা কৌতূহলের দৃষ্টি তুলে ধ'রলো রেবা।

বিজন ব'ললো, 'কল্পনারও অতীত। সঙ্গীত যে কত সুন্দর হ'তে পারে, তার একমাত্র উদাহরণ তুমি।'

চোখমুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী ক'রে রেবা ব'ললো, 'এম্‌নি ক'রে বাড়িয়ে বোলো না, গর্ব্ব বেড়ে যাবে।' ব'লে হেসে ফেললো রেবা।

বেশ লাগলো হাসিটা। নরম ঠোঁট দু'টির আড়ালে চাঁদের আলোর মতো দু' পংক্তি স্বচ্ছ দাঁতের তন্ময় প্রকাশ। দৃষ্টি ফিরতে চাইল না সেদিক থেকে।

থেমে রেবা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি দেখছো বিজুদা ?'

এতটুকুও সঙ্কোচ ক'রলো না বিজন, বললো,—'তোমাকে।'

টোল খাওয়া গাল দু'খানি ঈষৎ যেন লজ্জারক্ত হ'য়ে উঠলো এবারে রেবার।

বিজন ব'ললো, 'আবার কবে তোমার গান শুন্‌বার অবকাশ পাবো, তাই ভাবছি রেবা।'

—'আস্ত পাগল তুমি বিজুদা, ছোটবেলা থেকে একটুও তুমি বদ্‌লাও নি, যাই বলো।' থেমে রেবা ব'ললো, 'ভারি তো গান শিখেছি, তাই শুন্‌তেই তুমি অবকাশের কথা তুলছো।'

—'অবকাশের প্রয়োজন আছে বৈ কি, এতদিনে আজ যেমন অবকাশ পেলাম, এম্‌নি আর কোনোদিন !'

উত্তর ক'রলো না রেবা।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'ছোটবেলার কথা ব'ল্‌লে না, তোমাদের কাছে এসে ব'স্‌লে সত্যিই আবার সেই ছোটবেলাকে ফিরে পাই। ইচ্ছে হয়, আবার তেম্‌নি খেলার সাথী হ'য়ে থাকি। কিন্তু মহাকাল কোথাও অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকে না। আচ্ছা রেবা ?'

—'কি বলো ?'

—'পারি নাকি আবার আমরা তেমনি ক'রে ফুটে উঠ্‌তে ?'

রেবা ব'ল্‌লো, 'অতীতকে মন দিয়ে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু বয়স দিয়েও কি তেম্‌নি !'

—'বয়সের উপযোগি ক'রেও তো পেতে পারি !' ভাববিহ্বল কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'পারি নাকি তুমি আমি এক হ'য়ে নতুন ক'রে জীবনের একতারা

বাজাতে ? তোমার গান আর আমার কাব্যে সুরলক্ষ্মী অচঞ্চলা হ'য়ে বাধা প'ড়বে আমাদের জীবনে।'

লজ্জারক্ত গাল দু'খানি এবারে আবিররাগে রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো রেবার। উত্তর দেবার ভাষা পেলো না। শুধু একবার বিজনের মুখের উপর দিয়ে নরম দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নীচু ক'রে নিল সে।

মনের রুদ্ধ বাসনাকে আজ আর কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না বিজন। জীবনে এমন সুযোগ আর হয়ত দ্বিতীয় দিন পাবে না সে। ব'ল্‌লো, 'বলো, এ কি অসম্ভব আমাদের জীবনে! একদিন যেমন ক'রে খেলাঘরে পুতুল সাজিয়েছিলে, তেমনি ক'রে নতুন খেলাঘর কি রচনা করা যায় না, যায় না কি সুন্দর একখানি নীড় রচনা করা—যেখানে তুমি আমি ভিন্ন আর কিছু নেই!' হাত বাড়িয়ে নিজের অলক্ষ্যেই রেবার একখানি হাত স্পর্শ ক'রতে গেল বিজন, কিন্তু পারলো না।

নীরবে হাতখানি সরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে ব'স্‌লো রেবা। সমস্ত দেহখানি তার কি আবেশে যেন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। কৈশোর আর বাল্যের দিনগুলিকে কেন্দ্র ক'রে একদিন ভালো লেগেছিল বিজুদাকে, হয়ত অলক্ষ্যে কখনো মনে মনে ভালোবেসেও ছিল একদিন, কিন্তু তাকে চিরকালের ক'রে ধ'রে রাখতে পারে নি সে। মাগুরার নিভৃত পল্লীময় জীবনে যা একদিন স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'য়েছিল, কল্‌কাতার ঐতিহ্যময় আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সে স্বাভাবিকতাকে অনেকখানি অবাস্তব আর অলীক ব'লেই মনে হ'য়েছে। এখানে এসে যে স্বাভাবিকতাকে সে খুঁজে পেলো, তা একেবারেই স্বতন্ত্র পরিবেশ। সেই পরিবেশে দিলীপ দত্তকে ভিন্ন যেন আর কাউকেই ভাবা যায় না। জীবনের অবাধ গতির পথ খুঁজে পেয়েছে তার মধ্যে রেবা। কিন্তু তাই ব'লে অতীতকেই কি একেবারে মুছে ফেল্‌তে পারছে সে মন থেকে ? স্নেহশীল বিজুদা, কবি বিজুদা, বন্ধু বিজুদা—তাকে কি জোর ক'রে অস্বীকার করা চলে ?

চিন্তাসূত্রে কেমন যেন বিপ্লবের গ্রন্থি পাকিয়ে গেল রেবার। আর একবার নরম দৃষ্টিতে মুখখানিকে তুলে ধ'রলো সে বিজনের মুখের দিকে; ব'ল্‌লো, 'বাবা অনেকখানি প্রগতিশীল হ'য়েও যে কতখানি সংস্কারবাদী, সে তো তুমি জানো বিজুদা। নিজেদের সমাজের বাইরে তিনি আর কিছুই বুঝতে চান না। তোমরা ব্রাহ্মণ, আমরা ব্রাহ্ম। বাবা কিম্বা মাসীমাই কি রাজি হবেন ?'

—'তাঁদেরই শুধু রাজি অরাজির প্রশ্ন, আমরা কিছু নই ?'

—'কিছু নই কেন, তবু—'

—'কি তবু ?'

রেবা ব'ল্‌লো, 'বাবা তাঁর নিজের সমাজের বাইরে কাজ ক'রতে রাজি হবেন না।'

কথা কাটলো বিজন, 'সমাজ যে মানুষের হাতে গড়া একটা ঠুনকো জিনিষ, একথাও কি তিনি জানেন না ? সমাজের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই সমাজ ; মানুষ তার প্রয়োজনে তাকে গ'ড়েছে, আবার প্রয়োজনেই ভাঙচে। প্রতিটি স্বাধীন দেশের দিকে তাকালে আমরা তাই দেখতে পাই। সমাজের সঙ্গে মানবিক ধর্ম্মকে জড়িয়ে নানা ফাঁদের সৃষ্টি ক'রে মরছে শুধু আমাদের দেশের মানুষগুলো। এ সমাজের কথা তুমি ভুলে যাও রেবা।'

—'এ দেশের মানুষ হ'য়ে যখন এদেশেই বাঁচতে হবে, তখন এ সমাজকে অস্বীকার ক'রেই বা চ'লবো কেমন ক'রে বিজুদা ?' থেমে রেবা ব'ললো, 'বাবা সহজ সরল মানুষ, কিন্তু এক যায়গায় তিনি কঠিন। সেই কাঠিন্যের ক্ষেত্রে তোমার সমস্ত যুক্তিই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'তোমাকে ভালোবাসাও কি তবে আমার ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, ব'ল্‌তে চাও ?'

এবারে উত্তর করা কঠিন হ'লো রেবার পক্ষে।

পুনরায় বিজন ব'ল্‌লো, 'বলো, এই ব্যর্থতা নিয়েই তবে আমাকে ফিরতে হ'বে !'

কিছুক্ষণ কেটে গেলে রেবা ব'ল্‌লো, 'তোমাকে যদি ধর্ম্মত্যাগ ক'রতে হয়, পারবে ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'ধর্ম্ম কোথাও ত্যাজ্য হয় না, জীবনের চলার পথে মানুষের সর্ব্ব অবস্থাতেই তার ধর্ম্ম বেঁচে থাকে। ধর্ম্মত্যাগ ব'লে যে কথাটা—সেটা মানুষের ভুল বিশ্বাসের উপরেই টিকে আছে। তবু তোমার কথা পেলে আমি তাও ক'রতে রাজি আছি রেবা। বলো, কথা দাও !'

ব'লে আর একবার হাতখানিকে প্রসারিত ক'রে দিল সে রেবার দিকে। এবারেও ব্যর্থভাবেই সেই হাতখানি ফিরে এলো।

এত বড় একটা সত্যাশ্রুতির মধ্যেও নিজেকে ধরা দিতে মনের দিক থেকে কেমন যেন সাড়া পেলো না রেবা। ব'ল্‌লো, 'ব্রাহ্ম ভিন্ন ব্রহ্মবাদী বাবা

মত দিতে রাজি হবেন না। এর বাইরে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না বিজুদা, আমি ব'লতে পারবো না।' কথা শেষ ক'রতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কেমন যেন একবার কেঁপে উঠলো রেবার।

স্বাভাবিক কণ্ঠেই বিজন ব'ল্লো, 'আমার কথা পেয়েছি, আর কিছু ব'ল্‌বার নেই আমার। আমি যাচ্ছি। শুধু ছোট্ট ক'রে আর একটা কথা ব'লে যাই; জীবনে বড় হবো, উচ্চ শিক্ষার পথে মানুষ হ'য়ে দাঁড়াবো, এই আদর্শ নিয়েই কল্‌কাতায় এসেছিলাম। কিন্তু তার পিছনে আরও একটা সত্য ছিল, সে তুমি, কল্‌কাতায় এলে আবার তোমাকে তেম্‌নি ছোটবেলার মতো ফিরে পাবো—এ সত্যও সেই আদর্শের সঙ্গে মিশে ছিল। আজ তুমি আমার জীবনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই আদর্শকে লক্ষ্মীশ্রীতে পূর্ণ ক'রে তোলো রেবা।'

উত্তরে কি একটা ব'ল্‌তে গিয়ে যেন কথা হারিয়ে ফেল্‌লো রেবা। অধীর আবেগে নরম ঠোঁট ছু'টি শুধু বার কয়েক কেঁপে গেল মাত্র।

ইতিমধ্যে নিচে থেকে নিশিকান্তের গলার শব্দ শোনা গেল। মিসেস্‌ মল্লিক শোবার পরে-পরেই তখন ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেন। গেটের দরজা বন্ধ ক'রবার অপেক্ষায় এতক্ষণ নীরবে ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁক্‌চে নিশিকান্ত। শীতের রাত। শয্যার আকর্ষণটা তার পক্ষেও কম কি!

বিজন আর এক মুহূর্ত্তও দেরী ক'রলো না। যানবাহনের শেষ গাড়ীর সময় সম্ভবতঃ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। রাসবিহারী এভেন্যু টু ওয়েলিংটন—দীর্ঘতর পথের দূরত্ব। শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই হয়ত এই কন্‌কনে হিমেল রাত্রে সেই দূরত্ব জয়ের কৃচ্ছ্রসাধনে পথের নির্জ্জনতায় গা ভাসিয়ে দিতে হবে!— সিঁড়ি গলিয়ে দ্রুত নেমে এসে নিঃশব্দে গেট পেরিয়ে পথে নেমে প'ড়লো বিজন।

মনের মধ্যে অকস্মাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা দ্রুত ঘুরে গেল রেবার। নিজের মধ্যে কেমন যেন অস্থির হ'য়ে উঠেছে সে। কোনো একটা চিন্তার মধ্যেও মন বেশীক্ষণ স্থির থাক্‌চে না। একবার চেষ্টা ক'রলো গীত-বিতানের পৃষ্ঠা খুলে ব'সতে, কিন্তু ভালো লাগলো না; একবার চোখ ছু'টোকে দৃঢ়বদ্ধ ক'রলো দেওয়ালের দিকে: 'পুষ্পময়ী হোক্‌ আজ তোমার জন্মদিন, হও প্রেমময়ী।...' এক একটা অক্ষর যেন এসে ঠিকরে প'ড়ছে চোখের মণি ছু'টোর মধ্যে:

'তোমার কল্যাণী মূর্ত্তি ঢেলে দিক সর্ব্বলোকে
পারিজাত সুধা,
শুভক্ষণে আমি আজ সাজালাম পুষ্পরাগে
তোমার বসুধা।'

সমস্ত বুকের ভিতরটা কেমন যেন একবার আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো রেবার। একেবারে নতুন অনুভূতি, নতুন ক'রে কোনো কিছুতে অবলুপ্তি। কতক্ষণ যে এম্‌নি ক'রে কাট্‌লো, ব'ল্‌তে পারি না। তারপর একসময় সুইসটাকে অফ্‌ ক'রে দিয়ে খোলা জানালার পাশে এসে ব'সলো সে। অফুরন্ত জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি স্নান ক'রে উঠেছে। তার মধ্য থেকে দু' চোখে স্পষ্ট ভেসে উঠচে একটা ত্রিতল বাড়ির কার্ণিস। দিলীপ দত্তদের বাড়ি ওটা। সেও কি জেগে আছে এতক্ষণ ?

আঠার

মেসে ফিরতে বিজনের সেদিন অস্বাভাবিক রাত্রি হ'য়ে গেল। পথের দুর্ভোগ তাকে আপন ইচ্ছাতেই গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল। নির্জ্জন রাত্রির কল্‌কাতার রূপ যে কত রহস্যপূর্ণ, তা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখবার অবকাশ হয়নি বিজনের; দু'চোখের গভীর দৃষ্টি দিয়ে আবার নতুন ক'রে দেখ্‌ছিল সে কল্‌কাতাকে, দেখ্‌ছিল আর ভাবছিল নিজের আগামী মুহূর্ত্তগুলোর ইতিহাস।

মেসের সঙ্কীর্ণ ঘরে ব'সে অরুণ আর মহেন্দ্র কিন্তু ততক্ষণে নানা জল্পনায় মুখর হ'য়ে উঠেছে।

—'দেবে নাকি থানায় একটা ফোন ক'রে? কোথাও কিছু একটা এ্যাক্সিডেণ্ট ঘ'টে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। হাজার হোক্ কল্‌কাতায় নতুন অভিজ্ঞতা বিজনের।'—বিশেষ একটা আন্তরিকতার সুর ফেটে প'ড়লো মহেন্দ্রের কণ্ঠ থেকে।

অরুণ ব'ল্‌লো, 'এ্যাক্সিডেণ্ট হ'লে আর থানা কেন, সোজা হাসপাতাল। কিন্তু হারা-উদ্দেশ্যে ক'টা হাসপাতালেই বা ফোন্ করা চলে! আপনিও যেমন মানুষ, কাল ভোরে উঠেই দেখবেন আপনার কবি-সাক্ষাৎ ঘটেছে। আসলে এতবেশী ভাবরাজ্যের মানুষ নয় বিজন যে এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটিয়ে বস্‌বে। তার চাইতে আসুন নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ি।' ওয়াড় দেওয়া দামী র‍্যাগটাকে এবারে সারা শরীরের উপর দিয়ে টেনে নিল অরুণ।

গরমের দিনে স্বভাবতঃই এ সময়টা মেসের বোর্ডারদের অনেকেই তাস-পাশা নিয়ে হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলে, শীতের প্রাবল্যে তাদের সেই সৌখীন খেলাটা ইদানীং একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেছে। রাত এগারোটার পর মেসের কোনো ঘরে এখন আর আলো দেখতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশই চাক্‌রীজীবী, খেয়ে উঠতে উঠতেই ক্লান্তিতে দু'চোখের পাতা বুজে আসে, বালিশে মাথা দিয়ে স্বপ্ন দেখে তারা আগামী প্রভাত-সূর্য্যের। আপনি থেকেই ঘরে ঘরে বাতি নিভে যায়।—মহেন্দ্রও আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সুইসটাকে অফ ক'রে দিয়ে এবারে শুয়ে প'ড়লো। শুয়ে প'ড়লো, কিন্তু ঘুম এলো না।

কবি-সাক্ষাৎ তার যথার্থই ঘ'টে গেল। কিন্তু তাই ব'লে বিছানা ছেড়ে উঠলো না মহেন্দ্র। ঘুমের ভান ক'রে একই ভাবে সে প'ড়ে রইল। দামী র‍্যাগের আরাম থেকে উঠে এসে আলো জ্বেলে দরজা খুলে দিক্ অরুণ, উদ্দেশ্যটা হ'চ্ছে এই। আসলে অরুণের আরাম-প্রিয়তার উপরে কিছুটা আঘাত হান্‌তে চাইল মহেন্দ্র।

সে আঘাত যথাস্থানে গিয়েই লাগলো। বিরক্ত হ'য়ে অরুণ আধো ঘুমে উঠে দরজা খুলে দিয়ে আবার এসে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়লো। এত রাত্রি ক'রে ফেরার কারণ সম্পর্কে একটা কথাও সে বিজনকে জিজ্ঞেস ক'রলো না।

ভোরে উঠে কি একটা জরুরী কাজে হঠাৎ বেরিয়ে প'ড়তে হ'য়েছিল অরুণকে।

চা খেতে খেতে একসময় মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'বেশ তো রাত-বিরেতে ফিরতে স্নুরু ক'রেছ ইদানিং, রসের জগতে কবিতার নতুন উৎস পেলে নাকি কিছু?'

লজ্জানম্রকণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'কি যে বলেন মহিন্‌দা, তার ঠিক নেই। চিরকাল আপনার ঐ একধরণের কথা। আপনি কি সত্যিই কখনও সিরিয়াস্ হ'তে পারেন না মহিন্‌দা?'

—'ওরে ব্বাবা, জীবনে ও জিনিষটাকে সব চাইতে বেশী ভয় করি। সিরিয়াস্‌নেশ আমার কোষ্ঠিতে লেখেনি। সংসারে যারা সিরিয়াস্, তাদের আমি কেউটের মতই ভয় করি।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'কি হ'য়েছে ব্রাদার, সত্যি ক'রে বলো দিকি? মুখের হাসি তোমার দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্রমেই যেন অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে প'ড়ছো তুমি!'

—'কবি-প্রকৃতির মানুষেরা খানিকটা আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে থাকে, একথা কি আপনার জীবনেই অস্বীকার করা সম্ভব?' মুখে ম্লান একটুক্‌রো হাসি টেনে বিজন ব'ল্‌লো, 'তাছাড়া বাকীটুকু আপনার স্নেহ-চোখের দৃষ্টি। বাড়িতে থাকতে মাও এম্‌নি ক'রেই ব'ল্‌তেন।'

—'মিথ্যে ব'ল্‌তেন না। স্নেহ বস্তুটা সর্ব্ব ক্ষেত্রেই অন্ধ নয়, তার পিছনেও একটা সূক্ষ্ম বিচারের চোখ আছে; সে চোখের দৃষ্টিতে সংসারের সব কিছুই ধরা পড়ে।' স্বল্পক্ষণ থেমে পুনরায় মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'তুমি এমন কিছু নিয়ে নিজের কাছে কষ্ট পাচ্ছ, যা লুকিয়ে যাচ্ছ আমার কাছে। অভিব্যক্তি ভিন্ন ভাবের মুক্তি নেই জানো তো?'

—'জানি।'

ব'ল্‌তে গিয়ে হঠাৎ যেন কিছুটা অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়লো বিজন। ইদানিং প্রায়ই এমনটা হয়। ভাব-নিমগ্ন হ'য়ে তখন আত্মদর্শন খোঁজে সে। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মহেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রেই মনের ভিতরটা একবার উদ্বেল হ'য়ে উঠলো বিজনের। মহিন্‌দা এমন একটি ব্যক্তি—যার কাছে মনের সমস্ত অর্গল খুলে দেওয়া যায়। কোনো লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই সেখানে। মহিনদা তার কাছে নিজেকে একেবারে উজার ক'রে দিয়েছে; যে এমন ক'রে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে জানে, সংসারে সে ব্যক্তিটি মহান ভিন্ন কি? মহান থেকেই তার মহিনদা নামটা সার্থক, ইন্দ্রত্ব সেখানে যতটুকুই থাকক, তাকে ছাপিয়েও শৈবমহিমা সেখানে বড। ভাবকে বস্তুতে রূপায়িত ক'রতে না পারলে শান্তি নেই, অভিব্যক্তি সেই রূপায়নের আধার। মিথ্যে কথা বলেনি মহিন্‌দা। অভিব্যক্তিই তার আজ সবচাইতে বেশী প্রয়োজন। নিজেকে নিয়ে নিজের চিন্তাজালে একেবারে অক্টোপাসের মতই আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছে বিজন। এতদিন তিলে তিলে যা চিন্তা ক'রে এসেছে সে, কাল রাত্রে কিছুটা তার পরিণতির পথে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু পরিণতি অর্থেই পূর্ণতা নয়। তাই নিয়েই যত সমস্যা, যত দুঃস্বপ্নের প্রধূমিত বহ্নি। খুলে ব'ল্‌তে গিয়েও লজ্জা আর সঙ্কোচে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠছে অন্তর্লোক। তাই শুধু 'জানি' ভিন্ন মহেন্দ্রের কথার উত্তরে আর কিছুই ব'ল্‌তে পারছিল না বিজন।

চায়ের কাপ নিঃশেষ ক'রে মহেন্দ্র জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তবে?'

এবারে কথা নিয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রতে হ'লো বিজনকে।—'আমি—
—মানে—মানে—হ'য়েছে কি জানেন মহিন্‌দা, মানে—'

সহসা একটা উদ্গাত হাসিতে সারা মুখখানি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো মহেন্দ্রের। ব'ল্‌লো, 'জানি, বুঝতে পেরেছি—রাসবিহারী এভেন্যুর ব্যাপার, অর্থাৎ ভালোবেসে জীবনে জয়ী হ'তে চাচ্ছ।'

কেমন অদ্ভুত একটা আগ্রহাতিশয্যে খানিকটা উচ্ছল হ'য়ে উঠলো এবারে বিজন, জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কি ক'রে বুঝ্‌লেন মহিনদা?'

—'এই জিনিষই যে বুঝে এলাম জীবন ভ'রে! বুঝে বুঝেই তো তার শেষ পরিণতি আমার সেয়ার মার্কেট।' থেমে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'রাসবিহারী এভেন্যু যেদিন থেকে তোমাকে আকর্ষণ ক'রেছে, সেদিনই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম—তার কোনো সুরম্যকক্ষে কোনো বিমুগ্ধ আত্মা অপেক্ষা ক'রছে তোমার প্রতীক্ষায়।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কতকটা তার উল্টো।'

—'অর্থাৎ ?'

বিজন এবারে নিজেকে বিন্দুমাত্র লুকালো না। ধীরে ধীরে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটাই সে মহেন্দ্রের কাছে প্রকাশ ক'রলো। প্রকাশ ক'রতে না পারলে হয়ত নিজের মধ্যে জ্ব'লে মরতো সে। মহিনদার মতো ব্যক্তির কাছে এতদিনে জীবনের একটা সত্যকে খুলে ব'ল্‌তে পেরে মনে মনে অনেকখানি শান্তি বোধ ক'রলো বিজন। তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'আমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রবো ব'লেই স্থির ক'রেছি মহিনদা। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মেরই একটা বিশেষ শাখা, এতে ধর্ম্মকে অমর্য্যাদা করা হবে না।'

কথা কাট্‌লো এবারে মহেন্দ্র, 'তুমিই বা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হ'তে যাবে কেন ? এদিকে যে বর্ণ-হিন্দু ক্রমেই লোপ পেতে ব'সেছে। ভালোবাসার ব্যাপারে একা ছেলেরই দায়িত্ব আছে, মেয়ের নেই—একথা বিশ্বাস ক'রতে রাজি নই। সেও তো হিন্দুধর্ম্ম মতে বিয়ে ব'স্‌তে পারে তোমার সাথে। ভারতীয় নারী-সমাজ চিরকাল স্বামীধর্ম্ম পালন ক'রেই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।'

—'সে ধর্ম্ম আর এ ধর্ম্ম এক নয় মহিনদা।' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'সামাজিক কুসংস্কারে দেশ আমাদের আচ্ছন্ন, কবে যে এ থেকে মুক্তি পাবে মানুষ, জানিনে। প্রচলিত সমাজ-জীবনে ধর্ম্ম ব'লে আমরা যার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকি, সেটা ধর্ম্ম নয়, মানুষকে মানুষের হৃদয়ের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে যাজকবৃত্তি অক্ষুন্ন রাখবার একটা কৌশল মাত্র। আমাদের মতো নিরক্ষর দেশ ব'লেই এ সম্ভব, কোনো শিক্ষিত সমাজতান্ত্রিক দেশ একে স্বীকার ক'রে নেবে না। নর-নারী সম্পর্কে পুরুষেরও কর্ত্তব্য আছে ; নারী যেখানে দুর্ব্বল, পুরুষ কি সেখানে শুধু দ্রষ্টা হ'য়েই কর্ত্তব্য শেষ ক'রবে মহিনদা ?'

তর্ক ক'রতে জানে মহেন্দ্র, কিন্তু এবারে যেন কেন সে তর্কের ভাষা খুঁজে পেলো না। পাঠ্যজীবন থেকে কবেই সে ছিঁটকে প'ড়েছিল। মা সরস্বতীর পায়ে সেই তার শেষ নমস্কার, তার পর থেকেই প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রাম। সমাজ-শাস্ত্র নিয়ে চিন্তা ক'রবার অবকাশ কোথায় সেখানে ? তথাপি প্রসঙ্গক্রমেই তাকে ব'ল্‌তে হ'লো : 'দু'জনের মত যেখানে ঐক্যবন্ধে যুক্ত, সেখানে শক্তির আধার দিয়েও তো স্ব-মতে আনা চলে নারীকে !'

—'ভেবে দেখেছি মহিনদা, তা হয় না। হৃদয় ব্যাপারে আমি অন্ততঃ

ঠকতে রাজি নই।' আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গীতে মুখখানিকে একবার উঁচিয়ে ধ'রলো বিজন।

—'কিন্তু তোমার বিধবা মা, তোমার পল্লীর সামাজিক পরিবেশ—তাঁরাও কি তোমার এই আদর্শকে খুসী-মনে স্বীকার ক'রে নিতে পারবেন?'

—'মা হয়ত পারবেন, মাকে আমি চিনি; কিন্তু পল্লীসমাজ সেই পল্লী-পরিবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক্, তাকে দূর থেকেই নমস্কার করি।'

মুখ টিপে হাস্‌লো একবার মহেন্দ্র, ব'ল্‌লো, 'কিন্তু কাছে গিয়ে?'

—'দূরের পাওনা আগে মিটিয়ে তবেই তো কাছের চিন্তা! ভবিষ্যৎ তার নিজের সমস্যা একদিন নিজের হাতেই সমাধান ক'রে দেবে মহিন্দা।'

এবারে চুপ ক'রে গেল মহেন্দ্র। ইচ্ছা যেখানে বলবতী, তাকে জোর ক'রে বাধা দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনাস্বরূপ। কিছুক্ষণ কেটে গেলে একসময় মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'তুমি জয়যুক্ত হও, এই প্রার্থনাই করি। ভালোবাসতে গিয়ে নিজে একদিন আমি ঠ'কেছি; তুমি জয়ী হ'লে কাছাকাছি জয়ের একটা আনন্দ উপভোগ ক'রবার অবকাশ পাবো।'

বিজন কি একটা উত্তর ক'রতে যাচ্ছিল, ইতিমধ্যে চাকর শ্রীবাস এসে একখানি খামে মোড়া চিঠি দিয়ে গেল তার হাতে। মাগুরার চিঠি, মার নিজের হাতে লেখা ঠিকানা।

মহেন্দ্র জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'বাড়ির চিঠি বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

খাম থেকে চিঠিখানি খুলে প'ড়তে সুরু ক'রলো বিজন:

নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু,

বাবা বিজু, কয়েক দিন ধরিয়া অনবরত তোমার কথাই কেবল মনে পড়িতেছে। আমি আবার যে শ্মশান, সেই শ্মশানের মধ্যেই পড়িয়াছি। অতসী যে হঠাৎ কোথায় গেল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সবাই বলাবলি করিতেছে—নিশ্চয়ই কোনো গুণ্ডা ডাকাতের হাতে ধরা পড়িয়াছে। কথাটা যে অবিশ্বাস করিব, তাই বা পারিতেছি কৈ? অতসী নিজের মুখেও আমাকে মাঝে মাঝে বলিত—সন্ধ্যার দিকে খিড়কি-দুয়ারে কিম্বা ঘাটের পথে কাহার যেন স্পষ্ট আভাস লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝেই সে চমকিয়া উঠিত। আমি বলিতাম—'দূর পাগলি, ও তোর চোখের

ভুল।' কিন্তু যেদিন হইতে সত্যি সত্যিই অতসীকে আর পাওয়া গেল না, সেদিন তাহার গুরুত্ব বুঝিলাম। মেয়েমানুষ হইয়া এ বয়সে আমি একা কি করিতে পারি? তসর আলীকে ডাকাইয়া আনিয়া নানা জায়গায় খোঁজ-খবর করিলাম, কিন্তু কাজ হইল না। সবাই বলিল, কোর্টে জানাইয়া পুলিশে খবর দিতে, তসর আলী গিয়া তাহাই করিল। কিন্তু অতসীকে আর উদ্ধার করা গেল না। কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে কোনো গুণ্ডাই হয়ত তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। মেয়েটার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া কেবল দুঃখ হয়। নড়াইলের ঐদিকে কোথায় বাড়ি ছিল, একদিন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আসিয়া পথে দাঁড়ায়। বলিতে বলিতে একদিন কাঁদিয়া দিল অতসী; কহিল, 'বিজু ভাইটি সত্যি সত্যিই হয়ত আমার পূর্ব্বজন্মের ভাই ছিল, এ জন্মে তাই এমন করিয়া ভাইয়ের স্নেহ পাইলাম।' সংসারের দিক হইতে বড় দুঃখিনী ছিল অতসী। ও আজ এইভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া আমাদেরও দুঃখের সাগরে ভাসাইয়া গেল।

তুমি পারো তো খুব শীঘ্র করিয়া একবার বাড়ি আসিও। কিছুদিন হইল ছন্দা এখানে আসিয়াছে। জীবনে একটি দিনের জন্যও ওকে শান্তি দিলেন না ভগবান। পত্রপাঠ তোমার সংবাদ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম। ইতি— আশীর্ব্বাদিকা—মা।

পড়া শেষ ক'রতে গিয়ে অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বিজনের বুক থেকে।

মহেন্দ্র এতক্ষণ একই ভাবে নীরবে ব'সে ছিল। এবারে পুনরায় জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'খবর কি বাড়ির?'

কিছু না ব'লে চিঠিখানি শুধু এগিয়ে দিল বিজন মহেন্দ্রের হাতের কাছে।

প'ড়ে মহেন্দ্র অবধি স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। বিজনের সংসারের দিক থেকে অতসীর কথা পর্য্যন্ত তার কাছে ঢাকা ছিল না। ব'ল্‌লো, 'অতসীর অপরাধ নেই, অপরাধ আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার। সামাজিক দুর্নীতি যতদিন না বন্ধ হ'চ্চে, ততদিন এ অবস্থা চ'ল্‌বেই। এ শুধু অতসী নয়, অতসীর মতো হাজার হাজার মেয়ে আজ দুর্ব্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত। এজন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই বিজন। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ভিন্ন এ সমস্যার কোনো প্রতিকার নেই।'

ক্রমেই সূর্য্যের আলো প্রখর হ'য়ে উঠছিল। কাজে বেরোবার তাগিদ র'য়েছে। আর অপেক্ষা না ক'রে তাই উঠে প'ড়তে এবারে উদ্যোগ ক'রলো মহেন্দ্র।

ব্যথাদীর্ণ কণ্ঠে বিজন ব'ললো, 'জানি প্রতিকার নেই, কিন্তু আমি ভাব্‌চি শুধু অতসীদির কথা। এরপর প্রাণে বেঁচে থেকে অতসীদি কি ক'রবে?'

—'সমাজ যদি ঠাঁই দেয়, তবে আবার কোথাও অবলম্বন পেয়ে তিলে তিলে জীবনের পাপক্ষয় ক'রবে। আর—' ব'লতে গিয়ে একবার থাম্‌লো মহেন্দ্র, তারপর কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি লঘু ক'রে ব'ললো, 'আর যদি ঠাঁই না পায়, তবে হয়ত নিকৃষ্ট জীবনের পথে জীবিকার জন্যে এসে দাঁড়াতে হবে কোনো নোংরা বস্তিতে। এই তো আমাদের সমাজের রূপ!'

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না মহেন্দ্র। কাঁধের উপর একটা ওভারকোট চাপিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে প'ড়লো।

স্থাণুর মতো কতক্ষণ যে একই ভাবে ব'সে রইল বিজন, তা সে নিজেও জান্‌লো না। অতসীর কথাই অনবরত তার মনে হ'তে লাগলো। তার প্রথম দিনের প্রথম কথা থেকে শেষ চিঠি পর্য্যন্ত কোথাও যেন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখে নি অতসীদি। আজও তার শেষ চিঠিটা বাক্সে তোলা র'য়েছে।— "অভাগিনী দিদিটাকে যে ইতিমধ্যেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছ, তাহা বুঝিয়াছি।'—সংসারের দিক থেকে জীবনে কিছু পায়নি ব'লেই দুঃখ আর অভিমান এসে স্নেহের রাজ্যে এমন ক'রে এক হ'য়ে গিয়েছিল।

সংসার, জীবন, স্নেহ, অভিমান। কথাগুলো মনে প'ড়তেই অতসীকে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়ালো ছন্দা। মা লিখেছেন—ছন্দা মাগুরায় এসেছে। শ্যামলকান্তি তবে হয়ত ইতিমধ্যেই সুস্থ হ'য়ে উঠেছে! নীরোগ, নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যকর সুখে জীবনের সর্ব্বদিক ভরে উঠুক ছন্দার—এ কামনা প্রতিদিনের মতো আজও সে করে। কিন্তু মা যেমন ক'রে লিখেছেন, তার পক্ষে এখন বাড়ি যাওয়া কেমন ক'রে সম্ভব? সামনে তার ভাগ্যাকাশে অফুরন্ত আশা জোনাকীর মতো ঝিক্‌মিক্ ক'রে জ্ব'ল্‌ছে। অফুরন্ত কাজ তার সাম্‌নে। এসব ফেলে একটা দিনও কি তার বাড়ি গিয়ে থাকা চলে?

মন স্থির ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটার জবাব লিখবার জন্য কাগজ কলম টেনে নিয়ে ব'স্‌লো বিজন।

সূর্য্য তখন আকাশের অনেক দূর অবধি ঠেলে উঠেছে।

উনিশ

দাশরথী দত্তের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার দিন থেকে যে জিনিষটি সবচাইতে বেশী আকর্ষণ ক'রছিল মিঃ মল্লিককে, তা হ'চ্ছে দত্ত পরিবারের ঐতিহ্য। আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ সংসার, শিক্ষিত পরিবেশে প্রত্যেক্যের মধ্যেই বিশেষ একটা জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শের ধারা উপনিষদের পৃষ্ঠা জুড়ে র'য়েছে এখানে। তার সাথে সমন্বিত হ'য়েছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি। সেই ঐতিহ্যে মানুষ হ'য়ে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে দিলীপ। দাশরথী দত্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। তার সাথে রেবাকে মিশ্‌বার অবাধ সুযোগ দিয়েছিলেন তিনি দত্ত পরিবারের এই ঐতিহ্যকে জয় ক'রে নেবার উদ্দেশ্যেই। দিনে দিনে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে রেবার, এ কথা জানতেন মিঃ মল্লিক; জান্‌তেন ব'লেই এমন সুন্দর সার্থক ক'রে তৈরী ক'রে তুলেছিলেন তিনি রেবাকে। দিলীপকে প্রথম দর্শনেই তাঁর ভালো লেগেছিল, ক্রমে এই ভালোলাগা কিছু স্বার্থের রূপ নিয়ে দেখা দিল। সুযোগ্য পাত্র দিলীপ, তাকে জামাই হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। মিসেস্ মল্লিকও অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত ক'রেছিলেন। দাশরথী দত্তের কাছে নিভৃতে তাই একদিন কথাটা উল্লেখ ক'রে ব'স্‌লেন মিঃ মল্লিক।

উত্তরে দাশরথী দত্ত ব'ল্‌লেন, 'বলেন কি, এ তো আমার সৌভাগ্য। ভেবেছিলাম—দু'দিন বাদে দিলীপের জন্যে আমিই মেয়ে দেখতে বেরোবো। তা—এ তো হাতে চাঁদ পাওয়া।'

সলজ্জকণ্ঠে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'না, না, চাঁদ কেন হবে, তবে মায়ের আমার গুণের সঙ্গে রূপও আছে, এ কথা অস্বীকার ক'রবার নয়। দিলীপের পাশে ও অন্ততঃ দাঁড়াতে পারবে, এ বিশ্বাস রাখি।'

সহাস্যে দাশরথী দত্ত ব'ল্‌লেন, 'তা হ'লে আজ থেকে আমরা বেয়াই হলেম, বলুন!'

—'তাই তো আশা রাখি।' ব'লে খানিকটা বিনয় প্রকাশ ক'রলেন মিঃ মল্লিক।

—'আশা কি ব'ল্‌ছেন, নিশ্চয়ই এবং নিশ্চিত।' ব'লে উচ্ছ্বাসের মুখে একবার থাম্‌লেন দাশরথী দত্ত। তারপর ব'ল্‌লেন, 'তবে একটা বিষয়ে আমার

কিছু বক্তব্য আছে। স্থির ক'রেছিলাম, দিলীপ হাইকোর্টে জয়েন ক'রবার আগে ওকে বিয়ে দেবো না। আপনি ইচ্ছে করেন তো রেজিস্ট্রেশন হ'য়ে থাক্‌তে পারে, আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের যা কিছু কাজ, তা দিলীপের বারে জয়েন ক'রবার পরেই হবে। মত আছে তো আপনার?'

—'বিলক্ষণ, এতে অমতের কি কারণ থাক্‌তে পারে!' থেমে মিঃ মল্লিক ব'ল্‌লেন, 'ততদিনে ওরা বরং দু'জনে দু'জনকে আরও ভালো ক'রে চিনুক! জীবনের সেতু রচনা ক'রতে গেলে তার বনিয়াদ আগে থেকে পাকা ক'রে তুলবার দরকার। ওরা নিজেদের যতটুকু চিন্‌তে পেরেছে,—সেই চেনাকে দু'জনে চিরন্তন ব'লে জান্‌তে শিখুক। দিলীপের বারে জয়েন ক'রতে ক'দিনই বা আর বাকী আছে!'

—'না, বাকী কোথায়? প্রায়ই তো ও কোর্টে বেরোচ্ছে, ব্যারিষ্টার উইলিয়াম হ্যারী এবং বিশ্বরঞ্জন ঘোষাল প্রাক্‌টিস সম্পর্কে দিলীপকে খুব সাহায্য ক'র্‌ছেন। আশা ক'রছি ভগবানের ইচ্ছায় ও দাঁড়িয়ে যাবে।'

—'দিলীপ নিজে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল ক'রবে, সেই স্বপ্নই তো দেখ্‌চি।' ভাবাবেগে একবার কেঁপে উঠলো মিঃ মল্লিকের কণ্ঠ।

অন্দরের আড়াল থেকে মিসেস্ দত্ত এতক্ষণ সবই শুন্‌ছিলেন, এবারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি নিজের কাজে গেলেন। দু'পরিবারের ঘনিষ্ঠতায় রেবাকে মনে মনে তিনিও একদিন পুত্রবধূরূপে কল্পনা ক'রেছিলেন, স্বামীকে আভাস দিয়েও রেখেছিলেন একদিন। কিন্তু দিলীপের প্রাক্‌টিশে বহাল হবার অপেক্ষায় এতদিন তা প্রকাশ্য রূপ নিয়ে দাঁড়ায়নি। এবারে বিষয়টা পাকাপাকি হ'য়ে যাওয়ায় মনে মনে খুশী বোধ ক'রলেন মিসেস দত্ত।

মিঃ মল্লিক অপেক্ষা ক'রলেন না, বিদায় নিয়ে ব'ললেন, 'তা হ'লে একসঙ্গে ব'সে দু'টি খাবার ব্যবস্থা করি কাল?'

হেসে দাশরথী দত্ত ব'ল্‌লেন, 'এখনই এত খাবার কি হ'লো! নির্বিঘ্নে আগে কাজটা চুকে যাক্, খাবার দিন সাম্‌নে কত প'ড়ে র'য়েছে। দত্তপুকুরের ছানা, পাংশার মর্ত্তমান, গোপালগঞ্জের ক্ষীর, যশোহরের কৈ, এ যদি তখন আনিয়ে না খাওয়ান তো আপনারই একদিন কি আমারই একদিন।' সোৎসাহে হাসির বেগ বেড়ে গেল দাশরথী দত্তের।

মিঃ মল্লিকও না হেসে পারলেন না, ব'ল্‌লেন, 'সে তো আমার সৌভাগ্য। লোক পাঠিয়ে আনাবো, তাতে আর অসুবিধে কি! কিন্তু পান্টা যদি জনাইর

মনোহরা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা আর চিটাগাংয়ের সেরা বাখরখানি না খাওয়ান তো দেখে নেবো না কেমন বেয়াই আপনি!'

আবার একটা হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। হাস্‌তে হাস্‌তেই বিদায় নিয়ে এলেন মিঃ মল্লিক।

সমস্ত বিষয় শুনে মিসেস্ মল্লিকের আনন্দ আর ধরে না। মানুষকে খাওয়াতে তিনি চিরকাল ভালোবাসেন। স্বামীর প্রস্তাব অনুযায়ী নিজেই উদ্যোগী হ'য়ে এবারে তিনি নিজের হাতে রান্নার ব্যবস্থা ক'রে পরদিন সন্ধ্যায় খবার নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন দত্ত দম্পতিকে ; দিলীপও বাদ গেল না।

রেবা-দিলীপের পরিণয়ের ব্যাপারটা আপাতত জানাজানি হ'য়ে প'ড়বার কথা ছিল না, কিন্তু খাবার টেবলে আনন্দোচ্ছ্বাসে কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না।

শুনে আড়ালে রেবার লজ্জারক্ত মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠলো, আর আকস্মিক একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়ায় দিলীপের মুখখানি কেমন অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখাতে লাগ্‌লো।

এরপর বোধ করি দিন দু'য়েকও কাট্‌লো না।

বিকেলে টেনিশ-লন্ হ'য়ে রেবাকে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়লো দিলীপ ইডেন গার্ডেনের দিকে! এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি এক অদ্ভুত মায়া দিলীপের। বিলেতে এমন একটি নির্জ্জন নিবিড় সবুজতা খুঁজে পায়নি সে ব্যারিষ্টারী প'ড়তে গিয়ে। সেখানে চেকোস্লাভিয়ান থেকে সুরু ক'রে আইরিশদের পদধ্বনির সঙ্গে বৃটিশের ম্যাণ্ডোলিন বেজে চ'লেছে দ্রুতলয়ে ; সেখানে জীবনের দ্রুততা আছে, এমন নির্জ্জন নিবিড় সবুজতায় বিশ্রামের স্থিরতা সেখানে কম। ইডেন গার্ডেনকে তাই ভালো লাগে দিলীপের। এক-দিকে কর্ম্মমুখর জীবনের যানবহুলতা, অন্যদিকে গঙ্গার বুকে জাহাজের মাস্তুলের আড়ালে সূর্য্যাস্তের নমনীয়তা, মাঝখানে ঘন তরুরাজি-শোভিত প্রশস্ত সবুজ দ্বীপ। নাগরিক জীবনের কোলাহলের বাইরে এসে মনটা কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নময় হ'য়ে ওঠে।

এসে প্যাগোডার পাশ ঘেঁষে তারা ব'স্‌লো দু'জনে। রেবা আর দিলীপ।

—'আমাদের জীবনটা তা হ'লে পাকাপাকি হ'য়ে গেল, কি বলো?'

সহসা এ কথার জবাব দেওয়া কঠিন হ'লো রেবার পক্ষে। মনে মনে

ভালো লেগেছিল, ভালোবেসেছিল সে দিলীপকে। কিন্তু তাই ব'লে বিজনকেও অস্বীকার ক'রতে পারে নি। বিজনের আবেদনে সেদিন তাই আশার পথের ইঙ্গিত ক'রেছিল সে। তখনও এতটা ভাবতে পারেনি রেবা, আশা ক'রতে পারেনি এতটা। দিলীপের সাংসারিক পরিবেশের সঙ্গে বিজনের সাংসারিক পরিবেশ একেবারেই তুলনার বাইরে। একদিকে ঐশ্বর্য্য, আর একদিকে জীর্ণতা, একদিকে নাগরিক আভিজাত্য, আর একদিকে পল্লীর অন্ধতা। দিলীপের সঙ্গে বিজনের আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু হৃদয় কি সর্ব্বত্র পরিবেশেই আবদ্ধ? বিজনকে তাই অস্বীকার ক'রতে পারেনি রেবা। পারেনি ব'লেই দিলীপের প্রশ্নের উত্তর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই দিতে পারলো না সে। কিন্তু নীরবে চুপ ক'রেও গেল না রেবা। আকস্মিক এই অদৃষ্টের সার্থক পরিবর্ত্তনকে স্বীকার ক'রে নিতে গিয়ে মনে মনে সে বরং ভালোবাসার সাদর অভিনন্দনই জানালো দিলীপকে। স্বল্পক্ষণ থেমে পরে ব'ল্‌লো, 'সুন্দর হ'লো কি?'

—'মানে?' খানিকটা কৌতুহলের দৃষ্টি তুলে ধ'রলো দিলীপ রেবার মুখের দিকে।

—'মানে—পাকাপাকি হওয়া আর সুন্দর হওয়া কি এক! আমার চাইতে অনেক বেশী ভালো মেয়েকেই তো ইচ্ছে ক'রলে তুমি পেতে পারতে! তুমি কি, তা তুমি জানো না, তাই এমন ক'রে ঠ'ক্‌তে চাচ্ছ।' ব'লে চোখ নামিয়ে নিল রেবা।

—'যদি বলি তুমি কি—তা তুমি জানো না ব'লেই এমনি ক'রে ব'লতে পারলে!' সহাস্যে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'বাবা মা আমাকে যখন কিছু না জিজ্ঞেস্ ক'রেই তোমার ভাগ্যের সঙ্গে আমার ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেল্‌বার জাল রচনা ক'রলেন, তখন সুবোধ বালকের মতো দেখিই না ঠ'কে, কি দাঁড়ায়!'

আড়ালে মুখ টিপে হাস্‌ছিল রেবা। এবারে চোখ তুলে ব'ল্‌লো, 'একবার ঠ'ক্‌লে আর কি নিজেকে শুধরে নিতে পারবে?'

—'তুমি তো অন্ততঃ শুধরে দেবার জন্যে থাক্‌বে।' ব'লে পকেট থেকে ছোট্ট একটা কাগজের মোড়ক বার ক'রলো দিলীপ। মিনা করা প্যাগোডা প্যাটার্ণের একটি সুদৃশ্য আংটি বেরিয়ে এলো সেই মোড়ক থেকে। রেবার বাঁ হাতখানি টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই আংটিটি তার অনামিকায় পরিয়ে দিল দিলীপ। ব'ল্‌লো, 'জীবনের ভিৎ প্রতিষ্ঠায় সূর্য্য সাক্ষি ক'রে মঙ্গল-গ্রহের

আরাধনার রীতি আছে আমাদের ভারতীয় সমাজে। চেয়ে দেখ, গঙ্গার ওপারে সূর্য্য ক্রমে অস্তমিত হ'চ্ছে ; সূর্য্যের সাক্ষি তাই ঠিকই ঘ'টে গেল। এ আংটিটা সারা জীবন তোমার আঙুলে আমাদের ভালোবাসার অটুট্ প্রতীক হ'য়ে বেঁচে থাক্।'

অস্তমিত সূর্য্যের লাল আভা এসে ঠিক্‌রে প'ড়ে রেবার মুখখানি তখন অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত ক্যামেলিয়ার মতই সুন্দর ও শোভাময়ী দেখাচ্ছে। আঙুলের দিকে লক্ষ্য ক'রে দিলীপের মুখের দিকে একবার নরম দৃষ্টি তুলে ধ'রলো রেবা। সেই দৃষ্টিতে শুধু একটি মাত্র জিজ্ঞাসাই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, 'আমি, আমি যে কিছু দিতে পারলুম না তোমাকে ?' গলার মধ্যে অর্দ্ধস্ফুট শব্দে একবার আলোড়িত হ'য়ে উঠলো কথাটা।

দিলীপ ব'ল্‌লো, 'তুমি যে তোমার নিজেকেই দিলে, এর চাইতে আরও কিছু কি শ্রেষ্ঠ দান খুঁজে পেতে তুমি ? ব'ল্‌ছিলে—ঠকেছি, কিন্তু পৃথিবীতে বোধ করি আমার মতো খুব কম লোকই জিত্‌বার ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে।'

গঙ্গায় বোধ হয় অনেকক্ষণই জোয়ার এসেছিল। অলক্ষ্যে সে-জোয়ার এবারে রেবার বুকের মধ্য দিয়ে ব'য়ে গেল। আর একটি কথাও তার মুখে এলো না।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ইডেন্ গার্ডেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল।

কুড়ি

মাগুরার পল্লবগ্রাহী জীবনে ছন্দা ক্রমেই আবার তিক্ততার বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠ্ছিল। অঞ্জনার তীক্ষ্ণ জিহ্বা আবার লেলিহান হ'য়ে উঠতে দেরী হ'লো না। নীরবে নির্ব্বিবাদে ক্ষীণপক্ষ পতঙ্গের মতো সেই লেলিহান শিখায় পুড়তে হ'লো ছন্দাকে। তবু এই আশ্রয় তাকে শান্তির আশ্রয় ব'লেই মেনে নিতে হ'য়েছে ; না নিয়ে উপায় নেই। তার নিজের গৃহ ব'ল্‌তে একদিন যা স্বর্গরাজ্য হ'য়ে উঠেছিল তার কাছে, আজ তা শ্মশান। শ্মশানচারিণী যোগিনীর মতো চোখ বুজে শব-সাধনা ক'রতে গিয়ে ত্রাসে চিৎকার ক'রে উঠতো তার অন্ত-রাত্মা। স্বর্গরাজ্য তার কাছে ভূষণ্ডীর লীলাভূমি হ'য়ে দেখা দিল, পারলো না তারিনীমোহনকে আশ্রয় ক'রে ইন্দ্রলোকের শচী-সুলভ মর্যাদা নিয়ে সুখী হ'তে ছন্দা, জীবনের নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে এসে দাঁড়ালো এই অগ্নি-গোলার্দ্ধে। কিন্তু তবু কি ভুলতে পারলো সে শ্যামলকান্তিকে? বিধাতার যে অমোঘ বিধানে একদিন তার সাথে ভাগ্য গাঁথা হ'য়ে গিয়েছিল, তাকে কি এত সত্বর আর এত সহজেই ভোলা সম্ভব! কিন্তু কাকিমা অঞ্জনার স্বভাবগত চিৎকারে মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ড এমনভাবে চমকে ওঠে যে, কোনো চিন্তাই তখন আর মাথায় থাকে না, সমস্ত মাথাটা তখন কেমন এক অদ্ভুত-ভাবে ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে থাকে।

এই দুঃসহ পরিবেশের মধ্যে মাঝখানে তবু কয়েকটা দিনের জন্য সবিতা এসে গৃহের আভ্যন্তরীণ সুরটাকে ঈষৎ নরম ক'রে দিয়ে গেছে। রংপুরে তার শ্বশুরবাড়ি। স্বামী অনিলকুমার চাকরীজীবী মানুষ। কথা ছিল—প্রথম সন্তানের ব্যাপারে মাগুরায় এসেই সবিতার প্রসব হবে, কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তিতে তা আর হ'য়ে ওঠে নি। কিছুদিন পর মাস দু'য়েকের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে হাসিমুখে এসে উপস্থিত হ'লো সবিতা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা গেল—মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-সমুদ্রে অতীতের জঞ্জাল অলক্ষ্যে কখন্ ধুয়ে মুছে সব একাকার হ'য়ে গেছে। অনুমান মিথ্যে নয় ছন্দার। মাগুরার মেয়ে সবিতা আর রংপুরের বউ সবিতার মধ্যে আজ আকাশ-পাতাল পার্থক্য, সেই পার্থক্যকে আরও সুদূর-প্রসারি ক'রেছে তার

মাতৃত্ব। ছেলের নাম রেখেছে গৌর, গৌরাঙ্গের মতই দেবকান্তি। গৌরাঙ্গ-জননী সবিতা আজ একেবারেই স্বতন্ত্র মানুষ।

বাড়ির উঠোনে এসে পা দিতেই তার বুক থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সারা বুকখানির মধ্যে জড়িয়ে ধ'রলো ছন্দা, ব'ল্‌লো, 'বাঃ, এমন সুন্দর না হ'লে কি গৌরবাবু আমাদের গৌরাঙ্গ হয়! নিশ্চয়ই ও ওর বাবার মতো হ'য়েছে, তাই না সবি?'

—'হ্যাঁ, বাবার মতো না আরও কিছু, মুখের আদোল দেখে মনে হ'চ্চে মাতুলের ধারা পেয়েছে। গৌরের ঠাকুমা বলেন—ঠিক্ মিণ্টুর মতো হ'য়েছে দেখতে।' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌তে লাগলো সবিতা।

মিণ্টু এবং জিতু ততক্ষণে দিদিকে এসে ঘিরে ধ'রেছিল। মিণ্টুর চিবুক স্পর্শ ক'রে গৌরাঙ্গকে একবার মিলিয়ে দেখ্‌লো ছন্দা, তারপর ব'ল্‌লো, 'খুব মেলাতে শিখেছিস যা-হোক্, গৌরের কোন্ যায়গাটা মিণ্টুর মতো, দেখা দিকি? মাঐমাকে আমাদের নিশ্চয়ই বাহাত্তরে পেয়েছে, নইলে এমন ভুল ক'রবেন কেন! গৌরের বাবাকে আমার দেখার সুযোগ হয়নি বটে, কিন্তু ওর চেহারার মধ্যে দিয়ে তাকে বেশ কল্পনা ক'রে নিতে পারছি। গৌর নিশ্চয়ই তার বাবার মতো হ'য়েছে।'

—'গৌরের দাদুও অবিশ্যি এই কথাই বলেন।'

—'দৃষ্টিশক্তিতে তিনি তবে মাঐমার চাইতে এখনও সক্ষম আছেন ব'ল্‌তে হবে।' ব'লে মুখ টিপে একবার কৌতুকের হাসি হাস্‌লো ছন্দা।

সবিতা ব'ল্‌লো, 'তা আছেন, এখনও চশমা নেন্‌নি; গৌরের ঠাকুমাকে অবিশ্যি আমি গিয়ে অবধিই চশমা ব্যবহার ক'রতে দেখেছি।' তারপর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ছন্দার কোল থেকে ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে সোজা গিয়ে মার কাছে ব'স্‌লো সে।

ইচ্ছে ছিল না নিজের বুক থেকে গৌরকে নামিয়ে দেয় ছন্দা। কিন্তু অধিকার নেই কেড়ে রাখার। একদিন এম্‌নি একটি অনিন্দ্যকান্তি শিশুর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় সারা হৃদয় তার উন্মুখ হ'য়ে থাকৃতো। বিধাতা সে প্রতীক্ষা তার পূর্ণ করেন নি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাকে কি তাই ব'লে বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে সে, পারেনি। আজও তার সমস্ত হৃদয় হাহাকার ক'রে ওঠে, হাহাকার ক'রে ওঠে তার সমস্ত যৌবন—সমস্ত জীবন-সত্তা। গৌরকে বুকে পেয়ে ক্ষণিকের একটা অনুপম আনন্দে সারা বুক তার নেচে উঠ্‌লো, কেঁদে

উঠ্‌লোও সেই সঙ্গে। এই হাসি-কান্নার দ্বন্দ্ব-দোলায় অতীত ভবিষ্যৎ সব যেন মুহূর্তের মধ্যে একাকার হ'য়ে গেল তার কাছে।…

অবকাশ মতো একসময় কাছে ব'সে আক্ষেপের সুর তুলে ধ'রলো সবিতা: 'শ্যামলবাবু হঠাৎ এম্‌নি ক'রে আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। তোর অদৃষ্টের কথা ভাবতে গেলে দুঃখে বুক ভেঙে যায় ছন্দা।'

—'আমার নিজের অদৃষ্টের কথা আজ আর আমি ভাবিনা, শুধু তাঁর কথাই মনে হয়।' রুদ্ধকণ্ঠে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'জীবনে যখন সব চাইতে বেশী উন্নতির সময়, সেই সময়ই পৃথিবী থেকে তাঁকে চ'লে যেতে হ'লো। পরিশ্রমকে গায়ে মাখতেন না কখনও, কিন্তু সেই পরিশ্রমই কাল হ'য়ে দাঁড়ালো।'

সমবেদনার কণ্ঠে সবিতা ব'ল্‌লো, 'সবই অদৃষ্ট বোন, তার জন্যে মিথ্যে ভেবে লাভ নেই। তুই বরং মাঝে মাঝে তোর শ্বশুরের কাছে গিয়ে থেকে আসিস্; সংসারে তিনিও তো কম নিঃস্ব নন্! শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘর ক'রে আজ আমি সব বুঝতে শিখেছি। একদিন ছোট বেলায় অবুঝের মতো কি অত্যাচারটাই না তোর উপর ক'রতাম! সে কথা ভাবতে গেলে আজ লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তুই যেন সেদিনের কথা কিছু মনে ক'রে রাখিস্‌নে ভাই! একবার চল্, কিছুদিন রংপুরে কাটিয়ে আস্‌বি; দু'জনে তবু ক'টা দিন কাছে থাক্‌তে পারবো। গৌরের বাবাও খুসী হবেন।'

কথা চাপা দিয়ে ছন্দা ব'ললো, 'কেমন লোক আমাদের অনিল বাবু, কই, কিছু ব'ল্‌লি না তো?'

—'ব'লে কি তার রূপ দেওয়া যায়, গিয়েই না হয় দেখ্‌বি!'

—'তাঁরই কি আস্‌তে নেই নাকি? শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখতেও তো মানুষ আসে!'

—'সে আর এসেছে, ব'লতে গেলেই শুনি—আপিস নাকি তাকে ছুটি দেয় না! বিশ্ব-সংসারে কাজ যেন সে একাই করে!' ব'লে খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রলো সবিতা।

বোঝা গেল—এখানে আসার সময় ঝুলোঝুলি ক'রেও তাকে সঙ্গে আন্‌তে পারে নি সবিতা, এই নিয়ে কিছু একটা মন-কষাকষিও হ'য়ে থাকবে। বেশ লাগে শুন্‌তে এই ধরণের কথাগুলো ছন্দার। পারিবারিক জীবনের সুন্দর একটি ছবি, একটি মনোরম দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ঠাট্টা ক'রে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'আমি কিন্তু ইচ্ছে ক'রলেই তাঁকে এখানে টেনে আনতে পারি। আজই যদি তোর কিছু একটা অসুখের কথা জানিয়ে টেলিগ্রাম ক'রে দিই, দেখবি—কালই সুর-সুর ক'রে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। আন্‌তে জানিস নে, তাই আসেন না।'

শুনে আত্মতৃপ্তিতে একবার মুগ্ধ হাসি হাসলো সবিতা: 'বেশ তো, পাঠিয়েই দেখ না টেলিগ্রাম!'

কিন্তু ততদূর অগ্রসর হ'তে সাহস পেলো না ছন্দা। ব'ল্‌লো, 'থাক্, শেষে সত্যি সত্যিই তোর কিছু একটা হ'য়ে বসুক্, তাই নিয়ে বিপদে পড়ি আমি আর কি!' তারপর স্বল্পক্ষণ থেমে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'অমিল বাবুকে কেমন লাগছে তোর, বল দিকি?'

—'গৌর কোলে এলো, তাতেও বুঝলি নে কেমন লাগছে!' ব'লে হেসে ফেল্‌লো সবিতা; তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'ভীষণ রসিক লোক, বানিয়ে বানিয়ে এমন সব আজগুবি গল্প বলে যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যায়।'

শুন্‌তে শুন্‌তে শ্যামলকান্তির কথাই বার বার ক'রে মনে প'ড়ছিল ছন্দার। আজগুবি গল্প তাঁর মুখে ছিল না, কিন্তু যা ছিল—প্রাণরসে তা পরিপূর্ণ। কত বিনিদ্র রাত্রি কেটেছে সেই রস-সমুদ্রে অবগাহন ক'রে! ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়লো ছন্দা।

ভেবেছিলো—আরও কয়েকটা দিন সবিতা কাছে থেকে কিছু শান্তি দিয়ে যাবে, কিন্তু হ'লো না। রংপুরে তার স্বামীকে টেলিগ্রাম করা দূরে থাক্, তাঁরই বরং উল্টো টেলিগ্রাম এসে একদিন উপস্থিত: সবিতা যেন দুই একদিনের মধ্যেই রংপুরে রওনা হ'য়ে যায়। আশ্চর্য্য মানুষ যা হোক!

কোনো ওজর আপত্তিই টিক্‌লো না; এ সংসারে তার আপত্তির মূল্যই বা কতটুকু! মাত্র কয়েকটা দিন থেকেই আবার রওনা হ'য়ে গেল সবিতা। এ ক'টা দিন মেজাজ অপেক্ষাকৃত কিছু শান্ত ছিল কাকিমার, নিজের মনেও কিছু সুস্থতা বোধ ক'রেছিল ছন্দা। কিন্তু আত্মভোলা হ'য়ে বেশীদিন থাকতে পারলেন না অঞ্জনা, যা-নয়-তাই ব'লে আবার গজ্ গজ্ ক'রতে সুরু ক'রে দিলেন। সেই সুরের সঙ্গে তাল রেখে না চ'ল্‌তে পারলেই বানচাল হ'য়ে যেতে বসে অদৃষ্ট।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এলো—তারিণীমোহন বিশেষ রোগাক্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন, ছন্দাকে দেখ্‌বার জন্য বড় উতলা হ'য়ে উঠেছেন তিনি।

রসিকলাল একসময় কাছে ডেকে ব'ল্লেন, 'এ সময়ে তোমার আর মোটেই দেরী করা উচিৎ নয় মা। চলো, আমিও বরং দুদিন ঘুরে আসি। সংসারে ক'দিন আছি, কবে নেই—কিছুই তো বলা যায় না, সময় থাকতে থাকতে তবু একবার বেয়াই মশাইর কাছ থেকে দু'দিন কাটিয়ে আসি।'

ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এ বয়সে আপনার পায়ে ব্যথা নিয়ে ঘুরে আসতে কষ্ট হবে না তো কাকাবাবু?'

—'না না, কষ্ট কি! সায়টিকা, রিউমেটিক, গাউট,—এসবে বরং হাঁটা-চলাই কিছু দরকার।' থেমে রসিকলাল ব'ল্লেন, 'তুমি তৈরী হ'য়ে নাও মা, খেয়ে দেয়ে অম্‌নি রওনা হ'য়ে প'ড়বো।'

শুনে নেপথ্যে থেকে অঞ্জনা কিছুটা কটাক্ষপাত ক'রলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ক'রলেন না তাতে রসিকলাল। যথাসময়ে তিনি রওনা হ'য়ে প'ড়লেন।

কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! এমন দেখাও মানুষকে মানুষ কখনও দেখতে যায়! গাড়ী এসে যখন তরণীমোহনের দরজায় দাঁড়ালো, তরণীমোহনের নশ্বর দেহকে সংকার ক'রে তখন সকলে ফিরচে। স্তম্ভিত নেত্রে তাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিলেন রসিকলাল। ছন্দা ততক্ষণে কেঁদে লুটিয়ে প'ড়েছে। ইতিপূর্ব্বে মাগুরা থেকে শ্বশুরমশাইকে সে কয়েকখানি চিঠি লিখেছিল, উত্তরে অসুস্থতার এমন কিছু কোথাও লেখা ছিল না—যা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া চলে। শুধু তাকে দেখবার আগ্রহটাই বিশেষ ভাবে ফুটে উঠ্‌তো তারিণীমোহনের প্রতি চিঠিতে। আজ এমন ভাবে তিনিও হঠাৎ সংসার থেকে চ'লে যাবেন—এ কথা কল্পনাও ক'রতে পারে নি ছন্দা।

স্বতন্ত্র হিস্যার জ্ঞাতিসম্পর্কে পরেশ কাকার সংসারের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছিল তার। উপস্থিত বেলাটা তাঁর ঘরেই কাটাতে হ'লো। বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে পরেশ বাবু ব'ললেন, 'অসুখ হ'য়েই যে হঠাৎ এমন বেড়ে যাবে, কেউই আমরা ভাবতে পারি নি। কিছুদিন থেকে দাদা যে সুস্থ ছিলেন না, তা বেশ বুঝতে পারতাম। ডাক্তার কবরেজ এসে তাঁকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করুক, তা তিনি চাইতেন না। তবু চিকিৎসায় আমরা ক্রটি রাখিনি। কখনও 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস ক'রলেই ব'ল্‌তেন—'মন্দ কি, ভালই তো আছি।' এমন ভাবে যে মৃত্যু আসবে, বোধ করি তিনিও ভাবতে পারেন নি। কাল

সকাল থেকেই হঠাৎ ঘন ঘন ফিট হ'তে সুরু করে ; সারাদিনই ডাক্তার বাড়িতে ছিল, ইন্‌জেক্‌শন চ'ল্‌লো, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পথ্য। কিন্তু বিকেলের দিকে ডাক্তারও হাল ছেড়ে দিল। তারপর রাত্রেই এই দুর্ঘটনা ঘটলো।'

ছন্দা জিজ্ঞেস ক'র্‌লো, 'যাবার আগে কাউকে কিছু ব'লে যেতে পেরেছেন ? শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ জ্ঞানটুকুও আর ছিল না ?'

—'শেষ নিশ্বাস ফেল্‌বার আগে কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরেছিল। ব'ল্‌লেন—হাতবাক্সে উইলের কাগজ আছে, তুমি এলে তোমার হাতে যেন তুলে দিই। বিষয় সম্পত্তি এমন কিছু নেই—যা দেবার মতো, তবু এখানকার হিস্সাগত অংশ—তাই বা একেবারে কম কি ! তোমার জীবন এতেই কেটে যাবে মা।'

ছন্দার চোখ দু'টি বেদনায় আর-একবার ছল্‌ছল্ ক'রে উঠলো। আর্দ্রকণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'বিষয়সম্পত্তি দিয়ে আমি কি ক'র্‌বো কাকা ? নতুন বউ হ'য়ে এ সংসারে এসে ঢুকেছিলাম, এর কোথায় কি আছে, তাই-ই ভালো ক'রে জানি না, সম্পত্তি তো দূরের কথা। ও দিয়ে আমার কাজ নেই।'

পরেশ বাবু ব'ল্‌লেন, 'তোমার জিনিষ তুমি বুঝে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কোরো। এ সম্বন্ধে আমি কি ব'ল্‌বো মা ?'

রসিকলাল ব'ল্‌লেন, 'অন্যায্য কিছু বলেননি পরেশ বাবু। শ্যামলের হ'য়ে এ সম্পত্তি যে আজ তোমাকেই রক্ষা ক'রতে হবে মা ! নইলে স্বর্গে থেকে বেয়াই মশাইর আত্মা কি শান্তি পাবে ?'

আইনজীবী রসিকলাল, এতক্ষণ নীরবে সর্ব্ববিষয় শুনে বিশেষ অন্তরঙ্গতার সঙ্গেই মন্তব্য প্রকাশ ক'রে পুনরায় চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তিনি যদি বুঝতেন—এ পোড়া যক্ষপুরী আগলে একটা দিনও বাঁচতে পারবে না ছন্দা, এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে আজ তার, একটা মুহূর্ত্তও পারবে না সে নিজেকে নিয়ে স্থির থাক্‌তে এখানে,—তা হ'লে হয়ত নিজের মত ব্যক্ত ক'রতে গিয়ে একবার ইতস্ততঃ ক'রতেন রসিকলাল। কিন্তু ছন্দার ভবিষ্যতের দিক চিন্তা ক'রেই তার ভাবপ্রবণ চিত্তকে এ ভাবে আঘাত ক'রতে হয়েছে তাঁকে। না ক'রে তাঁর পক্ষে উপায় ছিল না। নিজের সংসারের প্রতি তাঁর আস্থা নেই ব'লেই ছন্দার অদৃষ্ট নিয়ে এ ভাবে আজ তাঁকে ভাবতে হয়।

কাকাবাবুর কথার উত্তরে ছন্দা এতটুকুও প্রতিবাদ জানালো না। বরং নির্ব্বিবাদে তা মেনে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে নিল।

পরেশবাবু একসময় চাবির গোছা এনে তার হাতে তুলে দিয়ে ব'ল্লেন, 'এবারে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম মা। নিজের ঘরে গিয়ে এবারে জিনিষপত্র সব বুঝে শুনে নাও।'

কিন্তু তিনি যত সহজে কথাটা ব'ললেন, তত সহজেই কিন্তু কাজ মিটলো না। নিশ্চিন্ত হ'তে গিয়ে তাঁকে বরং আরও কঠিন দায়িত্বে জড়িয়ে প'ড়তে হ'লো।

রসিকলাল ব'ললেন, 'জ্ঞাতি সম্পর্কে আপনিও তো আমার বেয়াই, আপনাকে অনুরোধ ক'রতে তাই লজ্জা নেই। আপাতত উপস্থিত থেকে এসব আপনাকেই দেখাশোনা ক'রতে হবে। আজ আপনারা ভিন্ন ছন্দার আপনার ব'লতে আর কে রইল! সুবিধে মতো যখন এসে ও এখানে থাক্‌বে, তখন বরং দেখে শুনে সব বুঝে নিতে পারবে। এখন মনের এই অবস্থায় ওকে কিছু ব'লে লাভ নেই।'

একটা দুশ্চিন্তা থেকে যেন এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে মনে মনে অনেকখানি বেঁচে গেল ছন্দা।

রসিকলাল এমন ভাবে কথাটা ব'ল্লেন যে, ইচ্ছে ক'রেও আপত্তি ক'রতে পারলেন না পরেশ বাবু। ব'ললেন, 'বেশ, আমি তবে ছন্দা মার ট্রাষ্টি হিসেবেই এসব কিছু আগলে রাখবো। তাই ব'লে এদিকটা যেন একেবারেই ভুলে থেকো না মা। এখানে এসে তোমাকে কোনো অসুবিধেই পোয়াতে হবে না।'

উত্তরে রসিকলাল কিছু-একটাও আর ব'ল্লেন না।

ছন্দা মনে মনে একবার কথাটা উচ্চারণ ক'রলো: 'অসুবিধে!' এতকাল এত সুবিধে থাকতেই যার ভাগ্যে সুখ ব'লে কিছু রইল না, আজ প্রেতপুরীতে ব'সে কোন্ সুখে সে সংসারের সহস্র সুবিধে ভোগ ক'রবে? কিন্তু মুখ ফুটে সে একটি কথাও আর ব'ল্‌তে পারলো না। শুধু বিদায় নিয়ে আসার সময় পরেশ কাকার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে নীরবে চোখের জলে তাঁর পা দু'খানি ভিজিয়ে দিয়ে এলো ছন্দা।

একুশ

দিলীপ দত্তের পরিচয় জেনেও রেবার সঙ্গে তার পরমাত্মীয়তার সম্পর্কটা একেবারেই অনাবিষ্কৃত ছিল বিজনের কাছে। এই অনাবিষ্কৃততাই বার বার কাঙাল হৃদয়কে টেনে নিয়েছে রেবার সম্মুখে।—কল্‌কাতার আশ্চর্য্য জীবন! এখানে পাশাপাশি বাস ক'রেও পাশের বাড়িকে মনে হয় কত দীর্ঘ যোজন দূরের। এমনি প্রচ্ছন্নতা, এমনি আবরণ আর আচ্ছাদন ছড়িয়ে র'য়েছে কল্‌কাতার নিশ্বাসে। এম্‌নি একটা আচ্ছাদনে আবৃত হ'য়েই হৃদয়কে তুলে ধ'রেছিল বিজন রেবার কাছে—যেম্‌নি ক'রে মুগ্ধ ভ্রমর নিজেকে তুলে ধরে ফুলের পাঁপড়িগুচ্ছে। অবশেষে নিজের অপেক্ষমান ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় স্থির ক'রে ফেল্‌লো সে মনে মনে। বস্তুবাদী মহেন্দ্রের কোনো যুক্তিই শেষ পর্য্যন্ত আর তার কানে এসে পৌছালো না। নিজের আত্মবিশ্বাসের কাছে মহেন্দ্রের কোনো যুক্তিকেই সে আমল দিতে চায়নি। কয়েকটা দিন এই নিয়ে সে অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌছেচে যে—রেবাকে না পেলে তার জীবন-স্বপ্ন মিথ্যা হ'য়ে যাবে, মিথ্যা হ'য়ে যাবে তার মানুষের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। হৃদয়ের চাইতে তাই সমাজগড়া ধর্ম্মের কৃত্রিমতাকে সে বড় ক'রে দেখেনি। ছন্দা চ'লে গিয়ে তার হৃদয়ের একটা দিককে মরুভূমি ক'রে দিয়ে গেছে, রেবা তার আর-একদিকের সম্পূর্ণতা। জীবনকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে তার যেমন ভাঙ্গা গড়া আছে, ভেঙে আর-একদিককে যেমন সৃষ্টি করে সে, তেম্‌নি বিজনের জীবনেও একদিকের ভাঙনের উপর নতুন সৃষ্টির লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে হবে আর-একদিকের সম্পূর্ণতা দিয়ে। নইলে বাঁচবে কি নিয়ে সে, কি নিয়ে এগিয়ে যাবে সাম্‌নের পথে?

মহেন্দ্রের অগোচরে একদিন সমাজ-মন্দিরে গিয়ে আচার্য্যের কাছ থেকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে এলো বিজন। মায়ের বুকে গিয়ে অলক্ষ্যে তার এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ প্রকৃতই আঘাত ক'রলো কি না, কিম্বা মাগুরার পল্লী-সমাজ ভবিষ্যতে তাকে গ্রহণ ক'রবে কি না, এ চিন্তা আজ অবান্তর। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভেই নিমজ্জিত থাক্‌। তা নিয়ে আপাতত চিন্তাসূত্রে জড়তা আন্‌তে রাজি নয় বিজন।

প্রশান্ত মনেই একসময় গিয়ে উপস্থিত হ'লো সে মিঃ মল্লিকের বাড়িতে। সন্ধ্যা সবে তখন উত্তীর্ণ হ'য়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠতে গিয়ে কানে বাজলো তার অর্গানের একটা মিষ্টি সুর। ব্যর্থ হ'লো না তবে আজকের এই সন্ধ্যাটা। উপরে আস্‌তেই লক্ষ্যে প'ড়লো—ত্রস্তে পাশ কাটিয়ে নীচের পথে নেমে গেল দিলীপ, ব'ললো, 'এই যে, ভাল তো?' কিন্তু জবাবের প্রত্যাশা রেখে হয়ত প্রশ্ন করেনি সে, তাই বিজন মুখ ফুটে 'হ্যাঁ' ব'লবার আগেই অদৃশ্য হ'য়ে গেল দিলীপ, নীচে নেমে সোজা একেবারে পথে। সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যেই কখন্ অর্গানের সুর হঠাৎ থেমে গেল। কাছে এসে বিজন ব'ল্‌লো, 'আস্‌তে না আস্‌তেই গানটা থামিয়ে দিলে তো?'

নিজের কাছেই আজ নিজে সঙ্কোচে ম'রে যাচ্ছিল রেবা। ভালো ক'রে তাই বিজনের মুখের দিকে সহজ দৃষ্টিতে তাকাতে পারলো না সে। কেমন একটা দ্বিধা, দ্বিধার সঙ্গে কেমন একটা আত্মগ্লানি এসে তাকে পীড়া দিতে লাগলো। কিন্তু মনের এ অবস্থাকে বেশীক্ষণ সে প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই সে নিজেকে সহজ ক'রে নিল।– 'থামিয়ে কেন দেবো, গান তো গাইনি, অর্গানের রিড্‌গুলোই শুধু বাজছিল। কিন্তু তাও বেশীক্ষণ ভালো লাগলো না।'

বিজন একথা জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারলো না যে, সিঁড়ি বেয়ে আস্‌তে আস্‌তে গান গাইতেই সে শুনেছিল তাকে; থেমে জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন, শরীর কোনোরকম খারাপ বোধ ক'রছো?'

—'না, শরীর ভালোই আছে; এম্‌নিই কেন যেন গাইতে মন ব'স্‌ছিল না।' থেমে রেবা ব'ল্‌লো, 'চলো, নীচে গিয়ে তোমাকে চা ক'রে দিই, তারপর ব'সে ব'সে গল্প ক'রবো।'

—'চায়ে এখন প্রয়োজন নেই, কিছুক্ষণ আগেই মেস থেকে খেয়ে বেরিয়েছি।' বিজন ব'ল্‌লো, 'তা ছাড়া নীচে গেলেই কি গল্পে মন ব'স্‌বে? যে কারণে গান ভালো লাগেনি, হয়ত সেই একই কারণে গল্প ক'রতেও মন সায় দেবে না। আজ হয়ত তোমার মনের বিহঙ্গ কোনো নতুন আকাশে ডানা মেলেছে।'

স্মিতহাস্যে মুখখানি এবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো রেবার। বিজনের কথার ঠিক যথাযথ উত্তর না দিয়ে ব'ল্‌লো, 'কাব্যের উৎকর্ষে ভাব তোমার গভীরে পৌঁছেচে, বেশ লাগে শুন্‌তে তোমার কথাগুলো, বিজুদা।'

বিজন ব'ল্লো, 'কথা শোনাতে আসি নি, শুন্তে এসেছি। তার সাথে নিজের কথাকে কিছু যোগ ক'রে দেবো,—এইটুকু।'

—'আজ তোমার তবে মাথা খারাপ হ'য়েছে বিজুদা ; আমি কি কথার জাহাজ, না তোমার মতো কথা নিয়ে চর্চ্চা করি যে শুন্তে এসেছ, শোনাতে আসোনি! চলো, চা না খাও তো অন্য কিছু খাবে, নিচে যাই চলো।'

—'এখানেই বা এমন কি ক্ষতি হ'লো! প্লেট সাজানো ভিন্ন আর কি সংসারে কিছু খাবার নেই, আরও সুন্দর, আরও মধুর, আরও মিষ্টি!'

কথাটা বুঝে নিতে দেরী হ'লো না রেবার। দেখতে দেখতে সারা মুখখানি তার লাল হ'য়ে উঠলো, সেই সাথে সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে একটা বিদ্যুৎ ঝল্‌কে গেল সহসা। এই মুহূর্ত্তে যে ইঙ্গিত ক'রলো বিজুদা, অন্য কোনোকালের কোনো একটা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তা হয়ত প্রাণদায়িণী ব'লে মনে হ'তে পারতো তার কাছে, কিন্তু আজ একথা শুন্তে শুধু ধিক্কারই আসে না, একথা কানে শুন্তেও পাপ। যে দেহ, যে মন আপন ইচ্ছায় সে তুলে দিয়েছে দিলীপকে, সেই দেহ আর সেই মনের উপর অন্য কারুর ছায়াসম্পাত ঘ'টতে পারে না। তা নীতিবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তার মতো পাপ বুঝি এ পৃথিবীতে আর কিছু নেই! কী একটা ব'ল্তে গিয়ে হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেল্‌লো রেবা।

নিজের আসল বক্তব্যে এসে না পৌছানো পর্য্যন্ত বিজনও বড় কম অস্বস্তি বোধ ক'রছিল না এতক্ষণ। খাবারের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে নিজের কথায় এবারে নেমে আস্‌তে চেষ্টা ক'রলো সে।

—'জানো রেবা?'

কথা না ব'লে মুখখানিকে শুধু একবার তুলে ধ'রলো রেবা। মনের বিরক্তিকে বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না সে এতটুকুও।

কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রেই বিজন ব'ললো, 'আজ আমার সব চাইতে বেশী প্রয়োজন তোমার কাছে। শুধু এইজন্যেই আজ ছুটে আস্‌তে হ'য়েছে আমাকে। সেদিন যে কথার ইঙ্গিত ক'রেছিলে তুমি, আজ তার বাস্তব স্বীকৃতিটাই শুধু তোমাকে জানাতে এলাম রেবা। সামাজ-মন্দিরে গিয়ে আচার্য্যের কাছ থেকে আমি তোমাদেরই ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে এসেছি। আজ আর নিশ্চয়ই কোনো প্রতিবন্ধন নেই আমাদের মধ্যে!'

মনে হ'লো—সারা বুকের মধ্যে হয়ত একবার ঝড় বইবে, পারবে না নিজেকে নিয়ে যুদ্ধ ক'রতে রেবা। কিন্তু তার সমস্ত লক্ষণ চাপা প'ড়ে কেমন

ধীর অথচ আভিজাত্য-কঠোর হ'য়ে উঠলো রেবার কণ্ঠ। ব'ল্‌লো, 'পারলে তুমি নিজের সনাতন ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে আস্‌তে? এমন ক'রে তুমি ছেলেমানুষি ক'রবে বিজুদা, এ কল্পনাও ক'রতে পারিনি।'

—'ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিকে আর যা-ই করো, মিথ্যে হেঁয়ালীতে ছেলেমানুষী ব'লে উড়িয়ে দিওনা, ধর্ম্ম তা শুনবে না।' বিজন ব'ললো, 'যিনি সকল ধর্ম্মের তীর্থপুরুষ, তাঁর কাছে আত্ম-নিবেদনে কোনো গ্লানি নেই। বলো, কথা দাও, এবারে মেসোমশাইকে মত করাবে তুমি, আমার ব্যথাদীর্ণ জীবনে শান্তির স্পর্শ হ'য়ে এসে দাঁড়াবে তুমি, রেবা?'

—'কিন্তু—বড্ড দেরী ক'রে ফেলেছ তুমি।' ব'লতে গিয়ে গলার স্বর একবারও কেঁপে উঠলো না রেবার, একবারও ইতস্ততঃ ক'রলো না সে শব্দগুলো উচ্চারণ ক'রতে গিয়ে। ব'ল্‌লো, 'বাবা তার সমস্ত ব্যবস্থাই আগে থেকে পাকা ক'রে ফেলেছেন। আমি আজ ব্যারিষ্টার দত্তের বাক্‌দত্তা।'

—'হাউ স্টিলি ইউ আর আটা'রং।' আকস্মিক ঝড়ে যেমন ডালপালা আলুথালু হ'য়ে যায়, বিজনের মাথাটাও ঠিক তেমনি ক'রেই সহসা আলোড়িত হ'য়ে উঠলো। মনে হ'লো—কে যেন সহসা ব্রহ্মতালুতে ঘা মেরে তার সমস্ত চেতনা জুড়ে বিরাট একটা বিপর্যয় সৃষ্টি ক'রছে। ব'ললো, 'ত্ব'দিন আগে এতবড় বিষয়টাকে তবে তুমি ইচ্ছে ক'রেই চেপে গিয়েছিলে?'

এতক্ষণে সমস্ত সঙ্কোচ জয় ক'রে উঠেছে রেবা। আর তার কিছুমাত্র সংশয় বা দ্বিধা নেই। ব'ললো, 'যদি বিশ্বাস করো, তবে ব'লবো—ইতিপূর্ব্বে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার দিন পর্য্যন্ত এ প্রশ্ন আমার জীবনে প্রত্যক্ষ হ'য়ে দাঁড়ায়নি।'

—'অন্তরে থেকে তবে পরোক্ষে কাজ ক'রে চ'লেছিল! আজ তাই নিভৃত আলাপের বিঘ্ন এড়িয়ে এমন দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারলেন তোমার ব্যারিষ্টার!' আসন ত্যাগ ক'রে এবারে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো বিজন।

রেবা ব'ললো, 'তাঁকে ও সময়ে উঠে না গিয়ে উপায় ছিলনা। ইলিয়েট রোডে ব্যারিষ্টার উইলিয়ম হ্যারীর বাড়িতে তার এন্‌গেজমেণ্ট র'য়েছে সাতটায়। নইলে হয়ত অপেক্ষা ক'রে তোমার সঙ্গেও গল্প ক'রে যেতে পারতেন।'

—'থাক, নগণ্য লোকের সঙ্গে গল্প ক'রে সময় নষ্ট না করাই উচিৎ।' থেমে বিজন ব'ললো, 'সাহেব সুবোর সংশ্রবে তুমি তবে নাগরিক জীবনে বেশ বড়

নদীতেই পাড়ি জমিয়েছ ! ভালো, কিন্তু মিথ্যে আশা দিয়ে মানুষের কাছে আজ আমাকে হাস্যাস্পদ ক'রবার কী প্রয়োজন ছিল তোমার ? এ অভিনয় না ক'রলেই কি পারতে না রেবা ?'

—'অভিনয় ? এ তুমি কি ব'লছো বিজুদা ?'

পাশের দেওয়ালে রেবার জন্মদিনে উপহার দেওয়া বিজনের ফ্রেম-বাঁধানো কবিতাটা হয়ত একবার আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে বিজন ব'ললো, 'অভিনয় ভিন্ন কি ? অভিনয় না ক'রলে কি ব'লে আজ ভালোবাসাকে অস্বীকার ক'রতে পারছো ? জন্মদিনের কবিতাকে কাঁচ-পাত্রে ফ্রেম-বাঁধাই ক'রে মাথার কাছে টাঙিয়ে রেখে প্রতিদিন কি অন্ততঃ একটিবারও ভালোবাসার স্বীকৃতি জানাও নি মনে মনে ? পারো তুমি অস্বীকার ক'রতে প্রতিদিনের সেই নিরুদ্ধ অনুভূতিকে ? পারো রেবা ?' উচ্ছ্বসিত আবেগে অধীর হ'য়ে উঠলো বিজন।

দু'চোখ ছাপিয়ে হয়ত অলক্ষ্যে একবার জল এলো রেবার। কিন্তু সেটুকু সম্বরণ ক'রে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না তাকে। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই সে আত্ম-আভিজাত্যে পুনরায় কঠোর হ'য়ে উঠলো। ব'ল্‌লো, 'না, একটি দিনের জন্যেও তোমার কবিতার মধ্য দিয়ে তোমাকে চিন্তা করিনি। ঘরে পাঁচখানা ছবির মতো ওটাও আমার সখের জিনিষ। দেয়াল জুড়ে থাক্‌লেও তা মন জুড়ে নেই। হয়ত খুসী হ'লে না কথাটা শুনে, তাই না ?'

বিজনের কণ্ঠস্বরেও বিন্দুমাত্র নম্রতা ছিল না। এবারে একরকম জোর গলাতেই চেঁচিয়ে উঠলো সে : 'মিরাকিউলাস্‌লি বিউটিফুল, সঙ্গীত তোমাকে চমৎকার অভিনয় শিখিয়েছে রেবা। যে উক্তি ক'রে এইমাত্র অহমিকা প্রকাশ ক'রলে, তাই যদি তোমার হৃদয়ের সত্য হয়, তবে সেই সত্যই তোমার চিরন্তন হ'য়ে থাক্। সখের জিনিষকে নির্ব্বিবাদে দেয়াল থেকে স'রে যেতে দাও। মুছে যাক্ অতীতের ইতিহাস !'

সহসা দেওয়াল থেকে ফ্রেম-বাঁধানো কবিতাটিকে টেনে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল বিজন মেঝের উপর। একটা ঝনাৎকার শব্দ তুলে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেল কাঁচপাত্রখানি, ফ্রেমগুলো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল তার-কাঁটার বন্ধনী থেকে।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তোমার বাবাকে বোলো—তা'র যশোহরের নতুন মাইকেলকে তাঁর মেয়ে গলা টিপে মেরেছে।'

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা ক'রলো না বিজন। ভূমিকম্প যেমন ক'রে সমস্ত বসুধাকে কাঁপিয়ে তোলে, তেম্‌নি ক'রে কী এক অধীর উত্তেজনায় বিজনের সারা দেহ থর-থর ক'রে কাঁপছিল। মুহূর্তমাত্র আর বিলম্ব না ক'রে সোজা সে সিঁড়ি গলিয়ে নীচে নেমে গেল, তারপর সুবিস্তৃত রাসবিহারী এভেন্যু।

যে কঠোরতায় এতক্ষণ নিজেকে ধ'রে রেখেছিল রেবা, দেখতে দেখতে সেই কঠোরতা কখন্ তার আভিজাত্যের দুয়ার ভেঙে দূরে মিলিয়ে গেল। কেমন একটা বিষণ্ণতায় আর নির্জ্জীব দুর্ব্বলতায় সারা দেহ তার ভেঙে প'ড়লো। উৎসারিত অশ্রুতে ভেসে গেল তার সারা মুখখানি। উঠে এসে বিছানায় শুয়ে প'ড়ে কতক্ষণ যে নিজের মনে কাঁদলো সে, তা সে নিজেই জানে না।

কিন্তু অশ্রুর পরিবর্ত্তে বিজনের দু'চোখে জেগে উঠলো প্রখর দিনের তীব্রতা। নারী ছলনাময়ী : কথাটা অজানা ছিল না তার। তবু বিশ্বাস ক'রতে চেয়েছিল সে শেষ পর্য্যন্ত একটি নারীকে। মহেন্দ্রের জীবনের ট্রাজেডির কথা শুনেও তার সঙ্গে তর্ক ক'রে সে ব'লেছিল—'হৃদয়ের ব্যাপারে আমি অন্ততঃ ঠকতে রাজি নই।' কথাটা শুনে হয়ত অদৃষ্টদেবতা আড়ালে ব'সে হেসেছিলেন। নইলে আজ তার প্রেমের ঐশ্বর্য্য এমন ক'রে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে কেন? রেবার প্রতি সমস্ত মন তার ঘৃণায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। ঠিক ক'রলো—কল্‌কাতা ছেড়ে আবার মাগুরাতেই ফিরে যাবে সে। আর একটি দিনও এখানে নয়, একটি দিনও আর এখানে তিষ্ঠোতে পারবে না সে। মহানগরী কল্‌কাতা যত ঐশ্বর্য্যেই ঐশ্বর্য্যময়ী হ'য়ে থাক্, অন্তরে সে একেবারে নিঃস্ব ; বাইরের ঐশ্বর্য্যে আভিজাত্যের ডালা সাজানো চলে, হৃদয়ের জগতে তার সাড়া মেলে না। একদিন মোহে প'ড়ে জয় ক'রে নিতে চেয়েছিল সে রূপের রাংতা পরা এই শোভাময়ী মহানগরীকে, আজ তার সে ভুল ভেঙেছে। শুধু জ্বালা, শুধু দাহ এখানে ; মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দিনের দেখা কেওড়াতলার শ্মশান-চিতার মতো ধিকি ধিকি চিতা জ্ব'লছে এখানে সূর্য্যের তাপে। আর একটা দিনও নয় এই বদ্ধ চিতাভূমে। এর চাইতে ছায়াসুশীতল সেই পল্লীর অঙ্গনে অনেক শান্তি, অনেক শান্তি মায়ের মমতামাখা কোলের আশ্রয়ে।

পরাজিত সৈনিকের মতো একসময় সে আত্মসমর্পণ ক'রলো মহেন্দ্রের কাছে।

শুনে মহেন্দ্র সকৌতুকে হো হো ক'রে হেসে উঠলো : 'প্রেমের ব্যাপারে তা হ'লে সত্যিই স্কোরার হ'তে পারেলে না?'

মহেন্দ্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিল বিজন।

হাসি থামিয়ে এবারে সমবেদনার কণ্ঠে মহেন্দ্র ব'ল্‌লো, 'খুব ভেঙে প'ড়েছ, তাই না? কিন্তু ভালোবাসার ব্যাপারে ভেঙে প'ড়বার মতো মূর্খতাও বোধ করি নেই। কোনো বিশেষ নারীর হৃদয় জয় করা গেল না ব'লে ভালোবাসার অমর্য্যাদা হয় না, জীবনও ব্যর্থ হয় না। তুমি কবি, লোক থেকে লোকান্তরে তোমার ভালোবাসা ছড়িয়ে প'ড়বে; যার কথা তুমি কোনোদিন কল্পনাও করোনি—এমন মানুষও তোমার সেই ভালোবাসার পেলব শিখায় প্রাণ পেয়ে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে। জীবনের পথে চ'ল্‌তে গিয়ে এমন বহু ঘটনাই ঘটে—যাকে দীর্ঘকাল স্মৃতিপাত্রে ধ'রে রাখা যায় না। এ ঘটনাও একদিন মুছে যাবে; সেদিন নিজের কাছেই এটা অতীতের ছেলেখেলা ব'লে মনে হবে। বি চিয়ারফুল, স্বচ্ছন্দ হ'তে চেষ্টা করো ব্রাদার। দেখছো তো আমাকে? আজকের যন্ত্রসভ্যতার যুগে আসলে ভালোবাসা-টাসা ব'লে কিছু নেই, ওগুলো ফাইন আর্টসের সংগৃহীত শব্দ মাত্র। প্রয়োজনকে ভালোবাসা নাম দিয়ে এতকাল হৃদয়ের কিছু গোলযোগ সৃষ্টি করা গেছে, আজকের যন্ত্রসভ্যতার কাছে সে ফাঁকি একেবারে হাতে হাতে ধরা প'ড়েছে। ভেঙে না প'ড়ে নারীর সংস্পর্শ থেকে অব্যাহতি পেয়েছ ব'লে আনন্দ করো বিজু, দেখবে অনেক শান্তি পাবে, অনেক কাজ ক'রতে পারবে দেশের।'

একটানা একটা অভিভাষণ পাঠের মতো কথা শেষ ক'রে থামলো মহেন্দ্র।

কিন্তু তার এতগুলো কথার কোনো একটিরও জবাব দিলনা বিজন। স্বল্পক্ষণ থেমে শুধু ব'ল্‌লো, 'আমি ঠিক ক'রেছি, মেসের পাট উঠিয়ে দিয়ে বাড়িতেই রওনা হ'য়ে প'ড়বো।'

—'সে কি, বাড়ি যাবে মানে কি? তোমার ট্যুইশনি, পরীক্ষা—এগুলোর তবে কি হবে?'

—'অন্ততঃ স্কুল-মাষ্টারী যখন ক'রবো না, তখন আপাতত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না হ'লেও চ'লবে, আর—' বিজন ব'ল্‌লো, 'আর মেসের ম্যানেজারকেও যখন মাসে মাসে টাকা গুণে দিতে হ'চ্চে না, তখন ট্যুইশনিটাও আপাতত বাদই রইল। আপনি আমার জন্যে যা ক'রেছেন মহিনদা, তার তুলনা নেই। যদি কোনোদিন আপনার কিছুমাত্রও উপকারে আস্‌তে পারি, তবে ধন্য মনে ক'রবো নিজেকে।'

হেসে মহেন্দ্র ব'ল্লো, 'থাক্, হ'য়েছে ; আমিও যথেষ্টই ক'রেছি তোমার জন্যে, আর তুমিও ধন্য হ'য়েছ। এত বিনয় কেন, বলো তো ?'

—'বিনয় নয়, যা সত্য—তার স্বীকৃতি, কৃতজ্ঞতা।'

—'হয় তুমি পাগলের মতো ছেলেমানুষ, নয়তো ছেলেমানুষের মতো উন্মাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর যায়গা পেলেনা, পাগল ছাড়া কি !'

এবারে আর এমন শক্তি রইলনা বিজনের যে, মহেন্দ্রের কথার জবাব দিতে পারে।

একটু বাদেই মহেন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য কি একটা কাজে বেরিয়ে গেল। ফিরে এসে সমস্ত দিনটাই কাটিয়ে দিল সে বিজনকে নিয়ে। ট্রামে বাসে পার্কে ময়দানে—নানা যানবাহনে নানা যায়গায় ঘুরে বেড়ালো তারা, পথে বড় হোটেল থেকে খাবার খেলো, রেস্তোরাঁ থেকে চা খেল, সোডা-ফাউন্টেনে গিয়ে অর্ডার দিল কেক্ আর সরবতের। একটা দিনের তবু যদি বিশেষ স্মৃতি কিছু আনন্দের ধারা হ'য়ে ভবিষ্যতের অজানা সাগরে গিয়ে কূল পায়, জীবনের এই খণ্ড ছিন্ন যাযাবর-বৃত্তিতে সেটুকুও বা কম পরিতৃপ্তির বিষয় কি !

এরপর ত্'টো দিনও কাটলো না। একসময় মাগুরার উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়ে প'ড়লো বিজন। পিছনে প'ড়ে রইল সভ্যতার রাজকুমারী কল্কাতা, ট্রেন এগিয়ে চ'ল্লো সরীসৃপ-গতিতে। ষ্টেশনে 'সি-অফ' ক'রতে এসেছিল মহেন্দ্র ; বিদায়ের শেষ সম্ভাষণে একটি কথাও উৎসারিত হ'য়ে ওঠেনি বিজনের কণ্ঠে, শুধু কৃতজ্ঞতার একবিন্দু অশ্রুই কেবল টল্মল্ ক'রছিল ত্'চোখের কোণে।

বাইশ

আবার সেই নবগঙ্গা-বিধৌত মাতৃস্নেহের মতো মাগুরার নরম মাটি। নবগঙ্গার জোয়ার পারবে না কি এই তাপদগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত জ্বালাকে ধুয়ে নিতে? ধ্যানী বুদ্ধের মতো কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো বিজন চিরপুরাতন নবগঙ্গার চিরমনোহর রূপকে আবার নতুন ক'রে, তা সে নিজেই জান্‌লো না। মনে মনে একবার উচ্চারণ ক'রলো সে: 'আমার সকল অপরাধ যেন তোমার চিরকালের ক্ষমা দিয়ে মুছে নিও মা।' তারপর আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে সোজা বাড়ি এসে মায়ের পায়ের ধূলো কুড়িয়ে নিল সে মাথায়।

নির্ম্মলা কিন্তু বিজনের এই আকস্মিক আবির্ভাব কল্পনাও ক'রতে পারেন নি। প্রথম দর্শনেই তাই আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'লেও আশ্বস্ত হ'লেন তিনি কম নয়। ঘরের শূন্যতা যেন মুহূর্ত্তে আবার ভ'রে উঠলো। আশীর্ব্বাদ ক'রে তিনি ব'ল্‌লেন, 'এতদিনে তবে আস্‌তে পারলি বাবা! কিন্তু এ তোর কোন্ ছিরি হ'য়েছে, বল্ তো? কল্‌কাতার মতো সহরে থেকে কই শরীরের তো কিছু উন্নতি হয়নি তোর?'

মায়ের পাশ ঘেঁষে ব'সে বিজন ব'ল্‌লো, 'কলের দেশ কলকাতা, সেখানে কি আমাদের এই গ্রামের মাটির মতো মমতা আছে যে, শরীর ভালো হবে মা!'

—'তবে এমন কি দরকার ছিল সেখানে গিয়ে এম্‌নি ক'রে থেকে শরীর ক্ষয় ক'রবার! বি-এ তো তুই দৌলতপুরে থেকেও প'ড়তে পারতিস বাবা?' উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলেন নির্ম্মলা ছেলের মুখের দিকে।

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমিই কি জান্‌তুম মা, কল্‌কাতা শুধু ফাঁকির দেশ, উৎকর্ষ নেই কানাকড়িও। আর আমি কল্‌কাতায় যাবো না মা।'

—'তাই যাস্‌নে বাবা! আমিও তবে বাঁচি।' থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'এখন আর এই দেহটার উপর একদণ্ডও ভরসা রাখতে পারছি নে, কখন্ চক্ষু বুজে যাই, সেই শুধু ভয়। তোকে দূরে রেখে আমি যে নিশ্চিন্তেও মরতে পারবো না বাবা।'

মায়ের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বিজন ব'ললো, 'এম্‌নি ক'রে যদি শুধু

মরার কথা ব'লবে, তবে আর এক দণ্ডও আমি এখানে থাকবো না মা। কোথায় তোমার মুখের হাসি দেখে প্রাণটা একটু জুড়োবো, তা নয়—

কথা শেষ হ'লো না বিজনের। ছেলেকে দু' বাহুর মধ্যে টেনে নিয়ে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'এই আমি চুপ ক'রছি বাবা। যা দেখি কেমন পারিস আমাকে ফেলে ?'

বিজন এবারে আর একটি কথাও ব'লতে পারলো না। মায়ের বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ সে নীরবে ব'সে রইল। তারপর ধীরে ধীরে একসময় ব'ল্লো, 'আঃ, তোমার বুকখানির মতো শীতল হ'তো যদি সমস্ত দুনিয়াটা, তবে এম্নি ক'রেই মুখ লুকিয়ে ব'সে থাকতুম মা।'

কথা না ব'লে ছেলের পিঠের উপর দিয়ে শুধু স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন নির্ম্মলা।

এম্নি ক'রেই সারাটা দিন কেটে গেল।

বাড়িতে প্রবেশ ক'রে অবধি অতসীর জন্য অনবরত মনটা খাঁ-খাঁ ক'রছিল বিজনের। অনাথিনী কবে রাজেন্দ্রানী হ'য়ে দেখা দিল একদিন, অনাত্মীয় কবে আত্মার গভীর নিকটে এসে আত্মীয়তম হ'য়ে দাঁড়ালো। অতসীর আবির্ভাবে যত বেশী সংশয় ছিল, এ ঘর থেকে তার বহির্গমনে সংশয়ের চাইতে মনটা আজ হাহাকার ক'রে উঠ্‌ছে বেশী। মানুষ কত পশু হ'তে পারে— যার দ্বারা অতসীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব! বিজন বললো, 'এমন একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল গ্রামে, অথচ এ নিয়ে কারুর মধ্যে কিছুমাত্র অস্থিরতা দেখা গেল না, মা ?'

—'কার লেগেছে যে অস্থির হবে, বাবা ?' থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'গ্রামের কারুর কথা ভাবি না, শুধু ভাবি সেই অভাগিনী মেয়েটার কথা। এমন ভাবে অদৃশ্য হ'য়ে গেল যে, জান্‌তে পর্য্যন্ত পারলুম না।'

—'জান্‌তে পারলে আর এমন কাণ্ড ঘটবে কেন! একেই বলে অদৃষ্ট, অদৃষ্টের উপর মানুষের হাত নেই মা।' থেমে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তুমি লিখেছিলে, ছন্দা এখন এখানেই আছে, কই, তাকে তো সারা দিনের মধ্যে একটি বারও দেখতে পেলাম না ? সেবার শ্যামলকান্তির অসুখের কথা লিখেছিলে, এখন বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে তো ?'

উত্তর দিতে গিয়ে চোখ দু'টি এবারে ছলছল্‌ ক'রে উঠলো নির্ম্মলার। বিজনের তা দৃষ্টি এড়াল না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে নির্ম্মলা ব'ল্লেন,

'এখানেও অদৃষ্টের উপর মানুষের হাত নেই বাবা। মেয়েটার যে এম্‌নি ক'রে কপাল ভাঙবে, এ তো কল্পনাও ক'রতে পারিনি বিজু! জানতুম, তোকে লিখলে ছন্দার এ শোক তুই সহ্য ক'রতে পারবি নে, তাই লিখিনি, লিখতে হাত কেঁপে উঠেছিল।'

মনে হ'লো—কে যেন অলক্ষ্যে থেকে সহসা বিজনের মুখ থেকে সমস্ত কথা কেড়ে নিয়েছে, এমনি অসহায় ও অস্থির দৃষ্টিতে সে যে কতক্ষণ ধ'রে মায়ের সজল চোখ ছ'টির দিকে তাকিয়ে রইল, ব'ল্‌তে পারবো না, তারপর একসময় অস্ফুট কণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'তা হ'লে ছন্দার নির্য্যাতিত জীবনেতিহাসের পুনরাবর্ত্তন ঘটলো, যে তিমিরে সেই তিমিরেই আবার তবে ফিরে আস্‌তে হ'লো ছন্দাকে?'

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'শ্বশুর বাড়ির দিক দিয়ে সমস্ত সম্পত্তিই অবিশ্যি সে হাতে পেয়েছে, কিন্তু যক্ষপুরীতে একা ব'সে সে-সম্পত্তি ভোগ ক'রবার মতো অবস্থা নেই ছন্দার। ছিলেন ওর শ্বশুর ঠাকুর, তিনিও কিছুদিন হ'লো চক্ষু বুজে গেছেন, যাবার আগে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উইল ক'রে দিয়ে গেছেন ছন্দাকে। কিন্তু ওর জীবনে তার মূল্য কতটুকু? এখানে না এলে ছ'দিন বাদে হয়ত ওকেও যমে টেনে নিত। এখানে অঞ্জনার অত্যাচার আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েও ও হয়ত ওর মনের সান্ত্বনা খুঁজে পাবে মাগুরায় থেকে!'

উত্তরে আর কিছু-একটাও ব'ললো না বিজন। ব'ল্‌বার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার। ছ'দিক থেকে ছ'টি বিপরীত ধারা এসে নবগঙ্গায় আজ এক নূতন মোহনা সৃষ্টি ক'রেছে। একদিকে জীবনের সর্ব্বস্ব খুইয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ছন্দা, অন্যদিকে ব্যর্থতার দুঃসহ তাপ নিয়ে এসে দুঃখের শ্বাস টান্‌ছে সে নিজে। নবগঙ্গার শান্ত প্রবাহ পারবে কি এ জ্বালা ধুয়ে দিতে? কিন্তু সংসারে আজ ছন্দার তুলনায় তার নিজের ক্ষতি কতটুকু? বৈধব্যপীড়িত হ'য়ে আজ যে জীবনের সমস্ত আশা, আনন্দ আর সুখকেই বিসর্জ্জন দিতে হ'লো ছন্দাকে। তার কাছে কি সত্যিই আজ দাঁড়াতে পারে তার নিজের হাহাকার? ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে সে, সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই একবার সে মনে মনে উচ্চারণ ক'রলো, 'কি নিষ্ঠুর তোমার বিধান, মানুষের জীবন নিয়ে কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেল্‌ছ তুমি অহরহ!'

পরদিন সকালের দিকে ছন্দা এসে বার ছ'য়েক ঘুরে গেল। ক'দিন ধ'রেই

মন তার কেমন যেন সাড়া দিচ্ছিল—বিজুদা আস্‌বে। তার এসে পৌঁছাবার কথাটুকুও তার অজানা ছিল না। কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও পারছিল না সে বিজনের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে। লজ্জায় নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হ'য়ে যাচ্ছিল সে, দুঃখে ভেঙে প'ড়ছিল শতখানা হ'য়ে। বিজুদাকে গিয়ে মুখ দেখাবার পর্য্যন্ত আজ আর অবস্থা নেই তার। কেমন ক'রে কোথা দিয়ে তার জীবনটা আজ কি হ'য়ে গেল—মাঝে মাঝে এ-কথা ভেবে সে নিজেই শিউরে ওঠে। অথচ বিজুদা আজও তেম্‌নি আছে; তেম্‌নি প্রতীক্ষা, তেম্‌নি সাধনা, তেম্‌নি একা। ছোট বেলার দিনগুলির কথা মনে প'ড়ে চোখের জল ঢেকে রাখ্‌তে পারে না ছন্দা। দু' দু'বার এসে ঘুরে গিয়ে একবারও তাই বিজুদার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না সে।

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'তোর বিজুদা এসেছে, যা—দেখা ক'রে আয়।'

উত্তরে ছন্দা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'আছে তো কিছুদিন, না হঠাৎই আবার কল্‌কাতা ছুটবে?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবারে চোখ দু'টোকে একবার বড় ক'রে তাকালেন নির্ম্মলা: 'আছে রে আছে, কথা দিয়েছে—আর কল্‌কাতা যাবে না বিজু। যেমন দেশ কল্‌কাতা, কাউকে কি সেখানে যেতে আছে মা! শরীর একেবারে আধখানা ক'রে এসেছে বিজু।'

বুকখানি একবার ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো ছন্দার। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'কেন, অসুখ ক'রেছিল নাকি?'

—'বালাই, ষাট, অসুখ কেন ক'রবে? আসলে মেস-হোটেলে থেকে কি কারুর শরীর টেকে!' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'শুধু কল-কারখানা ধোঁকাবাজি —এই নিয়ে কল্‌কাতা সহর, দেখাশুনো ক'রবার মতো নিজের লোক না থাক্‌লে যা হয়।'

কিন্তু তাতেই কি শরীর আধখানা হ'য়ে যেতে পারে! বিজুদার মনেও হয়ত শান্তি ব'লে কিছু নেই! অশান্তি যে মানুষকে তিলে তিলে কিভাবে ক্ষয় করে, তা অন্ততঃ সে তো জানে! কিন্তু যেটুকু জানে, তা মুখ ফুটে প্রকাশ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। নির্ম্মলার কথার উত্তরে তাই কিছু একটাও আর না ব'লে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বিদায় নিয়ে ব'ল্‌লো, 'আসি মাসীমা, পারি তো ওবেলার দিকে আবার আস্‌বো।'

তার এই খাপছাড়া ভাবটা যে নির্ম্মলার লক্ষ্যে না প'ড়লো, তা নয়, কিন্তু

এই নিয়ে কিছু একটাও ব'লতে পারলেন না তিনি। শুধু অপলক নেত্রে কিছুক্ষণ ছন্দার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে থেকে পুনরায় নিজের কাজে মন দিলেন নির্ম্মলা।

কিন্তু বিকেল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছন্দার ধৈর্য্যে কুলোয় নি। দুপুর না গড়াতেই আর একবার এসে ঘুরে গেল সে।

কাছে ডেকে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'আয়, ঘরে এসে ব'স্‌ মা।'

—'ব'স্‌বার কি অবকাশ আছে মাসীমা? বাড়ির মেজাজ আজ উগ্র, এরই মধ্যে দু'পশলা হ'য়ে গেছে। যেতে দেরী হ'লে ঘরে গিয়ে আর টিক্‌তে পারবো না।'—কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব চেপেই কথাগুলো ব'ল্‌লো ছন্দা। পাছে বিজুদার কানে গিয়ে তার উপস্থিতিটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, পাছে হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'য়ে যায় সে তার কাছে,—শুধু এই ভয়, এই লজ্জা আর এই সঙ্কোচ। কথাগুলো তাই একরকম চুপিসারেই ব'ল্‌লো সে।

পাশের ঘরে বিজন কি একখানি বই প'ড়তে প'ড়তে অকস্মাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল, নইলে মায়ের গলার শব্দ থেকেও ছন্দার উপস্থিতিটা অনুমান ক'রে নিতে পারতো। কিন্তু কিছুই সে বোধ ক'রলো না। বরং তন্দ্রার ঘোরে কল্‌কাতার জীবনের ব্যর্থ একটা মুহূর্ত্তকে স্বপ্নে জড়িয়ে কেমন অস্থির হ'য়ে উঠছিল সে নিজের মধ্যে।

সহানুভূতির কণ্ঠে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কেন, হঠাৎ আবার কি নিয়ে মেজাজ উগ্র হ'লো অঞ্জনার? আজকাল তো তাকে ন'ড়ে ব'স্‌তে অবধি হয় না।'

ছন্দা ব'ললো, 'মেজাজ দেখাবার লোক থাকলে ছুতো পাবার অভাব কি মাসীমা! সকাল থেকে সতেরো কাজে ব্যস্ত থেকে কাল রাত্রের বাসি দুধের কড়াটা মাজতে একটু দেরী ক'রে ফেলেছিলাম, এই হ'লো রাগের কারণ; তাই নিয়েই আমার তিন পুরুষের নিকুচি হ'য়ে গেল।'

সহ্য ক'রতে পারছিলেন না নির্ম্মলা, ব'ললেন, 'তুই কিছু ব'ল্‌লি নে?'

—'ব'লবার মুখ কোথায় মাসীমা? ব'ললে যে আগুন লেগে যাবে!' অলক্ষ্যে নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিল ছন্দা।

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'ধিকি ধিকি আগুনের চাইতে একদিনে কিছু একটা প্রলয় ঘটে গেলেই বা মন্দ কি। তুই তো আজ আর সত্যিই জ্বলে পড়িসনি মা!'

—'জলেই তো প'ড়েছি মাসীমা। এ সংসারে একমাত্র আপনার কোলে মুখ লুকোনো ছাড়া আমার কি সত্যিই কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই আছে!'—ব'লতে গিয়ে কণ্ঠ আর্দ্র হ'য়ে উঠলো ছন্দার।

এ কথার উত্তরে কিছু বলা সহজ নয়। কিছুক্ষণ নীরবে থেকে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'যা, ওঘরে গিয়ে তোর বিজুদার সঙ্গে দেখা ক'রে আয়।'

—'এখন থাক্, পরে আসবো।'

—'পরে আস্‌বো কি রে, বিজুর সঙ্গে যে তোর দেখাই হলো না!'

—'সময় তো চ'লে যায়নি, পরেই আসবো মাসীমা, এখন উঠি।'

বাধা দিলেন না নির্ম্মলা।

নীরবে একসময় উঠে প'ড়লো ছন্দা। কিন্তু সত্যিই কি উঠে আস্‌তে ইচ্ছা ক'রছিল তার? মাঝ-উঠোনে একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিল সে: ঘরে থেকে বিজুদা হঠাৎ ডাক্‌লো না তো তার নাম ধ'রে? কান দু'টো মুহূর্ত্তের জন্য একবার অতিমাত্রায় সচেতন হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ধাঁধা নিজের কাছে ধরা প'ড়লো। পা দু'খানিকে আরও দ্রুত এগিয়ে দিল সে এবারে বাড়ির দিকে।

এম্‌নি ক'রে আরও একটা দিন কেটে গেল। বিজনের কাছেও এটা কম বড় প্রশ্ন ছিল না। অথচ সেও সহজভাবে উপযাচক হ'য়ে ছন্দাকে কাছে ডেকে নিতে পারছিল না। অশান্তির আগুন তার বুকেও কি কম জ্ব'লেছে এই নিয়ে!

কিন্তু তৃতীয় দিনে এর একটা আকস্মিক নিষ্পত্তি ঘ'টে গেল। আকস্মিকই বা বলি কেন, সকল লজ্জা সকল দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়ে ছন্দা এসে নীরবে বিজনের দুয়োরের সাম্‌নে দাঁড়ালো। অর্দ্ধ অবগুণ্ঠিত বেশ, পরণের থানে কিছু মলিনতার আভাস সুস্পষ্ট। নিরাভরণ হাতে দরজার একটা পাল্লা ধ'রে আনত-দৃষ্টিতে এসে দাঁড়ালো ছন্দা। ঘরে ব'সে কি একখানি বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় ডুবে ছিল বিজন। নিঃসঙ্কোচেই এবারে তাকে সাড়া দিতে হ'লো। ব'ললো, 'আয়, কাছে আয় ছন্দা।'

কী একটা দুরন্ত আবেগে সমস্তটা দেহ একবার ন'ড়ে উঠ্‌লো ছন্দার। কত দীর্ঘকাল বিজুদার এই কণ্ঠস্বরটুকু শুন্‌তে পায়নি সে। তবু যেন পা চ'ল্‌তে গিয়েও চ'ল্‌তে চাইছে না, কেমন যেন আড়ষ্ট হ'য়ে আস্‌চে পা দু'খানি।

আর একবার ডাক্‌লো বিজন : 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয়, ভিতরে এসে বস্।'

এবারে আর ইচ্ছে ক'রেও দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'লো না ছন্দার; খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাশের তক্তপোষে ব'সে প'ড়েই সহসা হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলো সে। এ কান্না যে কিসের কান্না, বিজনের কাছে তা অস্পষ্ট রইল না। ব'ল্‌লো, 'আমি সব শুনেছি ; তোকে যে সান্ত্বনা দেবো, এমন শক্তি আমার নেই। তবু একটা কথা বলি, পৃথিবীতে কান্নাই কান্নার শেষ নয়, অশ্রুর পরেও কিছু আছে। সংসারে মৃতের মতো বাঁচায় বড় গ্লানি। এম্‌নি ক'রে কেবল চোখের জল ফেলে তেমন গ্লানি যেন কখনও ডেকে আনিস নে, ছন্দা। চোখ মুছে স্থির হ'য়ে ব'স।'

শান্ত হ'তেই চেষ্টা ক'রলো ছন্দা, কিন্তু অশ্রুর ধারা তাতে রুদ্ধ হ'লো না। ব'ল্‌লো, 'তোমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার অবধি আজ আর শক্তি নেই আমার, বিজুদা।'

বিজনের কণ্ঠও কেমন ভারী হ'য়ে উঠেছিল, ব'ল্‌লো, 'নিজেকে এত নীচে নামিয়ে দিলি তুই কেমন ক'রে ?'

—'নীচু তলার মানুষ হ'য়ে উপর তলার স্বপ্ন দেখবো, তেমন অবকাশই বা জীবনে কোথায়!' কতকটা শান্ত হ'য়ে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'মাসীমার কথাটাই সত্যি, পোড়া বাংলাদেশের হতভাগিনী বিধবাদের কোথাও মাথা উঁচু ক'রে কথা ব'ল্‌বার অধিকার নেই। কিন্তু এই জীবনকে, এই বৈধব্যকে সত্যিই কি আমি কামনা ক'রেছিলাম, বিজুদা ? সত্যিই কি কোনোদিন কল্পনা ক'রতে পেরেছিলাম অদৃষ্টের এই পরিহাসকে ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'মানুষের কল্পনা যদি বাস্তবে রূপ নিত, স্বর্গরাজ্য ব'লে কি তবে স্বতন্ত্র কোনো জগৎ থাকৃতো ? পৃথিবী তবে স্বর্গে পরিণত হ'তো, স্বর্গের ঈশ্বর তবে মাটির মানুষের সঙ্গে একত্রে সুখ-দুঃখের খেলা খেল্‌তেন। কিন্তু তাই কি ?'

অতি দুঃখেও একবার মনে মনে হাসি পেলো বিজনের। হাসি পেলো নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা ক'রেই। কাকে সে সান্ত্বনা দিচ্ছে ? তার নিজের সান্ত্বনা কোথায় ? প্রতি মুহূর্তে সে-ই কি কম দগ্ধ হ'চ্ছে ! ভগবান তাঁর স্বর্গের উচ্চাসন ছেড়ে একবারও কি এই ছোট গ্রামখানির ছোট ঘরখানির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন ? যে দাঁড়িয়েছে, সে ছন্দা—

নিজের অদৃষ্টকে যার অদৃষ্ট দিয়ে মাপা যায়, যার হাসি দিয়ে নিজেকে হাসানো যায়।

নিজের প্রসঙ্গটা এবারে চেপে যেতে চেষ্টা ক'রলো ছন্দা. ব'ল্লো, 'কল্কাতার পাট একেবারেই তুলে দিয়ে এসেছ তো বিজুদা ?'

—'আপাতত তাই এসেছি। পারলুম না সেখানে থাক্তে। কল্কাতার মতো শিল্প-নগরে গেলে সব চাইতে বেশী মনে পড়ে আমাদের এই গ্রামকে।' থেমে বিজন ব'ল্লো, 'এতকাল গ্রামে থেকে গ্রামকে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারি নি, কল্কাতায় গিয়ে প্রথম সেই মর্য্যাদা দিতে শিখ্লাম, তাই আবার গ্রামে ফিরে এসেছি। এবারে যদি তার পায়ে একটুকুও ঋণের বোঝা নামাতে পারি!'

—'সেই ঋণ কি আমার জীবনেও কম ভারী হ'য়ে উঠ্লো বিজুদা, তাইতো এখানে এম্নি ক'রে ম'রছি।' ব'লে বিজনের মুখের দিকে একবার মুহূর্ত্তকালের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকালো ছন্দা, তারপর অলক্ষ্যেই কখন্ চোখের পাতা নামিয়ে নিল।

বিজন ব'ল্লো, 'জীবনে একবার যদি আশ্রয় পেলি, তবে তার অমর্য্যাদা ক'রে এম্নি ক'রেই বা এখানে প'ড়ে আছিস্ কেন? কেন দিনরাত উঠ্তে ব'স্তে এমন ক'রে পীড়ন সইছিস্?'

—'আশ্রয় কি সত্যিই আছে, যা আছে—তাকে কি আশ্রয় বলে বিজুদা?' আর্দ্রকণ্ঠে ছন্দা ব'ল্লো, 'অদৃষ্ট মানো তো তুমি? এও আমার অদৃষ্ট; ইচ্ছে ক'রলেই কি এই পীড়নের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারি!'

উত্তর দিতে গিয়ে একবার থামলো বিজন, তারপর সমবেদনার কণ্ঠে ব'ল্লো, 'বাংলার পল্লী-নারী, পল্লীর স্নিগ্ধতার মতই মন তোদের নরম, তোরা কি পারিস বিদ্রোহ ক'রতে? তোরা পারিস নীরবে অত্যাচার সইতে আর আড়ালে ব'সে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে কাঁদতে। এ তোর দোষ নয় ছন্দা, দোষ এই মাটির—দোষ এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলা দেশের।'

চোখ দু'টি ছল্ছল্ ক'রছিল ছন্দার, নিজেকে যথাশক্তি চেপে গিয়ে ব'ল্লো, 'তবু পরজন্ম ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে যেন এই বাংলার গ্রামেই আবার জন্ম নিতে পারি—যেখানে র'য়েছ তুমি, মাসীমা আর কাকাবাবু।'

ম্লান হেসে বিজন ব'ললো, 'তোর কাকিমাও কি নেই সেখানে?'

—'তা থাক।' ব'লে উঠে প'ড়লো ছন্দা, বাড়ি থেকে কম ক্ষণ হ'লো আসেনি সে। গিয়ে আবার কি মূর্ত্তি দেখ্‌তে হয় কাকিমার, কি জানি! ব'ল্‌লো, 'আমি এখন আসি বিজুদা।'

তারপর আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালো না সে।

কিছুক্ষণ উদাসীন দৃষ্টিতে বাইরের পথের দিকে তাকিয়ে রইল বিজন। ক্রমে দৃষ্টি গিয়ে প'ড়লো নবগঙ্গার তীরে। দূরে নয় নবগঙ্গা। জানালা দিয়ে তাকালে স্পষ্ট দেখা যায় তার তীরভূমি। দেখলো—একজোড়া চখা দম্পতি ইতস্ততঃ খেলা ক'রে চ'লেছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক বলাকা, তাদের বিক্ষিপ্ত পক্ষবিস্তারে সাদা হ'য়ে গেছে আকাশখানি। কতক্ষণ যে অন্যমনে ব'সে ব'সে এই দৃশ্য দেখ্‌লো বিজন, ব'ল্‌তে পারি না; তারপর একসময় মাসিকের পৃষ্ঠার মধ্যে আবার মনটাকে ছেড়ে দিল সে।

তেইশ

গ্রামে এসে নিজের ঘরখানিকে নানা গ্রন্থ আর সাময়িক পত্রে সাজিয়ে নিয়েছিল বিজন। নিজের বিক্ষুব্ধ মনটাকে তবু যদি গ্রন্থসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে কিছুটাও অন্ততঃ মুক্তি পাওয়া যায়! কিন্তু মনের মুক্তি যে একেবারেই স্বতন্ত্র জিনিষ, এ কথাটা বোধ করি তার জানা ছিল না। তাই মাঝে মাঝেই গ্রন্থ আর সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উড়ে গেছে অতীতের ছায়ালোকে। দৌলতপুরের সেই হোষ্টেল, কল্‌কাতার সেই মেস, রাসবিহারী এভেন্যুতে কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটওয়ালা রেবাদের বাড়ি। স্মৃতির সমুদ্র-নীর আকণ্ঠ পান ক'রে কখন্‌ নিজের মধ্যেই হত-চেতন হ'য়ে পড়ে বিজন। বড় দুর্ব্বিসহ এই মুহূর্ত্তগুলি। গ্রন্থের শব্দঝঙ্কার তখন মিথ্যা হ'য়ে যায়, সাময়িক পত্রের প্রলুব্ধ কাহিনীর চমৎকারিত্ব তখন কাঁটার মতো এসে গায়ে বেঁধে। ছন্দাকে আজ কাছে পেয়েও কেমন যেন তার প্রতি এক অদ্ভুত সম্ভ্রমে সারা মন তার নুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে নিজের কাছেই প্রশ্ন তুলে ধরে সে: কেন মানুষের আপন ইচ্ছায় বিধাতার এই মাটির সৃষ্টি পূর্ণ হ'য়ে ওঠে না? কিন্তু পৃথিবীর কোনো অভিধানে, কোনো ধর্ম্মতত্ত্বেই কি এ প্রশ্নের কিছু সমাধান আছে? নিজের প্রশ্নে নিজেই জড়িয়ে প'ড়ে কেমন বিভ্রান্ত হ'য়ে যায় বিজন।

মনের এমন্‌ই একটা বিভ্রান্ত মুহূর্ত্তে একসময় ব'সে ব'সে সে চিঠি লিখলো মহেন্দ্রকে। অক্ষয় হ'য়ে রইল মহেন্দ্র তার জীবনে। এমন একটি অদ্ভুত চরিত্রের সংস্পর্শে এসে ভালোয়-মন্দে মিশ্রিত একটি সত্যিকারের মানুষকেই আবিষ্কার করতে পেরেছে সে। কল্‌কাতার জমাখরচের খাতায় এইটুকুই তার লাভ দাঁড়িয়েছে। সেই লাভের উপরে আপনি থেকেই আরও কিছুটা দিয়েছে মহেন্দ্র। সেটুকু তার সহজাত হৃদয়বৃত্তিপ্রসূত ভালোবাসা। চিঠির জবাব দিতে একটা দিনও দেরী করেনি মহেন্দ্র। লিখেছে:

> 'ভাবের জগতে তুমি আমি এক হ'লেও পথ আমাদের বিভিন্ন। জীবনে তুমি আমি একই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও জীবনদর্শন আমাদের স্বতন্ত্র। যে অনুভূতি থেকে আমি জীবনটাকে ফট্‌কা বাজারে বিকিয়ে দিয়েছি, সে অনুভূতি একান্ত আমারই। জীবন

নিয়ে তুমি যেন আমার মতো পাশা খেলো না! কাব্যে আর যা না হোক, চিত্তের আনন্দ আছে। সে আনন্দ থেকে যেন জীবনকে বঞ্চিত কোরোনা।'...

ছন্দাও ইতিমধ্যে একদিন এমনই একটা উক্তি ক'রেছিল। বড় কথা, কঠিন কথা বুঝবার মতো জীবনে সে শিক্ষা পায়নি কোনোদিন। কিন্তু কাব্যের মধ্যে জীবনের যে এক অপরিসীম রসানুভূতি আছে, একথা সে মনে মনে প্রথমদিনই উপলব্ধি ক'রেছিল—যেদিন কলেজ ম্যাগাজিনে নতুন কবিতা লিখে শারদীয় উপহার নিয়ে এসেছিল সে দৌলতপুর থেকে। সেদিন বিজুদাকে ছেড়ে তার কবিতার দিকে লক্ষ্য যায়নি, গিয়েছিল পরে—যেদিন বিজুদার অভাব ঘটলো তার জীবনে।

কিন্তু ছন্দার উক্তির উত্তর খুঁজে পায়নি বিজন। উত্তর সে নিজের কাছেই দিতে পারেনি। একদিন স্বপ্ন ছিল তার—বড় কবি হবে সে, বড় শিক্ষাব্রতী হ'য়ে দেশের আদর্শ হ'য়ে দাঁড়াবে। মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল সে মাকে। কর্পূরের মতো সে সঙ্কল্প অলক্ষ্যেই কখন্ উড়ে গেল। আজ শুধু হাহাকার আর আত্মানুসন্ধান।...

বিজনের গ্রামে আসার খবর পেয়ে পরের দিনই চাষিপাড়ার তসর আলীরা এসে দেখা ক'রে গিয়েছিল। আড়ালে থেকে ফসলের কথাটা একবার উল্লেখ ক'রেছিলেন নির্ম্মলা, কিন্তু সেদিকে কান দেয়নি বিজন। এবারে সে নিজেই উদ্যোগি হ'য়ে চাষিদের সাথে ক্ষেত-খামারের তদারকে লেগে গেল। চাষিদের সাথে ব্যবধান রচনা ক'রে তালুকদারী সম্মানের বালাই নিয়ে বেঁচে থাকা ঘৃণ্য-জীবনের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিজন অন্ততঃ সে-ইতিহাসের প্রতিলিপি থেকে দূরে থাকতে চায়। চাষির সরিক-জন হ'য়ে তাদের সঙ্গেই আনন্দে কাটুক তার আগামী দিনগুলো। তাতে যে নিজের ভাগের অন্নে অন্ততঃ টান প'ড়বে না, একথা নিশ্চিত।

চাষিদের মধ্যে এবারে এক নূতন চেতনা দেখা দিল। তসর আলী ব'ল্লো, 'এ যে আমরা হাতে আশমান পেলাম দাদাবাবু। সংসারে নেকা-পড়ার গুণই আলাদা। নেকা-পড়া জান্লি মানুষ দেব্তা হয়। তুমি আমাদের দেব্তা দাদাবাবু।'

বিজন ব'ল্লো, 'মানুষ মানুষই, সে দেবতাও নয়, পশুও নয়। ধর্ম্মে আছে

—সব মানুষই সমান। তোমার আর আমার মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই তসর।'

এ আজ নতুন কথা শুন্‌লো তসর আলী। এতদিন তারা জেনে এসেছে—মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা উপরে খোদাতালা আর নীচে জমিদার ও তালুকদার মহাজন। তারা সেবাইত মাত্র, অধীনস্থ প্রজা আর আজ্ঞাবাহী গোলাম। তাদের সঙ্গে মালিকের সম্পর্ক শুধু খাজনা আর ফসল নিয়ে। জমিতে বুকের রক্ত ঢেলেও জমি তাদের অধিকারে নয়, এক্তিয়ারে মাত্র। পরের ছেলেকে বুক দিয়ে মানুষ ক'রবার মতো সম্পর্ক তাদের জমির সঙ্গে। যথাসময়েই বিনা নোটিশে মালিকের জিনিষ মালিকের হাতেই ফিরে যায়। তারা কৃপার ভিখারী ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু মানুষে মানুষে এই সমতার কথা শুন্‌লো সে আজ এই প্রথম। তবু কণ্ঠে সংশয়ের সুর টেনেই সে ব'ল্‌লো, 'পার্থক্য কেন নেই দাদাবাবু, তুমি আমি কি এক হ'লাম? আমরা ছোট নোক, মুখ্য চাষা, তোমার পায়ের যুগ্যিও নই।'

—'ছিঃ, এম্‌নি ক'রে ব'ল্‌তে নেই তসর।' সস্নেহ কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'মানুষ মানুষের দাস নয়, মানুষ তার অবস্থার দাস। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা এমন যে, কেউ দুরবস্থায় প'ড়লে সবল এসে দুর্ব্বলের ঘাড়ে চেপে বসে। এম্‌নি ক'রে চেপে চেপেই সমাজে এক শ্রেণীর বিত্তশালীর সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু এ যে কত বড় মিথ্যা আর কত বড় অন্যায়, সে কথা ব'লবার নয়। আসলে সৃষ্টির দিক থেকে কোনো মানুষই কোনো মানুষ থেকে পৃথক নয়। আমাদের তেমন শিক্ষা নেই ব'লেই এতকাল আমরা ভুল ক'রে এসেছি তসর।'

তসর আলীর মুখে এবারে আর কথা যোগালো না। বহুক্ষণ ধ'রে অভিভূত দৃষ্টিতে সে বিজনের মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় মাথা নিচু ক'রে বিনীতকণ্ঠে ব'ল্‌লো, 'আমার মোনাকে কিছু নেকাপড়া আর বিদ্যেবুদ্ধি শিখিয়ে একটু মানুষ ক'রে দেও, দাদাবাবু। একটা মাত্র ছাওয়াল, কিছু নেকা-পড়া শেখে, এই ইচ্ছে।'

উৎসাহিত কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'শেখাবো বৈ কি, নিশ্চয়ই শেখাবো। শুধু মোনা নয়, মোনার মতো আরও যারা গ্রামে ছড়িয়ে র'য়েছে, তারা সকলেই যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'তে পারে—সেই ব্যবস্থাই ক'রবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তসর।'

উত্তরে কৃতজ্ঞতাসূচক কি একটা ব'ল্‌তে গিয়েও ব'ল্‌তে পারলো না তসর আলী। কণ্ঠে তার ভাষা দেননি খোদাতালা। মনে মনে সেই খোদাতালার কাছেই একবার সে দীর্ঘজীবন কামনা ক'রলো বিজনের জন্য।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'জমির দিকে তাকালে আজ কান্না আসে। কাঠফাটা রোদে খাঁ খাঁ ক'রছে জমি। সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি না হ'লে এ জমি যে রাক্ষসী হ'য়ে আমাদেরই গিলবে। তাতে তুমি আমি কেউই বাঁচবো না তসর। ক্ষেত নিয়ে যাদের খেটে খেতে হয়, তাদের অন্ততঃ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এ কাজে হাত দেওয়া উচিৎ।'

—'এখানে কেউ কি কারুর কথা শোনে দাদাবাবু যে, সেচের ব্যবস্থা ক'রবে!' তসর আলী ব'ল্‌লো, 'বুঝোয় বা কে, কাজই বা করে কে? মালিক তার প্রয়োজন মিটলেই ঘরে গিয়ে খিল আঁটেন; গরীব চাষাদের ক্ষ্যামতা কি গাঁটের পয়সা খরচ ক'রবার। মেহনতিই শুধু সার।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'মেহনৎ মিথ্যা যায় না, মেহনতেরও মূল্য আছে। সবাইকে বুঝিয়ে সেই মূল্য আদায় ক'রে নিতে হয়, তাতে আর কিছু না হোক—অন্ততঃ পরনের কাপড় আর পেটের দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা ঠিক থাকে। কাজের কথা বুঝিয়ে ব'ল্‌লে মালিকেরাই বা গররাজি হবেন কেন!'

কিন্তু এ 'কেন'র উত্তর তসর আলীও জানে না। সে বাড়ুজ্জেদের জমি ভিন্ন আরও দু'তিন জন মালিকের জমিতে ভাগ-চাষের কাজ করে। কিন্তু ঐ চাষ পর্য্যন্তই, জমির উন্নতির কথা নিয়ে মালিকের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে কোনোদিন সাহস হয়নি, আজও হয় না। তাতে নিজের অদৃষ্টের যে দুঃখ, তাকে একান্ত 'নসিব' ব'লেই মেনে নিতে হ'য়েছে। বিজনের কথায় আজ তাই প্রাণে বড় সাড়া পেলো সে। ব'ল্‌লো, 'এ ব্যবস্থাও তোমাকেই ক'রতে হবে দাদাবাবু। তোমাকে দেব্‌তার মতো পেয়েছি, এবারে যদি আমাদের নসিবের দুঃখ কিছু ঘোচে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'সংসারে কেউ কারুরটা ক'রে দিতে পারে না তসর। প্রত্যেকেরই পেটের চিন্তা আছে, সেই চিন্তাই তাকে কাজে উৎসাহ দেয়। মালিকদের সঙ্গে কথা ব'লে এ ব্যবস্থা তোমাদের নিজেদেরই ক'রতে হবে। প্রয়োজন হ'লে আমি সাহায্য ক'রবো।'

শেষ পর্য্যন্ত তসর আলীরাই কয়েকজন উদ্যোগী হ'য়ে মালিকদের সাম্‌নে গিয়ে আবেদন নিয়ে দাঁড়ালো। বলা বাহুল্য, আবেদনে ফল হ'লো, এবং

হ'লো অবশেষে বিজনের মধ্যস্থতাতেই। চাষিদেরই লাভ হ'লো তাতে। প্রয়োজনীয় ফসলের সময় ভিন্ন বছরের বাকী সময়টা মালিকদের ঔদাসীন্যে অধিকাংশ জমিই অনাবাদী প'ড়ে থাক্‌তো। তাতে মালিকের ঘরে টান না প'ড়লেও টান প'ড়তো চাষিদের। এ সময়টা অন্য কাজ ক'রে তাদের পেটে খেতে হ'তো। এবারে নতুন জল-সেচের ব্যবস্থায় বারোমাসি একটা পাওনা দাঁড়িয়ে গেল তাদের। দারিদ্র্যের মধ্যে কিছুটা স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখে বাঁচলো তারা। সারা চাষিপাড়ায় ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল বিজনকে নিয়ে। সবাই যে তারা তার এক্তিয়ারের লোক, তা নয়; কিন্তু সকলের মঙ্গল যে বিশেষ একজনকে কেন্দ্র ক'রে, এবং সেই বিশেষ একজন যে তাদের কেউ না হ'য়েও সকলের চাইতেই আজ আপন, এই কথাটা ভেবেই বিজনের প্রতি তাদের হৃদয় আপনি থেকেই শ্রদ্ধায় নুয়ে প'ড়লো।

এরপর বোধ করি সপ্তাহখানেক'ও কাটলো না। চাষিপাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে নতুন এক পাঠশালা খুলে ব'স্‌লো বিজন। সমস্ত চাষিদের মধ্যে সেদিন কি উৎসাহ! আনন্দের বন্যা ব'য়ে গেল ছেলেমেয়েদের মধ্যে। সবার হাতে হাতে শ্লেট-পেন্সিল, প্রথম ভাগ আর ধারাপাত। সংখ্যায় তারা একশোর কম হবে না। বিজন গুরু হ'য়ে ব'স্‌লো শাসনের বেত হাতে নিয়ে নয়, স্নেহের অঙ্গুলি প্রসারিত ক'রে। চালাঘর নেই, চাউনি নেই, গাছের ছায়ার নীচে সবুজ ঘাসের গালিচায় রচিত আসন। দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় ক'রে ব'সে সুর ক'রে প'ড়তে সুরু ক'রে দিল প্রথম ভাগের বর্ণানুক্রমিক ফলা-বানান আর কড়াকিয়া-গণ্ডাকিয়া। শ্লেটের বুকে ফুটে উঠ্‌লো অপটু হাতের অক্ষম অক্ষরগুলো। সস্নেহ কণ্ঠে গুরু মন্ত্র দিল: 'বলো না ব'লে কেউ কারুর জিনিষ নেবো না, কেউ কাউকে আঘাত ক'রবো না, মিথ্যা বা কটু কথা ব'ল্‌বো না, গুরুজনকে ভক্তি ক'রবো, পরের সাহায্যে এ জীবন ব্যয় ক'রবো, নিজের মতো ক'রে ভালো বাস্‌বো সকলকে; উঁচু নীচু ব'লে কোনো জাত নেই, সকলেই আমাদের আপন, সকলেই আমাদের ভাই।'

একসঙ্গে শতকণ্ঠে উচ্চারিত হ'য়ে উঠ্‌লো এই মন্ত্র, প্রথম সূর্যোদয়ের এই জীবনবেদ। তারপর দল বেঁধে সকলের একসঙ্গে ছুটি। মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস চেপে নেয় বিজন।—এরাই ভবিষ্য জাতির মেরুদণ্ড। বলা যায় কি—এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোনো নেপোলিয়ান, লেনিন কিম্বা রবীন্দ্রনাথ। দেশকে এগিয়ে নেবে এরা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে আর বিজ্ঞানে। কৃষিলক্ষ্মীর

অমৃত আশীর্ব্বাদে দেশ হবে কিষাণ-রাজ্য। মাটির মানুষ দু'টো ধানের জন্য সেদিন আর বুক ফেটে কাঁদবে না ; দেশ হবে শান্তির অমর তীর্থ।

আত্মবিস্মৃতির মুহূর্ত্তে মাঝে মাঝে নতুন এক উজ্জ্বল জীবনের ফতোয়া এসে বিহ্বল চিত্তকে উদ্বুদ্ধ ক'রে যায়। নতুন ক'রে তখন মাথা তুলে দাঁড়াতে সাধ যায় বিজনের।

কিন্তু গ্রামের চক্রবর্ত্তী-বাচস্পতিদের কাছে বিষয়টা কেমন যেন বড় বাড়াবাড়ি ব'লে বোধ হ'লো। তার সঙ্গে এখানকার ভীষণ এবং সাহসী পুরুষ হরি মুখুজ্জে ও তাঁর বিধবা পিসী সুখদা ঠাক্‌রুণের যোগাযোগটাও নিতান্ত বহিরাঙ্গিক রইল না। সুখদা ঠাক্‌রুণকে মেয়ে মহলে গ্রামের গেজেট ব'লে জানে সকলে। পাড়া চড়িয়ে সে-ই যখন-তখন এক-একটা উদ্ভট আবিষ্কার নিয়ে গলা বাজিয়ে বেড়ায়। হরি মুখুজ্জেও তাতে কম যান না। পিসী-ভাইপোতে একেবারে রাজজোটক। তারাই সারা গ্রাম ভ'রে ছি-ছি ক'রে বেড়ালো। বাড়ুজ্জেদের ছেলের শেষে এই কাণ্ড, কল্‌কাতা থেকে শেষটায় কেউকেটে হ'য়ে এসে ছোটলোকদের নিয়ে মেতে উঠেছে।

কিন্তু সংসারে কে ছোটলোক, কে ভদ্রলোক—তা কারুর গায়ে লেখা থাকে না। তা নিয়ে জবাব দেওয়াও বাতুলতা।...

একসময় নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'না পারলি কল্‌কাতা থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসতে, না রাজি হলি এখানকার মাষ্টারী নিতে। শেষ পর্য্যন্ত এ তোর কী খেয়াল হ'লো বাবা? চাষির ছেলে চাষি হ'য়েই একদিন হালচাষ ক'রবে, মগজে কতকগুলো বইয়ের বিদ্যে নিয়ে ওরা কি ক'রবে বল্ তো?'

কথাটা বড় আঘাত ক'রলো বিজনকে। একবার ব'লতে গেল, 'ও তুমি বুঝবে না মা।' কিন্তু যত স্পষ্ট ক'রে সে ব'লতে চাইল কথাটা, তত স্পষ্টভাবে জিহ্বায় এলো না। থেমে ব'ললো, 'আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই ছেলে-মেয়ে, আর ওদের ঘরের ছেলেমেয়েরা কেউ নয় ; মা হ'য়ে এমন কথাও তুমি ভাবতে পারো?'

ছেলের মনের কথাটা বুঝতে এতটুকুও বেগ পেতে হ'লো না নির্ম্মলাকে। ব'ললেন, 'আমি কি তাই ব'লেছি বিজু?'

বিজন সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিজের কথাটারই পুনরাবৃত্তি ক'রে ব'ললো, 'ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের পিছনে অর্থ ব্যয় ক'রবারও যেমন মানুষ আছে, শিক্ষকেরও তেম্‌নি অভাব নেই তাঁদের। কিন্তু হতভাগ্য এই

দরিদ্র চাষিদের কথা একবার ভেবে দেখ তো মা. ওদের না আছে অর্থ, না আছে মানুষ হ'য়ে উঠবার কোনো পথ। ফ্রান্সের মতো রাশিয়ার মতো দেশে শুনতে পাই চাষিরা পর্য্যন্ত সংবাদপত্র পাঠ ক'রে জগতের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা ক'রে চলে। আর হতভাগা এই ভারতবর্ষ—এই বাংলা দেশ, এখানে আজ পর্য্যন্ত ভদ্রলোকেরই কিছু একটা শিক্ষার মান দাঁড়ালো না. নীচুতলার মানুষদের কথা তো স্বতন্ত্র। অথচ ওরা শিক্ষিত হ'য়ে সমাজের ভালোর সঙ্গে নিজেদের ভালোর কথা বুঝতে শিখলে গোটা দেশেরই যে তাতে উন্নতি! চাষির ছেলে চাষি হ'য়েই হাল চাষ ক'রবে, কিন্তু সে আর এক মানুষ: আজকের চাষি আর সেদিনের চাষিতে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমি শুধু সেই সুরটাই ধরিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রছি মা। এ পোড়া বাংলা দেশে ওদের শিক্ষার কথা ক'জনেই বা ভাবে বলো?'

বিষয়টাকে কিন্তু এত গভীরভাবে আগে চিন্তা ক'রতে যাননি নির্ম্মলা। সুখদার গলাবাজিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছিলেন তিনি। এবারে ছেলের জ্ঞান ও নতুন এই সমাজ-শিক্ষার প্রতি তার আন্তরিকতার কথা ভেবে সারা হৃদয় তাঁর এক অপরিসীম মুগ্ধতায় ছেয়ে গেল। বিজনের কথা থেকে এটুকু অন্ততঃ তিনি বুঝে নিতে পারলেন যে, যে কাজে সে হাত দিয়েছে- তার মধ্য দিয়েই একদিন সে অমর হ'য়ে উঠবে। মা হ'য়ে সন্তানের সেই অমরতা যে নির্ম্মলাও চান। মনে মনে বিজনকে আশীর্ব্বাদ ক'রে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'সারা দেশ যেখানে পিছিয়ে আছে, সেখানে সামান্য এই গ্রামের উন্নতিতে কতটুকুই বা কাজ হ'বে বাবা?'

—'অনেক কাজ হবে মা।' বিজন ব'ল্লো, 'একটা গ্রামের উন্নতি--- সেই কি কিছু কম! এর আলো ছড়িয়ে প'ড়বে সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে।'

উত্তরে কিছু একটাও না ব'লে শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্ম্মলা। একটা কথা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, গ্রামের মাটির বুকে ধ'রে রাখলে আজ হয়ত এতখানি জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারতো না বিজন; এ জ্ঞান, এ বুদ্ধিবৃত্তি তার দৌলতপুর আর কল্‌কাতার জীবনেরই সঞ্চয়। ডিগ্রী নিয়ে ঘরে ফিরতে না পেরেছে, না পারুক্; কিন্তু যে মাথা নিয়ে ফিরেছে সে, সেই মাথাই বা এ গাঁয়ে ক'টা আছে! হরি মুখুজ্জেরা যে তার পায়ের যুগ্যিও নয়। তাদের মুখ একদিন আপনি থেকেই বন্ধ হবে।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'তোমার ইচ্ছে ছিল, আমি স্কুল-মাষ্টার হই মা, তোমার ইচ্ছাই আমি পূর্ণ ক'রেছি। পুরনো স্কুলে ত্রিশ টাকা মাইনেয় আমি যে ছাত্র পেতাম, আমার এই নতুন পাঠশালায় বিনে মাইনেয় তার চাইতে ঢের বড় ছাত্র পেয়েছি। ওরা সোনা হ'য়ে একদিন আমাকে সোনা উপহার দেবে দেখো।'

—'তাই যেন হয় বাবা। ভগবান তোর মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। সংসারে মায়ের আশীর্ব্বাদের যদি কিছুমাত্রও জোর থাকে, তবে আমি শুধু এই আশীর্ব্বাদই তোকে করি বাবা। তুই যে আমার সাত রাজার ধন, আমার চোখের মণি!' ব'লে আর অপেক্ষা ক'রলেন না নির্ম্মলা, কোথায় একদিকে নিজের কাজে চ'লে গেলেন।

বিজন কতক্ষণ যে সেই দিকে তাকিয়ে ব'সে রইল, ব'লতে পারবো না। পরে কাগজ কলম টেনে নিয়ে কি একটা লিখতে স্থরু ক'রে দিল। পাঠশালা প্রতিষ্ঠা ক'রে তার কাজ বেড়েছে বহু। নতুন জগতে নতুন মানুষ স্বষ্টির ডাক শুনতে পেয়েছে সে, সে ডাককে কি উপেক্ষা করা চলে?

চব্বিশ

একসময় ছন্দা এসে ব'ল্‌লো, 'আমাকেও তোমার পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে নাও না বিজুদা! নিজেকে নিয়ে দিন আর কিছুতেই কাটে না। সকাল থেকে একই কাজের মধ্যে একই ঝক্‌মারী নিয়ে মানুষ কতক্ষণ পারে বলো? জীবনে লেখাপড়াও তো তেমন কিছু শিখিনি, তোমার গুরুগিরিতে নতুন ক'রে হাতেখড়ি দিতেও আনন্দ।'

ছন্দার মুখের দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিজন ব'ল্‌লো, 'আনন্দের পথের সন্ধান এতদিনে যাহোক্ তবে কিছু একটা পেলি! হাসালি তুই ছন্দা। গুরুবাদে এই অচলা ভক্তি এযুগে অচল। গুরুবাদ ক'রে-ক'রেই গোটা দেশটা ধর্ম্মান্ধতায় ম'জে আছে। তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে মানুষের মুক্তি নেই। পাঠশালায় আজ তোকেই প্রয়োজন ছিল সব চাইতে বেশী। অধ্যয়নের জন্যে নয়, অধ্যাপনার জন্যে। আমার গুরুগিরির গুরুত্ব সেখানে কিছুমাত্র নেই। নতুন মানুষ সৃষ্টির কাজে সেখানে সবাই আমরা এক।'

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'আমি ক'রবো অধ্যাপনা, মাষ্টারণী হবো আমি! তবেই হ'য়েছে। এ তো দেখছি আরও বেশী হাসালে তুমি বিজুদা!' ব'লে নিজেই একবার সকৌতুকে হেসে উঠলো ছন্দা।

গ্রামে এসে অবধি আজ এই প্রথম স্বাভাবিকভাবে হাসতে দেখলো ছন্দাকে বিজন। বেশ লাগলো। তবু যদি হাসির মধ্য দিয়ে নিজেকে কিছুটাও মুক্তি দিতে পারে ছন্দা! ব'ল্‌লো, 'দেশ যদি আশা করে, তবুও নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাক্‌বি?'

ছন্দা ব'ল্‌লো, 'দেশ কোথায়, দেশকে তো চিনতে পারিনি বিজুদা! দেশ ব'ল্‌তে যা চিনেছি, তা এই কাকিমার সংসার। সংসার যা আমার কাছে আশা করে, তা-ই যে আজ অবধি দিয়ে উঠ্‌তে পারলুম না। পদে পদে নিজের অযোগ্যতা নিজেকে এসে বেঁধে। তার পরেও তুমি ব'ল্‌ছো দেশ, দেশের আশা?'

বিজনকে এবারে থাম্‌তে হ'লো, হার স্বীকার ক'রতে হ'লো তাকে। ব'ল্‌লো, 'এম্‌নি ক'রে ব'ল্‌বি জানলে আমিই কি ব'লতুম তোকে মাষ্টারীর কথা! তোর মতো মেয়েদেরই তো আজ দেশের কাজে এগিয়ে আসা উচিৎ।

তাতে সংসারও রক্ষা পায়, দেশও প্রাণ পেয়ে বাঁচে। কিন্তু জানি, এখানে তা হবার নয়; এখানে পদে পদে সমালোচনা, পদে পদে কান-লাগানি, পদে পদে বিরুদ্ধ আচরণ। গ্রামকে ভালোবেসেও গ্রামের এই কুশ্রীতার জন্যে ঘৃণায় ম'রে যাই।'

প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে ছন্দা ব'ল্‌লো, 'তা যাক্‌গে। কিন্তু তুমি যেভাবে মাঠের কাজে চাষিদের সঙ্গে মিশেছ, তাতে যে শেষ পর্য্যন্ত শরীরটাকেও মাটি ক'রে দেবে বিজুদা! রোদ নেই, বৃষ্টি নেই; দিনরাত ওদের সঙ্গে তুমি লেগে আছ। এম্‌নি ক'রে তোমার কিছু একটা বড় রকমের অসুখ হোক্‌, এই কি তুমি চাও?'

—'অসুখ কেন হবে রে! মনে নেই বাল্যশিক্ষার সেই প্রথম মন্ত্রঃ পাঁচজনে পারে যাহা—আমিও পারিব তা—পারিব না একথাটি বলিও না আর! সব কিছুই অভ্যাসের অধীন, একবার অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে আর তা নিয়ে সংশয় থাকে না।' ব'লে মুখ টিপে একবার হাস্‌লো বিজন।

ছন্দা ব'ল্‌লো, নীতিকথা তোমার রাখো। ও নীতির সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি মেলে না। আমার মাথা খাও তুমি বিজুদা, বলো—এম্‌নি ক'রে এত বেশী পরিশ্রম তুমি ক'রবে না?'

—'পাগ্‌লী আর কাকে বলে!' স্মিতহাস্যে বিজন ব'ল্‌লো, 'পরিশ্রম ক'রবো না, তবে কি ননীর পুতুল হ'য়ে ঘরে ব'সে থাক্‌বো! জানিস্‌, মাঠে গিয়ে চাষিদের পাশে দাঁড়াতে ওদের মধ্যে আজ কতখানি কর্ম্মস্পৃহা আর উৎসাহ বেড়েছে! মালিক আর প্রজার মধ্যে পার্থক্যের বেড়া ভেঙে না দিলে জাতীয় স্বার্থে আঘাত লাগে। মানুষ হ'য়ে কখনও সেই আঘাত কি চোখের সাম্‌নে সহ্য করা যায়? তুইই বল্‌ না?'

—'কিন্তু মানুষের নিন্দা, তারও কি কোনো মূল্য দিতে চাও না তুমি?'

—'না, সত্যিই চাই না। নিন্দার দিকে কান রাখলে মন কখনো কাজের পথে এগোয় না। কাজের দ্বারাই নিন্দাকে জয় ক'রে নিতে হয়।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব'লেই নিন্দে করে; তাদের চোখ যদি খুলে দেওয়া যায়, তবে আজকের মূর্খতায় সে-নিন্দা একদিন তারাই নিজেদের ক'রবে। এ বিশ্বাস না রাখলে হয়ত এম্‌নি ক'রে কাজে এগিয়ে যেতে পারতুম না। অসুখ যদি করেই, তোর ঐ স্নিগ্ধ হাতের সেবা কি পাবো না, ব'লতে চাস?'

লজ্জা পেলো এবারে ছন্দা। ব'ল্লো, 'এ হাতের সেবা পেলেই তুমি রোগ-মুক্ত হবে, এ বিশ্বাস তোমার কোত্থেকে এলো ?'

—'যে বিশ্বাসে একদিন সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাস্তে পেরেছিলাম তোকে, ভালোবাসা পেয়েছিলাম তোর।'—চোখের নরম দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য একটা উজ্জ্বল আভা খেলে গেল বিজনের।

এবারে আর এমন শক্তি রইল না ছন্দার যে, স্বাভাবিক ভাবে বিজনের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়। লজ্জায় সে নিজের মধ্যে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল। ব'ল্লো, 'এমন ক'রেও এ কথা মুখে আন্তে হয়! ছিঃ।' তারপর আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা না ক'রে বিদায় নিয়ে ব'ল্লো, 'আসি এখন বিজুদা, পারো তো আমার কথা রেখো।'

উত্তরে বিজন স্পষ্ট ক'রে ব'ল্তে পারলো না যে 'রাখ্বো'। শুধু ছন্দার যাত্রাপথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বুকের মধ্যে একটা ভারী নিঃশ্বাস চেপে নিল।

ছন্দা ততক্ষণে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে উঠোনের সীমা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

এরপর বোধ করি একটা বেলাও ভালো ক'রে কাটলো না। অনিশ্চিত একটা ঘটনায় বাতাস হঠাৎ কেমন মন্থর হ'য়ে উঠলো। একসময় অঞ্জনা এসে দাঁড়ালেন নির্ম্মলার দুয়োরের সাম্নে। তিনি যে গল্প ক'রতে এলেন, তা নয় ; গল্পের পাট চুকে গেছে দীর্ঘকাল, তা নিয়ে তাঁর লজ্জা বা কুণ্ঠা নেই। মনের কিছু-একটা জ্বালা মেটাতেই আজ তাঁর এই আকস্মিক আবির্ভাব। হাঁক দিয়ে ব'ল্লেন, 'বলি বিজুর মা ঘরে আছ ?'

সাড়া দিয়ে নির্ম্মলা এসে সাম্নে দাঁড়ালেন : 'অঞ্জনা যে, কি মনে ক'রে হঠাৎ ? এস, ঘরে এস।'

কিন্তু দাওয়া ছেড়ে এক পা-ও আর ন'ড়লেন না অঞ্জনা। ব'ল্লেন, 'থাক, এই বেশ আছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তও ঘরে তিষ্ঠোতে দেবে না ?'

—'কেন, হঠাৎ এমন কি ক'রলাম যে, তিষ্ঠোনো তোমার দায় হ'য়ে উঠেছে !' বিস্ময়ের দৃষ্টি তুলে মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন নির্ম্মলা।

অঞ্জনা ব'ল্‌লেন, 'দায় হ'য়ে উঠেছে ভিন্ন কি ! ভাত কাপড় দিয়ে মেয়ে পুষবো আমি, আর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কানে তার মন্ত্র প'ড়ে দিয়ে গাল-গল্পে আট্‌কে রাখ্‌বে তোমার বাড়িতে, এ কোন্‌ সৃষ্টিছাড়া অলক্ষুণে ব্যাপার ? বলি, চক্ষু লজ্জাটাও তো আছে, না তার মাথাও খেয়েছ বিজুর মা ?'

জবাব দিতে গিয়ে এবারে থাম্‌তে হ'লো নির্ম্মলাকে। এতখানি আশা করেননি তিনি অঞ্জনার কাছ থেকে। অঞ্জনা আজ এ কী কথা ব'লে তাঁকে আঘাত ক'রতে চাইছে ? থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বড় গলা ক'রে একথা শোনাতেই আজ তবে বাড়ি ব'য়ে এসেছ ? তোমার ঘরের মেয়ে হ'লেও ছন্দা আমাদের সকলেরই আদরের। এ আজ নতুন নয়। কানে মন্ত্র প'ড়ে দেবার কথাই বা আজ এই প্রথম উঠলো কি ক'রে ? কি মন্ত্র দিয়েছি, ব'ল্‌তে পারো ?'

গলা এতটুকুও খাদে নামালেন না বা দ্বিধা ক'রলেন না অঞ্জনা, যেম্‌নি কাংসকণ্ঠে তিনি এতক্ষণ ব'লে যাচ্ছিলেন, তেম্‌নি স্বরেই ব'ল্‌লেন, 'এর আর ব'লবার কি আছে ! মেয়েটা দিনরাত আমার হাড়-মাস চিবিয়ে থাক্‌—এই তো তোমরা চাও। বলি, এত যদি দরদ, তবে রাখলেই তো পারো নিজের ঘরে এনে, আমারও আপদ চোকে, অন্নও বাঁচে।'

—'এ তুমি কি ব'ল্‌ছো অঞ্জনা ?' নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না নির্ম্মলা ; ব'ল্‌লেন, 'ওর বয়সী একটা বিধবার একবেলা চাট্টি ভাত খেতে ক'টাকাই বা তোমাকে ব্যয় ক'রতে হয় মাসে ? তাই নিয়ে খাবার খোটা দিচ্ছ ? ছিঃ, ছিঃ, তুমি না মা, তুমি না হিঁদুঘরের বউ, এরপর তোমার যে নরকেও স্থান হবে না অঞ্জনা ! মানুষকে এম্‌নি ক'রে কখনও খাবার খোটা দিতে হয় ? সংসারে যে যার নিজের ভাগ্যে খায় ; দুনিয়ায় কে কাকে খাওয়াতে পারে, বলো ? আজ না হয় কপালই ভেঙেছে মেয়েটার, একদিন তো রাজেন্দ্রানী হ'য়েই শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ব'ল্‌তে গেলে আজই বা ওর অভাব কি ! মানুষের দুরদৃষ্টের সুযোগ নিয়ে এমন ক'রেও কটূক্তি ক'রতে হয় !'

রাগে এতক্ষণ জ্ব'লে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা। ব'ললেন, 'থাক্‌, হ'য়েছে ; বাইরে থেকে এমন ধর্ম্মোপদেশ না দিলেও চ'ল্‌বে। যার পুড়ুনি, সে ছাড়া বুঝবে কে ? ঐ রাজেন্দ্রাণী রাজেন্দ্রাণী ক'রেই তো মেয়েটার মাথা খেলে তোমরা। কথায় আছে—মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর, কেঁদে মরে পাড়া-পড়শি

তোমাদের হ'য়েছে তাই। এম্‌নি ক'রে মুখ-মিষ্টি দেখিয়ে তোমরা আর আমার পেছনে লাগবে না, এই ব'লে দিলুম বিজুর মা। তাতে যে কিছু সুবিধে ক'রতে পারবে; তা মনে কোরো না।' ব'লে আর একমুহূর্ত্তও দাঁড়ালেন না অঞ্জনা, সমস্ত দেহের উপর দিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গী খেলিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে তিনি চোখের পলকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

নির্ম্মলা যে কতক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, ব'লতে পারি না। আত্মধিক্কারে সমস্ত মন তাঁর কেবলই রি-রি ক'রে উঠছিল। বিজন এ সময়ে ঘরে ছিল না, থাকলে হয়ত আকস্মিক এই ইতিহাস অনেকখানি বেঁকে যেতো। নিজের কানে শুনে অঞ্জনার এ ঔদ্ধত্য সে বরদাস্ত ক'রতে পারতো না। কিন্তু নির্ম্মলাকে নীরবে কান পেতে শুনতে হ'লো। যাকে কেন্দ্র ক'রে এত কথা, সেই অভাগী মেয়েটার জন্য দুঃখে একবার বুকখানি হু-হু ক'রে উঠলো তাঁর। কেন ভগবান মনটাকে তাঁর কঠোর ক'রে দিলেন না সংসারে, তবে তো আর সারা বুকের স্নেহ নিয়ে আজ তাঁকে এমন অপমান সইতে হ'তো না নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে! মুখের উপর আজ স্পষ্ট শাসিয়ে গেল অঞ্জনা। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ দুঃখ—এ অপমান কোথায় গিয়ে ঢাকবেন তিনি?

ততক্ষণে অঞ্জনা নিজের ঘরে এসে ছন্দাকে নিয়ে প'ড়েছেন।—'রাজেন্দ্রাণী, ওলো আমার রাজেন্দ্রাণী লো! সারা রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিঁড়ে খায়, এ মেয়ের হ'য়েছে তাই। বাপের মাথা খেয়ে স্বামীর মুখে পিণ্ডি দিয়ে রাজেন্দ্রাণী এসে আমার ঘরে অধিষ্ঠিতা হ'য়েছেন। পাড়ার মানুষের মুখে মেয়ের আর প্রশংসা ধরে না। সকলের সঙ্গে যখন এত মস্করা, তখন আমার কপালে এসে এমন মরণদশা কেন, দুনিয়ার লোক তো ভাত ছড়িয়ে ব'সে আছে, সেখানে গিয়েই দিব্যি বহাল তবিয়তে থাক্ না! পোড়ারমুখীর কি মরণও নেই কপালে? পাড়ায় পাড়ায় তো দিব্বি ঘুর-ঘুর, কত হাসি, কত মস্করা ঘরে ঘরে, বাসায় এলেই মেয়ে আমার ভিজে বেড়াল। হতচ্ছাড়ী, পোড়ারমুখী, হাভাতে কোথাকার!'

রাগের মাথায় এক্ষুণি হয়ত দু'ঘা বসিয়ে দেবেন তিনি ছন্দার পিঠে। বিচিত্র নয়। মুখের সঙ্গে হাত দু'খানিও আজকাল নিস্‌পিস্ করে বৈ কি অঞ্জনার। এমন অনেক সময়ই লক্ষ্য ক'রে দেখেছে ছন্দা—অবলীলাক্রমে হাত দু' খানি তাঁর উদ্যত হ'য়ে উঠেছে, আঘাত ক'রতে শুধু বাকী রেখেছেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তের কথার এ আঘাতের চাইতে সে-আঘাত হয়ত শতগুণে

ভালো। তার দাগ মুছে যেতে সময় লাগ্‌বে না, কিন্তু কথার এ দাগ যে প্রতিমুহূর্ত্তে গভীর থেকে আরও গভীর হ'য়ে সমস্ত জীবনসত্তাকে তার মসীময় ক'রে তুল্‌ছে! অথচ সমস্ত চেতনা দিয়ে নীরবে এই মসীচিহ্ন ধারণ না ক'রে উপায় নেই। পথ তার রুদ্ধ, সাম্‌নে তার বিকট অন্ধকারের খল্‌খল্‌ হাসি। সেদিকে তাকাতে গেলে ভয়ে ত্রাসে নিজের মধ্যে আঁৎকে ওঠে ছন্দা। অঞ্জনার রূঢ় উক্তি যত বড় রূঢ়তা নিয়েই তাকে দগ্ধ করুক্‌, নীরবে নত মস্তকে তাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই তার। আজও নীরবে সেই স্বীকৃতিই তাকে জানাতে হ'লো। অথচ এ স্বীকৃতির পিছনে তার হৃদয় যে কতখানি ভেঙে গুঁড়িয়ে থিতিয়ে গেল, তা কেউ দেখতে এলো না।

রাগে গজ্‌গজ্‌ ক'রতে ক'রতে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে একসময় পান সাজ্‌বার সরঞ্জাম নিয়ে ব'স্‌লেন অঞ্জনা। অনেকক্ষণের মধ্যে এক খিলি পানও তাঁর মুখে ওঠে নি। পান না খেলে গলার ভিতরটা আপনি থেকেই কেমন খড়খড়িয়ে ওঠে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব'লে তখন কিছু জ্ঞান থাকে না অঞ্জনার।

কিন্তু যিনি এ সংসারের সমস্ত জ্ঞান নিয়ে ব'সে আছেন, তিনি আজ হতমান বিপর্য্যস্ত জীবনে একেবারেই পঙ্গু হ'য়ে প'ড়েছেন। লাঠি ভর ক'রে ভিন্ন আজ আর এক পা-ও ন'ড়বার ক্ষমতা নেই রসিকলালের। প্রাক্‌টিশ একরকম বন্ধ হ'তেই ব'সেছে। আগে আগে বাইরের বৈঠকখানা ঘর ছেড়ে তবু তিনি এখানে-ওখানে গিয়ে ব'স্‌তেন, খাবারের ডাক প'ড়লে অন্দর মহলে গিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে আস্‌তেন, আজকাল অধিকাংশ সময়েই তাঁকে বৈঠকখানা ঘরে এনে খাবার দিয়ে যেতে হয়। স্নানের জন্য ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে স্বতন্ত্র পাত্রে গরম জল এনে দুয়োরে রাখ্‌তে হয়। জীবনে যে আজ তাঁকে এ কোন্‌ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে, বুঝ্‌তে পারেন না রসিকলাল। মনটা যখন অতিরিক্ত বিষণ্ণ ও ভারী হ'যে ওঠে, মাঝে মাঝে আপন মনে ব'সে ব'সে তিনি রামপ্রসাদী সুর ভাজেন কণ্ঠে, তারপর অলক্ষ্যেই আবার কখন্‌ বিস্মৃতলোকে হারিয়ে যান।

এমন কিছু-একটা বিস্মৃতি হ'লে হয়ত ছন্দা বেঁচে যেতো, কিন্তু মনের সমুদ্র তার বড় উত্তাল তরঙ্গমুখর। সেখানে অতলস্পর্শী ভারী পাথর খণ্ডটিও সেই তরঙ্গমুখে সদা ভাসমান। সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রেও ঘুম এলো না ছন্দার। বাইরে প্রতিপদের চাঁদের ক্ষীণ আলোর রেখা এসে দাওয়ায় প'ড়েছে। নীরবে উঠে এসে একসময় সেইখানেই ব'সলো ছন্দা। কাকিমার

রূঢ় উক্তিগুলি কেবলই বার বার ক'রে মনে জেগে সমস্ত হৃদয়টাকে তার ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। সমাজের আর-আর পাঁচজনের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে একবার মিলিয়ে দেখতে গিয়ে মনে হ'লো—কেন এম্‌নি ক'রে অজানা অনিশ্চিতের মধ্যে একদিন তার মালা বদল হ'য়ে গেল! কেন এই বৈধব্যের অভিশাপ? এ তো সে চায়নি, এ যে সে আজও চায় না। পারতো না কি সে দীর্ঘজীবীর জীবনলক্ষ্মী হ'য়ে স্বামী-সোহাগে সুখে থাক্‌তে? সমাজের আর পাঁচজন যেমন ক'রে আছে। তাদের দীপ্ত ললাটের গাঢ় সিঁদুর-বিন্দু প্রতিমুহূর্ত্তে ঘোষণা ক'রে দিচ্ছে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যময় এয়োতীর ঐশ্বর্য্যময়তাকে। ললাটের সে সিঁদুর কবেই তার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। উর্দ্ধাকাশে প্রতিপদের চাঁদের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে মনের মধ্যে ভেসে উঠলো বিজনের মুখখানি। পারে না কি এই মুহূর্ত্তে গিয়ে বিজুদাকে সে ডেকে তুল্‌তে? নিদ্রাহীন রাত্রির একাকীত্ব যে কি দুঃসহ, এ সে কাকে বোঝাবে! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই কেমন একটা ধিক্কারে নিজের মধ্যে ভেঙে প'ড়লো ছন্দা। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ সে কি ভাব্‌চে এতক্ষণ ধ'রে? শ্যামলকান্তির আত্মা যে স্বর্গে থেকে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে। প্রতিপদের চাঁদের দিকে মুখ তুলেই সহসা সে মনে মনে একবার শ্যামলকান্তির উদ্দেশে উচ্চারণ ক'রে উঠলো: 'না, না, ভুলিনি তোমাকে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, ডেকে নাও তোমার কাছে আমাকে। তোমার কাছে ডেকে নিয়ে তোমার ঘরের চাবি আবার আমার হাতে তুলে দাও তুমি। এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে গিয়ে আমিও তোমার সাথে চির অবিনশ্বর হ'য়ে বাঁচি।'

টশ টশ ক'রে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে গালের দু'টো পাশ ভিজে গেল ছন্দার। রাত্রির নিস্তব্ধতা কেটে গিয়ে ভোরের আভা তখন স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে।

পঁচিশ

ইতিমধ্যে কল্‌কাতায় মহাসমারোহে একদিন ব্রাহ্মমন্দিরের আচার্য্যের পৌরোহিত্যে রেবা আর দিলীপ দত্তের শুভ পরিণয়ের মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হ'য়ে গেল। মিঃ মল্লিকের রাসবিহারী এভেন্যুর বাড়িটার উপর সমস্তটা বালীগঞ্জ অঞ্চলের দৃষ্টি এসে ঠিকরে প'ড়তে দেরী হ'লো না। নানা বর্ণের আলোর বন্যায় নব যৌবনের রাজ-সজ্জার সে কি অপূর্ব্ব নৃত্যচ্ছটা! রেবার গানের ক্লাবের মেয়েরা এসে হলঘরটাকে নাচে আর গানে মুখর ক'রে তুল্‌লো। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীটা এসে ভেঙে প'ড়তে দেরী হয়নি সেখানে। কোনো ব্যবস্থাতেই ত্রুটি নেই মিঃ মল্লিকের। ভাঁড়ারের ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে নিয়ে গোটা অন্দর মহলটাকে আঁক্‌ড়ে রইলেন মিসেস মল্লিক। পরিবেশনের ব্যাপারে একা নিশিকান্তই যথেষ্ট, দশটা মানুষের শক্তি নিয়ে আজ সে একাই নানাদিকে ছুটোছুটি ক'রছে, গ্রামোফোনের সঙ্গে এ্যাম্‌প্লিফায়ার জুড়ে দিয়ে নানা রাগের কন্‌সার্ট চালিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল মধ্য-লয়ে, আলোকোজ্জ্বল রূপসজ্জার সঙ্গে সুরের এই অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সমস্ত বাড়িটা যেন একটা রূপকথার স্বপ্নপুরী হ'য়ে উঠেছে। সারা ঘরের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, কোনোদিকে ফাঁকি রাখ্‌তে রাজি ন'ন্ মিঃ মল্লিক। ক্রিয়াকর্ম্ম ব'ল্‌তে জীবনে এখানেই তাঁর সুরু, এখানেই শেষ। অতএব তার মধ্যে ফাঁকি থাক্‌লে নিজেই সেই ফাঁকির জালে আবদ্ধ হ'য়ে সারাজীবন বৃশ্চিক দংশনে জ্ব'লে ম'রবেন মিঃ মল্লিক। কোনোদিকেই তাই সতর্কতার অভাব নেই। উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে বাড়িটা আজ পরম তীর্থ হ'য়ে উঠেছে। জীবনে আজ এই প্রথম তীর্থস্নান মিঃ মল্লিকের।

তেম্‌নি আজ এই প্রথম বাসররাত্রি যাপনা রেবা আর দিলীপের। এতদিন তারা পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গের মতো নানা দিকে উড়ে বেরিয়েছে; সেখানে কাছের পাওনাকে ষোলকলায় মিটিয়ে নিয়েও কি যেন একটা বড় রহস্য থেকে আড়ালে প'ড়ে ছিল তারা ; বাসর রাত্রির সৌরভমুখর পরিবেশে আজ সে-রহস্য উজ্জ্বল দিবালোকের মতই তাদের স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। দিলীপ ব'ল্‌লো, 'আমার নিঃসঙ্গ রাত্রির শয্যায় আজ থেকে সাথী পেলাম। এতদিনে আমার সকল নিঃসঙ্গতা ঘুচ্‌লো।'

—'আমারই বুঝি ঘুচলো না ?' ব'লে মুখ টিপে হাস্‌লো রেবা। টোল প'ড়ে গাল দু'টিকে মনোরম দেখালো।

সেণ্ট্ আর ফুলের গন্ধে ম-ম ক'রছে বাসর-কক্ষ। নীরবে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে রেবার সেই টোল-পড়া সুন্দর গালের উপরে মৃদু একটি চুম্বন এঁকে দিল দিলীপ। সমস্ত দেহের মধ্য দিয়ে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় শিহরণ খেলে গেল রেবার। নিজেকে দিলীপের বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লো, 'দুষ্ট, অসভ্য কোথাকার।' হয়ত আরও কিছু একটা বিশেষণ প্রয়োগ ক'রতো রেবা, তার পূর্ব্বেই দিলীপের অধরে চাপা প'ড়ে গেল রেবার ঠোঁট দু'টি। ভাববিহ্বলকণ্ঠে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'অধর মরিতে চায় তোমার অধরে—তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া করিতে দর্শন। এটা সভ্য সমাজেরই কথা, নইলে রবীন্দ্রকাব্য এতদিনে ডাষ্টবিনে স্থান পেতো। দুষ্ট, আমি—না তুমি, বলো তো ?'

কথা ব'ল্‌লো না রেবা, শুধু আবেশবিহ্বল চোখ দু'টি মেলে মনে মনে নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রতে লাগলো দিলীপকে।

উপহারের অনেক সামগ্রী ইতিপূর্ব্বেই বাসরকক্ষে এনে সাজিয়ে রাখা হ'য়েছিল। সেই দিকে উঠে হঠাৎ কি খেয়ালে ছোট্ট একটা এলুমিনিয়মের এ্যাটাচিকে হাতে তুলে নিতে নিতে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'কাপ-ডিস থেকে সুরু ক'রে কানের ঝুম্‌কো অবধি উপহার কিন্তু তুমি মন্দ পাওনি, যাই বলো। বন্ধুকৃত্যের ব্যাপারে প্রিয়জনেরা হাজার হোক্ কার্পণ্য করেনি।'

পালঙ্কের উপর উঠে ব'সে রেবা ব'ল্‌লো, 'এখন বুঝি উপহার দেখেই রাতটুকু নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে দেবে ঠিক্ ক'রলে ?'

—'না, না, তা কেন ! আমাদের রাত কাটাবার এগুলোও তো কম বড় সাথী নয়, তাই একবার স্পর্শসুখের সুযোগ নিচ্ছি।' ব'লে এ্যাটাচির ঢাক্‌নাটা খুলে ফেল্‌তেই কৌতুকে হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো দিলীপ। ব'ল্‌লো, 'শীগ্‌গির উঠে এস, একটা মজার জিনিষ দেখবে এস।'

কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে রেবা ব'ল্‌লো, 'তুমি এস, এসে বসো এখানে।'

আপত্তি ক'রলো না দিলীপ। তেম্‌নি হাস্‌তে হাস্‌তেই এসে খোলা এ্যাটাচিটাকে সে রেবার চোখের সাম্‌নে তুলে ধ'রলো।

দেখা গেল—একটুক্‌রো সুন্দর সিল্কের কাপড়ের উপর সামান্য এক সেট

সেলাইয়ের সরঞ্জাম, তার পাশে শায়িত র'য়েছে সেলুলয়েডের সুসজ্জিত একটি ডল পুতুল। ছোট্ট একটা রঙিন কার্ডে ইংরেজি কয়েকটা অক্ষর : To Reba—The best property of marriage. কিন্তু কার্ডটির কোথাও উপহারদাতার কোনো নামোল্লেখ নেই।

দিলীপ ব'ল্‌লো, 'তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে কি ভাবে ঠাট্টা ক'রেছে, দেখ।'

মনে হ'য়েছিল—রেবাও দিলীপের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রেবার মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, 'রাবিশ এ্যাণ্ড ভাল্‌গার। এই দেখে তুমি এম্‌নি ক'রেও হাস্‌তে পারছো?'

—'হাসির ব্যাপারই যে শেষ পর্য্যন্ত ঘটিয়ে ব'সেছে তোমার বন্ধু!' সহাস্যে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'উপহার যিনি দিয়েছেন, তাঁর রসজ্ঞানের তারিফ ক'রতে হয়, যাই বলো।'

সমস্ত মুখখানি ততক্ষণে লাল হ'য়ে উঠেছে রেবার। ব'ল্‌লো, 'একে তুমি রসজ্ঞান ব'লছো? কে দিয়েছে এটা—আমি হাতের লেখা দেখেই চিন্‌তে পেরেছি। এর জবাবও আমি কালই তাকে দেবো।'

—'জবাব দিতে গিয়ে তুমি হাস্যাস্পদ হবে। সংসারে যা চিরদিন সত্য, তাকে নির্বিবাদে মেনে নিয়েই সুখী হ'তে হয়।' থেমে দিলীপ ব'ল্‌লো, 'আজকের উপহারটা হয়ত নিতান্তই ঠাট্টা, কিন্তু আমাদের জীবনে একদিন এর বাস্তব রূপায়নটাকেই বা অস্বীকার করি কি ক'রে! পারো তুমি, বলো?'

—'জানি না যাও, নন্‌-কোঅপারেশন, আড়ি তোমার সঙ্গে।' ব'লে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে প'ড়লো রেবা।

রাত্রি ব'সে ছিল না। উর্দ্ধাকাশে তারাগুলি মিট্‌ মিট্‌ ক'রে জ্ব'ল্‌ছিল। দিলীপও আর অপেক্ষা না ক'রে সুইস অফ ক'রে দিয়ে এসে শুয়ে পড়লো। দেওয়াল-বাতির মৃদু শিখাটি শুধু অনির্ব্বাণ হ'য়ে রইল। শিয়রের জানালা দিয়ে স্পষ্ট লক্ষ্যে পড়ে আকাশে তারার মিছিল। ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে এলেও দিলীপের কাব্যানুরাগ কম ছিল না। বিলেতের নিঃসঙ্গ জীবনে তার যে সমস্ত গ্রন্থ সঙ্গী ছিল, রবীন্দ্র-কাব্য ছিল তার অন্যতম। জানালার দিকে মুখ তুলে একবার সে আপন খেয়ালেই আবৃত্তি ক'রে উঠ্‌লো—

…'জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হ'য়েছে হারা,

অঙ্গুলী তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমরা যাত্রা করিতে সারা।'...

ভেবেছিল—রেবা এবারে সাড়া দেবে; কিন্তু হঠাৎই যেন কি হ'লো রেবার! কেমন একটা আকস্মিক বিসন্নতায় সমস্তটা মন তার ছেয়ে গেল। বিজনের কথা মনে প'ড়লো। কী নির্ম্মম ভাবেই না তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে সে! আজ এই শয্যার সাথী যদি তার বিজন হ'তো- তবে কি সেও এম্‌নি ক'রেই রাত্রিটাকে মুখর ক'রে তুল্‌তো না? কবি নিজের কবিতা দিয়ে কি জাগিয়ে রাখতো না তাকে? ভাবতে গিয়ে চোখ ছু'টি হঠাৎ কেমন ঝাপ্সা হ'য়ে এলো তার। ছুই বিন্দু অশ্রু জ'মে উঠলো চোখের কোণে। দিলীপের তা দৃষ্টি এড়াল না। ব'ল্‌লো, 'এ কি, তুমি কাঁদ্‌ছো? এতখানি সিরিয়াস তুমি, জান্‌তুম না।'

বালিশেই চোখ ছু'টি রগ্‌ড়ে নিয়ে রেবা ব'ল্‌লো, 'কাঁদবো কেন! এমন সুখের রাত্রিতেও যদি কাঁদি, তবে হাস্‌তে পাবো কবে?'

দিলীপ ব'ল্‌লো, 'মিথ্যে ব'লে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, কিন্তু চোখ ছু'টো যে খোলা, তাকে ঢাক্‌বে কি ক'রে?'

মুখে হাসি টানতে চেষ্টা ক'রে রেবা ব'ল্‌লো, 'এখুনি না আবৃত্তি ক'রছিলে, তাই ভাবছিলাম—নব জীবনের কূলে যাত্রা ক'রতে গিয়ে অতীত জীবনের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব'লেও তো কিছু আছে!'

—'চোখের জলই তবে তোমার সেই কৃতজ্ঞতা?' দিলীপ ব'ল্‌লো, 'ইউরোপীয়ান মেয়েদের সঙ্গে এইখানেই তোমাদের পার্থক্য। তারা অতীতকে ছেড়ে আস্‌তে জানে, জানে ব'লেই আনন্দে তাদের বিষাদের ছায়া পড়ে না। তোমরা অতীতকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে সুখকেও খাটি সুখ ব'লে গ্রহণ ক'রতে পারো না।'

রেবা এবারে অনেকটা সহজ হ'তে চেষ্টা ক'রলো।—'মেমদের কাছে সেখানেই যে আমাদের বৈশিষ্ট্য। ওরা চায় সবাইকে ছেড়ে সুখী হ'তে, আমরা চাই সবাইকে নিয়ে সুখী হ'তে। ভেবো না যে, তুমি বিলেত ঘুরে এসেছ ব'লে আমি অম্‌নি মেম হ'য়ে যাবো! তুমিই বা এমন কি সাহেব হ'য়ে এসেছ!'

বিরোধের বন্যা এবারে সাগরে এসে কূল পেল। দিলীপ আর এই নিয়ে কথা কাটতে গেল না। স্মিত হাস্যে রেবাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ব'ল্‌লো, 'এস, তারা দেখি; বেশ লাগ্‌ছে আজ আকাশের তারাগুলোকে। এম্‌নি ক'রে কোনোদিন যেন দেখবার অবকাশই ঘটে নি!'

কাছেই কোথাও থেকে বড় ক্লকের আওয়াজ শোনা গেল। রাত দু'টো। আরও কতক্ষণ যে তারা এম্‌নি করে পুষ্পিত বাসররাত্রিকে মুখর ক'রে জেগে রইল, ব'ল্‌তে পারবো না। এ সময়ে মাগুরার একটি নিভৃত গৃহের দিকে যদি দৃষ্টি ফেরাই, তবে দেখতে পাই—একদিকে গভীর ঘুমে নাক ডাক্‌ছে নিশ্মলার, অন্যদিকে একান্তচিত্তে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে চ'লেছে বিজন, জীবন আর গ্রন্থ সেখানে একসূত্রে গাঁথা। হেরিকেনে যে কখন্ তেল ফুরিয়ে সল্‌তে নিভে এসেছে, সেদিকে তার দৃষ্টি নেই।

ছাব্বিশ

সকালে যখন ঘুম ভাংলো, সূর্য্য তখন আকাশের অনেক দূর অবধি ঠেলে উঠেছে। নির্ম্মলা কয়েকবার এসে ডেকে ডেকে ফিরে গেছেন। ঘুম ভেঙেও অবসন্নতা কাটছিল না বিজনের। উঠে মুখ ধুয়ে ঘরে এসে ব'সতেই নির্ম্মলা একবাটি গরম দুধ এনে তার সামনে তুলে ধ'রলেন। ছেলের মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রেই তার শরীরের অবস্থাটাকে বুঝে নিয়েছিলেন নির্ম্মলা। ব'ল্লেন, 'সারা দিন এত পরিশ্রম ক'রেও যদি আবার রাত্রি জাগিস্, তবে শরীর রাখ্‌বি কি ক'রে বাবা? চারদিকে অসুখ বিসুখের অন্ত নেই; তোকে নিয়ে একটা দিনও যদি আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম বিজু! নে, ধর, দুধটুকু খেয়ে নে। আজ থেকে রাত্রে যদি তুই বই ছুঁয়েছিস্ তো আমার মাথা খাস।'

হেসে বিজন ব'ল্লো, 'মাথা তো তোমার রোজই খাচ্ছি মা। কিন্তু দোহাই তোমার, অমন দিব্বি কখনও দিয়ো না। বই ছেড়েও নাকি আবার থাক্‌তে পারে মানুষ!'

এবারে কিছুটা অভিভাবকত্বের সুর স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো নির্ম্মলার কণ্ঠে। ব'ললেন, 'এমন নয় যে প'ড়ে তোকে পরীক্ষা দিতে যেতে হ'চ্ছে, এতই বা কেন! আজ থেকে মিছিমিছি সারা রাত অমনি ক'রে হেরিকেনের তেল পোড়াতে পাবি নে, ব'লে রাখ্‌ছি।'

—'বেশ, আজ থেকে তবে আর ঘরে হেরিকেন জাল্‌বো না।' অভিমানের কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ ক'রলো বিজন। আসলে মনটাকে নিয়ে-যে-সে নিজের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে দগ্ধ হ'য়ে ম'র্‌ছে, এ কথা সে কেমন ক'রে বোঝাবে মাকে? ব'ল্‌লো, 'আজ থেকে রাত্রে আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখো, কাজকর্ম্ম সেরে আমি দেরী ক'রেই ফির্‌বো।'

—'অম্‌নি রাগ হ'লো তো? আজকাল তোর কি হ'য়েছে, বল্ তো বিজু?' থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'কোনো কথাকেই আজকাল তুই সহজভাবে নিস্ নে। সংসারে আমি কার জন্যে প'ড়ে আছি, বল্ তো?'

অভিমান চাপা প'ড়ে গেল মনের আড়ালে। মাকে এম্‌নি ক'রে কোনোদিন কথা ব'ল্‌তে শোনেনি বিজন। সংসারে মা ছাড়া তার কেই বা আছে? মায়ের বুকে তাই দুঃখ দিতে চায় না সে। ব'ল্‌লো, 'সব কথাকেই

আমি বাঁকা অর্থ ক'রে ধরি, এই বা তুমি কেমন ক'রে বুঝ্লে মা? আমি না থাক্‌লে তুমি যে এতদিনে কাশীবাসী হ'তে, তাও কি আমি জানিনে? চলো, বরং দু'জনেই বেরিয়ে পড়ি; সংসারের এই কোলাহল আমারও আর ভালো লাগে না মা।'

বিস্ময়ের কণ্ঠে নির্ম্মলা একবার ব'ল্‌তে গেলেন, 'এ তুই কি ব'ল্‌ছিস্ বাবা, সাম্‌নে যে তোর অফুরন্ত ভবিষ্যৎ! পিতৃ-পুরুষের ভিটে আগ্‌লে বংশে বাতি দিতে হবে যে তোকেই।' কিন্তু পারলেন না, মুখে এসেও বেধে গেল নির্ম্মলার। থেমে ব'ল্‌লেন, 'যাবি, নিয়ে যাবি আমাকে একবার বাবা বিশ্বনাথের দুয়োরে? কতদিনের সাধ; বাবা বিশ্বনাথের পায়ে গিয়ে তবে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারতুম।'

তৎক্ষণাৎই কিছু একটা উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'লো না বিজনের পক্ষে। কিছুক্ষণ সে অপলক নেত্রে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে রইল, তারপর ছোট্ট ক'রে ব'ল্‌লো, 'অদৃষ্টে যদি তোমার সত্যিই বিশ্বনাথ দর্শন থাকে, তবে আমি না নিয়ে গেলেও তোমাকে যেতেই হবে মা। তার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ো না। কিন্তু একটা কথা আমাকে সত্যি ক'রে ব'ল্‌বে?'

—'কি, বল্?'

—'আমার উপর রাগ ক'রেছ তুমি?'

—'তোর উপর আমি কখনও রাগ ক'রতে পারি বাবা? আমি যে তোর মা, কত তপস্যা ক'রে তবে তোকে পেয়েছিলাম। পাগ্‌লা ছেলে, মাথা থেকে তোর পাগ্‌লামী যাবে কবে, বল্ তো?' ব'লে দুই বাহুর মধ্যে আকর্ষণ ক'রে বুকে টেনে নিলেন নির্ম্মলা ছেলেকে।

অদ্ভুত শান্তি। পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা যেন এই বুকখানির মধ্যে এলে জুড়িয়ে যায়। থেমে সহাস্যে বিজন ব'ল্‌লো, 'এ পাগ্‌লামী আমার আর এ জীবনে ঘুচ্‌বে না মা। তুমি যেন তাই ব'লে রাগ কোরো না, তবে আর আমার দাঁড়াবার জায়গাটুকুও থাক্‌বে না।'

উত্তরে নির্ম্মলা আর একটি কথাও ব'ল্‌তে পারলেন না। শুধু ছেলের মুখখানিকে আরও জোরে আরও নিবিড় ক'রে বুকখানির মধ্যে চেপে ধ'রলেন তিনি।...

বিকেলে আবার সেই উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে পাঠশালার তপস্যা। মাঠের

কাজে সারাটা দুপুর চাষিদের সাথে ঘুরে ঘুরে কাটাবার পর সহজ শান্ত নিষ্পাপ শিশুদের প্রাণের সান্নিধ্যে এইটুকুই যা আনন্দের অবকাশ। ধীরে ধীরে সূর্য্য নেমে যায় অস্তাচলে, দিনের ক্লান্ত পাখীরা ফেরে ঘরে ; অপরাহ্নের শান্ত ছায়ায় ঘেরা পাঠশালার পরিবেশটা আশ্রমের রূপ নিয়ে দাঁড়ায়। তার মধ্য থেকে কচিকণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হ'য়ে ওঠে : না ব'লে কেউ কারুর জিনিষ নেবো না, কেউ কাউকে আঘাত ক'রবো না, মিথ্যা বা কটু কথা ব'ল্‌বো না, গুরুজনকে ভক্তি ক'রবো, পরের সাহায্যে এ জীবন ব্যয় ক'রবো, নিজের মতো ক'রে ভালোবাস্‌বো সকলকে ; সকলেই আমাদের আপন, সকলেই আমাদের ভাই।...

বিজন স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রলো—কথা ধীরে ধীরে মার্জ্জিত হ'য়ে উঠ্‌চে, জিহ্বার আড়ষ্টতা ক্রমে ভেঙে আস্‌চে, শিষ্টাচারে আর নম্রতায় ক্রমে ভদ্র হ'য়ে উঠ্‌চে ছাত্রেরা। প্রথম ভাগ শেষ ক'রে দ্বিতীয় ভাগের পাঠ ধরাতে বড়জোর আর এক মাস। আশ্চর্য্য এদের স্মরণশক্তি। গ্রামের জমিদার মহাজনেরা এতদিন আফিং খাইয়ে এদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, সেই ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ছে সিংহ-শিশু। তার হুঙ্কারে একদিন আকাশ প্রকম্পিত হ'য়ে উঠবে। ঘুচে যাবে সেদিন এই মিথ্যে মহাজনীতন্ত্র।

কড়াকিয়া আর গণ্ডাকিয়া শেষ হ'য়ে যোগ-বিয়োগের পাঠ সুরু হ'য়েছিল। শুভঙ্করীর শুভাশীষ পেয়ে এগিয়ে এসেছে ছাত্রেরা। মুখে মুখে নতুন একটা যোগ অঙ্ক ব'লে গেল বিজন, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা শ্লেটে লিখে নিয়ে ধ্যানস্থের মতো ব'সে গেল যোগফল নামাতে। কারুর বা তার মধ্যেই পাশের ছেলের শ্লেট থেকে নকল ক'রবার প্রয়াস।

গলা বাড়িয়ে নিজে থেকেই একবার কথালো হ'য়ে উঠলো বিজন। 'ওটা কি হ'চ্চে হারুণ, ও অভ্যাস ভালো নয়। পরের জিনিষ যেমন না ব'লে নিলে চুরি করা হয়, তেমনি অন্যের শ্লেট থেকে অজান্তে টুকে নিলে তাকেও চুরি করাই বলে। যদি না মেলাতে পারো, তবে এদিকে এস, বুঝিয়ে দেবো।'

ছেলেটি লজ্জায় আর মাথা তুল্‌তে পারলো না। মনে মনে যথেষ্ট ভয় পোষণ ক'রেই নিঃশব্দে উঠে এলো বিজনের সাম্‌নে। এক হাতে তার শ্লেট আর পেন্সিল, অন্য হাতে শক্ত ক'রে নিজের কান ধরা।

হাসি পেলো বিজনের। মারের ভয়ে আগে থেকেই নিজের হাতে নিজের

কান ধ'রে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছে হারুণ। হাসি গোপন ক'রে বিজন জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'এটা কি ব্যাপার, কান ধ'রে আছ কেন?'

অস্ফুট কণ্ঠে হারুণ ব'ল্‌লো, 'অন্যায় হইছে মাষ্টার সা'ব।'

মাষ্টার সা'ব! সম্বোধনটা আজ এই নতুন শুন্‌লো বিজন। ব'ল্‌লো, ''অন্যায় তা হ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ?'

জবাব নেই হারুণের কণ্ঠে।

—'মাষ্টার সা'ব ব'লে ডাক্‌তে শিখ্‌লে কোত্থেকে? কে ব'লেছে মাষ্টার সা'ব ব'লে ডাক্‌তে?' কৌতূহলের দৃষ্টিতে খানিকটা চাঞ্চল্য খেলে গেল বিজনের।

তেম্‌নি অস্ফুট কণ্ঠেই হারুণ ব'ল্‌লো, 'বা-জান।'

—'কে তোমার বাবা, আজাহার উদ্দীন?'

—'আইজ্ঞা।'

ছেলেরা ততক্ষণে যোগফল নামিয়ে বিজনকে এসে চারপাশ থেকে ঘিরে ধ'রেছে। কে আগে শ্লেট এগিয়ে দেবে, তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা। সাধনক্ষেত্রে সবাই কিছু-একটা যোগসিদ্ধ পুরুষ নয়, অনেকেই ভুল ক'রে ব'সেছে যোগফলে। মুখের অঙ্ক শ্লেটে লিখে লিখে শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়ে দিল সবাইকে বিজন। জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'মোনা কোথায়, মোনাকে যে দেখ্‌ছি না?'

কে একটি ছেলে ব'লে উঠলো: 'মোনা আইজ্ঞ পড়তে আসে নাই।'

জানা গেল—ছেলেটি তসর আলীর পাশের বাড়ির ছেলে। সকালে পান্তা খেতে দেখেছে সে মোনাকে, তারপর আর কোনো খোঁজ রাখেনি।

বিজন ব'ল্‌লো, 'মোনার বাবাকে গিয়ে ব'ল্‌বে, সে যেন রাত্রে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে।'

নীরবে ঘাড় নেড়ে ছেলেটি দু'পা স'রে গিয়ে দাঁড়ালো।

শ্রবেণের আকাশ, কখন্ আকাশ কালি ক'রে চকিতে মেঘ জ'মে উঠেছিল, এতক্ষণ সেদিকে কারুরই দৃষ্টি ছিল না। মেঘের ডাক কানে আস্‌তেই উর্দ্ধাকাশের দিকে একবার দৃষ্টি তুলে ধ'রলো বিজন। দেখ্‌লো—এখুনি হয়ত চেপে বৃষ্টি নাম্‌বে।

ছুটি হ'য়ে গেল পাঠশালা। হল্লা ক'রে দলে দলে ছুটে প'ড়লো ছেলেরা। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে হারুণ তখনও ঠিক একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে এখনও ছুটি পায়নি তার মাষ্টার সাহেবের কাছ থেকে। এবারে কাছে ডেকে

তাকে খানিকটা আদর ক'রে দিল বিজন। ব'ল্লো, 'আমরা তো সাহেব নই, আমরা বাঙালী, তোমার বাবাকে গিয়ে বোলো। আর কখনও অম্নি ক'রে পরের শ্লেটে উঁকি দিতে যেয়ো না। যাও, বাড়ি যাও এখন।'

কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল হারুণ, তারপর এক দৌড়ে কোথায় যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, চোখে প'ড়লো না।

মেঘ ডাক্‌ছে গুম্ গুম্ ক'রে। গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। প্রেমের শান্ত প্রবাহের মতই বেশ লাগ্‌ছে এই বাতাসকে। এক নিমেষে যেন দেহের সমস্ত তাপ জুড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু মন, মনের তাপ জুড়াবে কে? পাঠশালায় নিঃসঙ্গ ফাঁকা পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতির এই লীলামুখরতাকে কেন্দ্র ক'রে অনেকক্ষণ একাকী ব'সে রইল বিজন। মনে প'ড়লো নিজের স্কুল-জীবনের কথা। কত ফাঁকি আর কত লুকোচুরি দিয়েই না ঘেরা ছিল সেই দিনগুলি! অঙ্কে কি তার নিজেরই ছাই মাথা ছিল? তবু মাথা খেলাতে হ'য়েছে তাকে, মাথা খেলাতে হ'য়েছে স্কুলে মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়ে বাসায় এসে মাকে এড়িয়ে চ'লতে। হাসি পায় আজ সেই দিনগুলির কথা মনে প'ড়লে। তার সেই দুষ্টুমির কাছে আজ হারুণের অপরাধ দাঁড়াতেই পারে না। এরা অনেক সংযত, অনেক হিসেবী। হারুণকে কেন্দ্র ক'রে তার সহপাঠী সকলের জন্য একটা গভীর মমতায় সহসা সারা বুকখানি আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল বিজনের। কতক্ষণ যে সে একই অবস্থায় ব'সে রইল, তা সে নিজেই বুঝ্‌তে পারলো না। গাছের ডালে ডালে ততক্ষণে বাতাসের মাতামাতি সুরু হ'য়ে গেছে। শ্রাবণ এগিয়ে চ'লেছে ভরা ভাদ্রের দিকে। দু'টো দিনও আর বাকী নেই শ্রাবণ সংক্রান্তির। নবগঙ্গার উত্তাল তরঙ্গচঞ্চল ভরা-যৌবনের উপর দিয়ে এ-সময়ে মৌসুমীর লীলা চলে সমস্তটা মাগুরায়। পাগলা হাওয়ায় মেঘ ছড়িয়ে পড়ে আকাশের স্তরে স্তরে, তারপর নেমে আসে ধারা; সমস্তটা মাগুরা সেই ধারায় স্নান ক'রে ওঠে।

একসময় উঠে প'ড়লো বিজন। নইলে এরপর হয়ত ভিজতে হবে। কিন্তু যত গর্জ্জালো মেঘ, তত বর্ষালো না। বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল মেঘ। নবগঙ্গার পাড়ে এসে একসময় থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়লো সে। বাতাসের ক্ষীপ্রতায় আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠেছে জলরাশি। বর্ষায় নবগঙ্গার এ রূপ একেবারেই স্বতন্ত্র। যৌবনভারে কামোন্মাদ হ'য়ে ওঠে সে, একুল ওকুল ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে চলে সে জীবন-দয়িতের সন্ধানে। ইল্‌শেগুড়ির মতো এক ঝলক বৃষ্টি

এসে রূপালীসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে গেল নবগঙ্গাকে। মুগ্ধ আবেশে একবার উচ্চারণ ক'রলো বিজন: 'তোমাকে নমস্কার। এ জীবনে কত বৈচিত্র্যের মধ্যে কত রূপেই না তোমাকে দর্শন ক'রলাম! তোমার অনন্যকান্তি পরম মহিমার উদ্দেশ্যে প্রণাম।' তারপর সোজা পা চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে।

তসর আলীকে গিয়ে খবর দিতে হয় নি, পথেই তার দেখা পাওয়া গেল। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এসে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো সে বিজনের সাম্‌নে। ব'ল্‌লো, 'মেহেরবাণী কইরা যদি আমার ঘরে গিয়া একবার পায়ের ধূলা দেন দাদাবাবু, তবে নিশ্চিন্দি হই। মোনা আইজ পাঠশালায় যাতি পারে নাই, সারা গা ভইরা তার য্যান্ কি সব দেখা দিছে, বড় অস্থিরে আছি, একটা মাত্র ছাওয়াল, মুখ্যু লোক, কিসে কি হয়—কিছুই যে জানি না, একবার মেহেরবাণী কইরা যদি আসেন দাদাবাবু!'

এতক্ষণে তবে মোনার আজ পাঠশালায় না আসার কারণ বোঝা গেল। বিজন ভাবলো, হয়তো হাম উঠে থাক্‌বে গায়ে! কোনোদিন হামের সঙ্গে পরিচয় নেই ব'লেই এতখানি উতলা হ'য়ে উঠেছে তসর আলী। ব'ল্‌লো, 'মোনার অসুখ? একটু আগেই যে ছেলেদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রছিলাম মোনার কথা। মোনাকে দেখ্‌তে যাবো না, তাও কি হয়! ব্যস্ত হ'য়ো না তুমি, অসুখ হ'য়েছে, দু'দিনেই আবার সেরে উঠবে! মোনাকে উপলক্ষ্য ক'রেই যে আমার পাঠশালা প্রতিষ্ঠা! কিছু ভয় নেই, চলো।'

বাড়ির পথ ছেড়ে তসর আলীর সঙ্গে এবারে ভিন্ন পথ ধ'রলো বিজন। কিন্তু তাতেই দুশ্চিন্তা কাট্‌বার নয় তসর আলীর। ব'ল্‌লো, 'মোনাকে যে আপনি কত ভালোবাসেন, সে কি কিছু জানি না দাদাবাবু! মুখ্যু ছোটো লোকের পোলাদের আপনি বুকে তুইল্যা নিছেন, আপনি যে দেব্‌তা দাদাবাবু।'

কথাটা এড়িয়ে গেল বিজন। খানিকটা পথ এগিয়ে এসে একসময় ব'ল্‌লো, 'বৃষ্টিটা শেষ পর্য্যন্ত আর এলো না, এলে ধরণী শীতল হ'তো।'

কিন্তু বিজনের একথার জবাব দেবার মতো মন নেই তখন তসর আলীর। একটা অজানা ভয় আর অস্বস্তি মিলে সমস্ত বুকখানিকে তার তোলপাড় ক'রে দিচ্ছিল। ব'ল্‌লো, 'আমাদের পাঁচু মাইতিকে বলাতে সে বল্‌লো—দরগায় গিয়া সিন্নি দাও, আল্লার কু-নজর পড়ছে মোনার উপর, তাই গুটি উঠছে গায়ে।'

বিজন ব'ল্‌লো, 'পাঁচু মাইতি জানে না, তাই ওকথা ব'লেছে। সংসারে সবাই যদি আমরা আল্লার সন্তান, তবে পিতা হ'য়ে সন্তানের উপর কি কখনও খারাপ নজর দিতে পারেন তিনি? আসলে তুমি বড্ড মুষ্‌ড়ে প'ড়েছ তসর; এটা খারাপ।'

মনে মনে তসর আলী একবার ব'ল্‌লো—পাঁচু মাইতির কথাটা সত্যিই যেন মিথ্যা হয়। দরগায় গিয়ে তবে সে সত্যিই সিন্নি দেবে।

বিজন এসে দেখলো—তসর আলীর বর্ণিত পাঁচু মাইতির কথাই যথার্থ। বেশ বড় হামই উঠেছে মোনার গায়ে। বসন্ত। সারা গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরের তাপে, সেই উত্তপ্ত দেহের চামড়া ভেদ ক'রে ঠেলে উঠেছে বসন্তের গুটি। একটা দারুণ অস্থিরতায় অনবরত ছট্‌ফট্‌ ক'রছে মোনা। তার কান্না থামাতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে উঠছে তার মা। পথে আস্‌তে আস্‌তে যত কথা ব'লে বিজন সান্ত্বনা দিয়েছে তসর আলীকে, এতক্ষণে তা নিজের কাছেই তার অলীক ব'লে বোধ হ'লো। এ রোগে শুধু সান্ত্বনাটাই যথেষ্ট নয়। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'জ্বর এসেছে কখন?'

শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল তসর আলী, 'কাইল শেষ রাত্তিরের দিকে।'

—'তবু ভোরে উঠেই ছেলেকে একরাশ পান্তা গিলিয়েছ তো?'

—'আইজ্ঞা, ও তো আমাদের বারো মাস তিরিশ দিনের অভ্যাস, ওতে আমাদের কিছু হয় না দাদাবাবু।'

—'এই হয়না হয়না ক'রেই তোমরা নিজেরা মরো আর পরকে মারো।' ব'ল্‌তে গিয়ে গলার স্বরে এবারে খানিকটা ক্রোধ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো বিজনের।

মোনার কান্না এতক্ষণে দ্বিগুণ চ'ড়েছে। তার কপালের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহের কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'কাঁদবার কি হ'য়েছে, অসুখ হ'য়েছে, সেরে যাবে। লক্ষ্মী, ভালো, এবারে একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো দিকি তুমি। কাল সকালে তোমার জন্যে অনেকগুলো লজেন্স আর বিস্কুট নিয়ে আসবো। না কেঁদে এবারে ঘুমোও দিকি কেমন পারো?'

কথাটা যেন অষুধের মতো কাজ ক'রলো। কান্না থেমে গেল মোনার। চোখ বুজে সত্যিই সে এবারে ঘুমোতে চেষ্টা ক'রলো।

তসর আলী আর তার স্ত্রীকে অভয় দিয়ে উপস্থিত মতো বিদায় নিয়ে এলো বিজন। পরদিন যথাসময়েই লজেন্স আর বিস্কুট নিয়ে আবার এসে

ব'স্‌লো সে মোনার শিয়রে। হাতে পেয়ে মোনার সে কি আনন্দ! এম্‌নি ক'রে কোনোদিন কেউ তাকে বিস্কুট আর লজেন্স দেয় নি। কি অপূর্ব্ব স্বাদ। বড়লোকের ছেলেরা এই লজেন্স আর বিস্কুট খেয়েই বুঝি বড় হ'য়ে ওঠে, গ'ড়ে ওঠে তাদের চমৎকার স্বাস্থ্য! এতটুকুও হিংসা হ'লো না মোনার। আনন্দে আহ্লাদে অনেকক্ষণ ধ'রে সে হাতের মুঠোর মধ্যে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলো লজেন্স আর বিস্কুটগুলোকে, তারপর একটা লজেন্সকে গালের মধ্যে পুরে নিয়ে প্রাণপণ উৎসাহে চুষতে সুরু ক'রে দিল। কি অপূর্ব্ব স্বাদ! এ জিনিষ ফেলে কেউ আবার সাগু বার্লি খায়! বমি আসে সাগু গিল্‌তে।

কিন্তু দিন দু'তিন কেটে গেলে সেই অপূর্ব্ব স্বাদের লজেন্স আর বিস্কুটও বিকৃত হ'য়ে উঠলো মোনার মুখে। গুটি ফেটে গিয়ে এবারে ঘায়ে পরিণত হ'য়েছে। আপাদমস্তক ঢাকা প'ড়ে গেছে সেই ঘায়ে। চেনা কঠিন হ'য়ে উঠেছে মোনাকে। মুখে স্বাদ নেই, যা মুখে নিতে যায়, অম্‌নি উগড়ে আসে। নিজের শরীরের দিকে তাকাতে গিয়ে ভয়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে মোনা। অবুঝের মতো পাশে ব'সে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদে তার মা। মোনা তাদের একমাত্র সন্তান। খোদাতাল্লা তাকেও বুঝি বুক থেকে ছিনিয়ে নেন্‌!

এ ক'দিন ধরে একটা মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম পায়নি বিজন। মোনার শিয়রে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে, কব্‌রেজ ডেকে অষুধের ব্যবস্থা ক'রেছে, ভাঁড়ে ক'রে ডাব আর মেথি ভেজানো জল একটু একটু ক'রে খাইয়ে দিয়েছে মোনাকে, প্রবোধ দিয়ে ব'লেছে, 'কেঁদো না, তোমার মত বীরপুরুষের এটুকু কষ্টতে কি হয়? আর দু'এক দিনেই ঘা শুকিয়ে যাবে, ভাল হ'য়ে উঠে ভাত খাবে তুমি। আমি সুতোভর্ত্তি লাটাই আর ঘুড়ি কিনে দেবো, পানকৌড়ি ঘুড়ি, অবাক হ'য়ে সবাই চেয়ে থাক্‌বে তোমার ঘুড়ির দিকে।'

মুহূর্ত্তের জন্য হ'লেও শরীরের যন্ত্রণা মনের অতলে কোথায় চাপা প'ড়ে গেছে, কান্না থামিয়ে স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে উঠেছে মোনা: সপ্তদিগন্ত জুড়ে উড়ছে তার পানকৌড়ি, নানারঙের পানকৌড়ি ঘুড়ি তার। অবাক বিস্ময়ে সারা মাগুরার লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার দিগন্তবিসারী পান-কৌড়িকে। পাঠশালার বন্ধুরা এসে তার লাটাই আর মাজনদেওয়া সুতো পরীক্ষা ক'রে দেখচে তাদের হাতের স্পর্শ দিয়ে, বিরক্ত কণ্ঠে তাদের দূরে

রিয়ে দিচ্ছে মোনা। রাত্রে ঘুমের মধ্যেই একবার চিৎকার ক'রে ওঠে সে নিজের অজান্তেঃ 'কবে আমি ভালো হবো, কবে ভাত খাবো আমি, কবে মাঠে গিয়া ঘুড়ি উড়াইতে পারবো ?'

কিন্তু বিজন তখন আর তার শিয়রে ব'সে নেই। নিজের ঘরে শুয়ে তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। ক'দিন ধ'রে তারও শরীরটা যেন কেমন ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ ক'রছিল ; বর্ষায় আবহাওয়াটা স্যাঁতসেঁতে হ'য়ে উঠেছে ; জোলো হাওয়ায় সর্দ্দি লেগে শরীরটা কেমন অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছিল তার। ভ্রুক্ষেপ করেনি সেদিকে বিজন। কিন্তু একটা জিনিষ সে স্পষ্ট লক্ষ্য ক'রেছে —আজকাল আর আগেকার মতো সেই কর্ম্মক্ষমতা নেই, অল্পেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, অবসন্ন হ'য়ে আসে দেহ। বুঝতে পারে না সে—কোন্ দেবতার অভিশাপ এসে আজ তাকে এম্‌নি ক'রে বিঁধছে ? নিষ্ক্রিয় জীবন নিয়ে একটা দিনও বাঁচতে চায় না সে সংসারে। সে বড় দুঃসহ, সে বড় জ্বালা। ক্লান্তিতে সারা মন তার আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, রুদ্র দেবতার সন্ধান ক'রতে গিয়ে জান্‌তেও পারে না সে—অলক্ষ্যে কখন ঘুমের দেবতা তার দু'চোখের উপর দিয়ে স্নেহাঞ্চল বুলিয়ে নিয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে বিজন। আজও তেমনি ক'রেই নিজের ঘরে সে নিদ্রাক্লান্ত।

মোনার কথার জবাব দিতে উঠে ব'স্‌তে হয় তসর আলীকে। কিন্তু কি জবাব দেবে খুঁজে পায় না, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে।

ক্রমে রাত্রি কেটে গিয়ে ঊষার আলোয় আঙিনা ভ'রে ওঠে। বাইরের পথে ধান খুঁটে খেতে খেতে একদল মুর্গী সমস্বরে ডেকে ওঠে—কক্করক্ কক্ কক্—। প্রতিদিন ভোরের কাজে বেরোবার আগে এ সময়ে একবার নামাজ প'ড়ে নেয় তসর আলী। কিন্তু আজ আর সে-অবকাশ হ'লো না। মনে মনে খোদাতাল্লার দোয়া মেগে একবার প্রার্থনা জানালো সে : 'মুখ তুইল্লা চাও খোদা, মোনারে আমার ভালো কইরা দ্যাও, দর্‌গায় গিয়া তোমার নামে সিন্নি দিব আমি, মেহেরবাণী করো খোদা।'

সাতাশ

তসর আলীর খোদাতাল্লা শেষ পর্য্যন্ত সত্যি সত্যিই মুখ তুলে তাকালেন। ধীরে ধীরে আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো মোনা। দর্গায় গিয়ে একদিন নগদ পাঁচশিকে পয়সা খরচ ক'রে আল্লার নামে সিন্নি দিয়ে এলো তসর আলী। কিন্তু তার খোদাতাল্লা যে বিজনের প্রতি এতখানি বিমুখ হবেন, এ কথা কল্পনাও ক'রতে পারেনি সে। শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রের আকাশ ঝ'ল্‌কে উঠলো। রোগের বীজাণু এ সময়ে বর্ষার ধারায় ধুয়ে যায়। কিন্তু এবারে বর্ষার গোড়া থেকেই তার ব্যতিক্রম দেখা দিয়েছে। বিশেষ ক'রে চাষি-পাড়াতেই রোগের আধিক্যটা এবারে প্রবল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিজনও সেই রোগের করালগ্রাস থেকে মুক্তি পেলো না। ক'দিন থেকেই শরীরটা তার কেমন ম্যাজ্‌ ম্যাজ্‌ ক'রছিল, এবারে তাকে একেবারেই শয্যা নিতে হ'লো। মোনাকে সে সুস্থ ক'রে তুল্‌তে পেরেছে, এটা তার কাছে কম বড় সান্ত্বনা ছিল না, কিন্তু শেষ অবধি মোনার রোগটাই যে তার উপরে এসে ভর ক'রবে, এ তার কল্পনারও অতীত ছিল। দু'একটা দিন কেটে যেতেই প্রচণ্ড তাপ উঠলো শরীরে, গুটি দেখা দিল দু' একটা ক'রে। এতদিন যে দেহটার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে নি বিজন, আজ সেই দেহটা নিয়েই তার মস্তবড় জ্বালা হ'লো।

ভয়ে নিজের মধ্যে কাঠ হ'য়ে গেলেন নির্ম্মলা। ব'ল্‌লেন, 'এতদিন কত ক'রে নিষেধ ক'রেছি, কথা কানে তুলিস নি বিজু; এতদিনে নিলি তো বাধিয়ে একটা কিছু!'

কথা ব'ল্‌লো না বিজন। আসলে সে নিজের কাছেই এ কথার কিছু একটা জবাব খুঁজে পেলো না।

থেমে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'এমন রোগ নয় যে, পাড়ার পাঁচজনকে যখন-তখন ডাকা যাবে। এ রোগের নাম শুন্‌লে কেউ কি সে বাড়ির ত্রিসীমানায়ও পা দেয়! ক'দিন ধ'রেই কেমন যেন মনে হ'চ্ছিল—মা শীতলার একটা পূজো দিলে হয় না! কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে, পূজো নেবার আগেই মা কৃপা ক'রে ব'স্‌লেন। সংসারে একা মেয়েমানুষ হ'য়ে এখন আমি কি করি, বল তো বাবা?'

নিজের শরীরের অবস্থা চিন্তা ক'রে বিজন নিজেও বড়-বেশী ভরসা পাচ্ছিল

না। তবু মাকে একরকম প্রবোধ দিয়েই সে ব'ল্‌লো, 'কিছু তোমাকে ক'রতে হবে না মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। মোনার তুলনায় এ তো আমার কিছুই ওঠে নি গায়ে, দু'দিনেই শুকিয়ে যাবে। এ নিয়ে পাড়ার পাঁচজনকে আর খবরদারী ক'রতে হবে না তোমাকে।'

কিন্তু মায়ের প্রাণ তাতেই কি প্রবোধ মানে? পাড়ার পাঁচজনকে গিয়ে খবরদারী ক'রতে না হ'লেও পাড়ায় তখন কানপাতা ভার হ'য়ে উঠেছে। গ্রামের চক্রবর্ত্তী বাচস্পতিরা মুখিয়ে উঠেছে এই নিয়ে।

গল্পমুখর তাম্রকুটের আসরে হুঁকোয় ধুম-উদ্‌গীরণ ক'রে একসময় ভবাণী চক্রবর্ত্তীই কথাটা পাড়লো।—'বলি, বিজু ছোক্‌রার কাণ্ডখানা দেখলে তো? ওর বাপ ছিল সাত্ত্বিক বাড়ুজ্জে, আর বিজটা হ'য়েছে একটা চাড়াল। চাষা-ভূষোকে নিয়ে তো মাত্‌লি, এখন ঘর সাম্‌লায় কে? ধম্ম ক'রে সেবা ক'রে এদিকে তো পাড়াকে পাড়া জ্বালিয়ে দিতে ব'স্‌লি, গুষ্টিশুদ্ধ মরুক এখন গাঁয়ের লোক!'

হুঁকোটাকে হাতে পাবার প্রত্যাশায় এতক্ষণ হা-পিত্তেশের মতো হা ক'রেই ছিল জনার্দ্দন বাচস্পতি, উত্তরে ঈষৎ টিপ্পনি কেটে ব'ল্‌লো, 'বাপ না থাক্‌লে সংসারে যা হয়, ও ছোক্‌ড়ার হ'য়েছে তাই। দু'পাতা ইংরেজি শিখে কল্‌কাতা ঘুরে এসে ছোক্‌রা ডেঁপো হ'য়ে গেছে।'

পাশ থেকে হরি মুখুজ্জে ব'ল্‌লো, 'আমি আজই ওর মাকে জানিয়ে দিচ্ছি—ছেলের এই রোগ নিয়ে এ ভাবে পাড়ায় বাস করা চলে না। ছোঁয়াচে রোগ, কখন্ কাকে গিয়ে ভর করে, তার কি কিছু ঠিক্ আছে?'

সুখদা ততক্ষণে একেবারে নির্ম্মলার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িয়েছে।—'গাঁয়ের পাঁচজনে যেমন ক'রে ব'ল্‌ছে, তাতে তোমাকে একটু সাবধানেই থাক্‌তে হবে বাড়ুজ্জে-বৌ। হাজার হোক্ ছেলে, ফেল্‌তে তো আর পারো না; কিন্তু চাষি-বাগ্দিদের নিয়ে এ ভাবে ওর নাচানাচি করাটা ঠিক হয় নি। এখন নিজে ভোগান্তির মধ্যে প'ড়ে সবাইকে তটস্থ ক'রে তু্‌লো তো!'

কথাটা নির্ম্মলার কোথায় গিয়ে যেন বড় আঘাত ক'রলো। ব'ল্‌লেন, 'বিজু বিছানায় প'ড়ে না থাক্‌লে গাঁয়ের পাঁচজনের এসব কথার জবাব সে নিজের মুখেই দিত। বলি, তাদের ঘরেও কি ছেলেপুলে নেই, না তাদের কখনও অসুখ-বিসুখ হয় না? তাই নিয়ে এমন বাড়ি ব'য়ে এসেই বা এত সাবধান ক'রবার কি হ'য়েছে?'

কথাটা নিয়ে তর্ক ক'রতে পারতো সুখদা, কিন্তু তা ক'রলো না। বরং শান্ত কণ্ঠেই ব'ল্লো, 'যাই বলো, সাবধানের মার নেই বাড়ুজ্জে-বৌ। এ রোগ ছড়িয়ে প'ড়লে গাঁয়ে কারুর বাস করা চ'ল্বে না। তুমি বুদ্ধিমতী ব'লেই তোমাকে দু'কথা খুলে ব'ললাম।'—বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা ক'রলো না সুখদা। —'আসি এখন, খোঁজ নিয়ে যাবো মাঝে মাঝে'—ব'লে যে-পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথেই দ্রুত পা চালিয়ে দিল সুখদা।

অনড়ভাবে কতক্ষণ যে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন নির্ম্মলা, তা তিনি নিজেও জান্‌তে পারলেন না। রাগে দুঃখে কেমন একটা তিক্ততায় সমস্তটা মন তাঁর জ্ব'লে যাচ্ছিল ভিতরে ভিতরে।

রোগশয্যায় শুয়ে এতক্ষণ সুখদার সঙ্গে মা'র কথা কাটাকাটির সমস্তটাই বিজনের কানে গিয়েছিল। এবারে কাছে ডেকে মাকে সে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'হঠাৎ সুখদা ঠাক্‌রুণের গাত্রদাহ উপস্থিত হবার কারণ কি মা?'

—'কারণ আমার অদৃষ্ট।' থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'তোকে নিয়ে মানুষের কাছে আর কত অপমান সইব, বল্ তো বাবা?'

শান্তকণ্ঠে বিজন ব'ল্লো, 'যেদিন তোমার বিজু হ'য়ে এ পৃথিবীতে এলাম, সেদিন থেকেই যে তোমার চূড়ান্ত অপমান মা! এ অপমান জীবনে তোমার ঘুচবে না। তা যাক্। ভবিষ্যতে ঐ সুখদা ঠাক্‌রুণটিকে তোমার বাড়িতে আর ঢুক্‌তে দিও না, এইটুকু শুধু তোমার কাছে অনুরোধ।'

কেন যেন ছেলের উপর বেশীক্ষণ রাগ ক'রে থাকতে পারলেন না নির্ম্মলা। শিয়রে ব'সে বিজনের চুলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্নেহের আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ল্লেন, 'সকলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে শেষ পর্য্যন্ত একঘরে হ'য়ে পচে মরি, এই তোর ইচ্ছে?'

বিজন ব'ল্লো, 'বাজে লোকের সংশ্রবের চাইতে নিজের ঘরে নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে থাকা অনেক ভালো। একঘরে হবার দুঃখ তোমাকে সইতে হবে না মা, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

নিশ্চিন্ত হ'তে না পারলেও আপাতত এই নিয়ে আর কথা কাট্‌তে গেলেন না নির্ম্মলা। পরে একসময় ব'ল্লেন, 'সেই কখন খেয়েছিস্, এতক্ষণে তোর নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে; পথ্য এনে দি, খেয়ে চোখ বুজে একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর্ তো বাবা!'

একটা দুর্ব্বল চাহনিতে মায়ের চোখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধ'রে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কি পথ্য দেবে, বলো ?'

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'গায়ে জ্বর র'য়েছে, দুধ-বার্লি ভিন্ন আর কি দিতে পারি, বল্ ?'

—'ঘোড়ার ডিম।' ব'লে ঠোঁট উল্টালো বিজন। ব'ললো, 'জানো শুধু বাটিভর্ত্তি বার্লি এনে মুখের সামনে ধ'রতে !'

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'এ দেশের ঘোড়াগুলিও তেম্নি, হাঁসের মত ওরা যদি ডিম পাড়তো, তবে আমারই কি উনুনের আগুনে ব'সে এম্নি ক'রে বার্লি জ্বাল দিতে হ'তো !' অলক্ষ্যে একবার মুখ টিপে হাসলেন নির্ম্মলা।

বিজনও হাসি চেপে রাখতে পারলো না। শরীরের গ্লানিতে কষ্ট বোধ হ'লেও মুখে মৃদু চাপা হাসি টেনে মায়ের দিকে একবার হাত দু'খানিকে ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা ক'রে ব'ললো, 'তুমি কী বলো তো, কি আরম্ভ করেছ তুমি ? যাও, উঠে নিজের কাজে যাও ; আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি, কিচ্ছু খাবো না আমি। এই আমি ঘুমোলাম।' ব'লে চোখ বুজলো বিজন।

নির্ম্মলাও আর ব'সে রইলেন না। মুখে শুধু একবার উচ্চারণ ক'র্লেন—'দুষ্টু ছেলে', তারপর বোধ করি হেঁসেল ঘরের দিকেই উঠে গেলেন।···

সন্ধ্যার দিকে তসর আলী এসে একসময় ঘরের দাওয়ায় বস্‌লো।—'আমার দাদাবাবু কেমন আছেন, দাদাবাবু ?' ব্যাকুল কণ্ঠের চকিত জিজ্ঞাসা। বিজনের অসুখ সম্পর্কে তসর আলীর জান্‌তে বিলম্ব হয়নি। সেই থেকেই সে মনে মনে অনুশোচনায় দগ্ধ হ'য়েছে। এমন দেবতুল্য মানুষেরও নাকি আবার এই রোগ এসে শরীরে ভর করে ! তারা না হয় ছোট লোক, নোংরা জীবনে রোগ জীবাণুর অভাব নেই, তাই ব'লে দাদাবাবুর মতো মানুষের জীবনে আবার এ কি উপগ্রহ ? কিন্তু কেন এই উপগ্রহ, সেটুকু তার বুঝতে বাকী ছিল না। বুঝেই সে আরও বেশী অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল।

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'কেমন আর থাক্‌বে বলো ? গুটিগুলো এখনও ভালো ক'রে বেরোয়নি, ব্যথা আছে সারা গায়ে, শরীরের তাপও কিছু কম নয়। কি আছে অদৃষ্টে, কি জানি !'

এবারে কেন যেন নতুন ক'রে কিছু একটা আর প্রশ্ন ক'রতে পারলো না তসর আলী। সঙ্গে মাঝারি দেখে কচি দু'টো ডাব-নারকেল এনেছিল,

নীরবে সেই ছু'টোকে সাম্‌নে এগিয়ে ধ'রে শুধু সে ব'ললো, 'এ রোগে ডাবের জল উপকারী, মোনাকে দাদাবাবু দিতেন; এই তুইটা য্যান্ দাদাবাবু খান।'

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'এ কেন আবার তুমি আন্‌তে গেলে তসর? অভাবের সংসার, তার উপর আবার এসব কি খর্‌চা!'

তসর আলীকে যে কিনে আন্‌তে হয়নি, এ যে তার নিজের গাছেরই ফল, সে কথা উল্লেখ ক'রে শান্ত কণ্ঠেই সে ব'ললো, 'আপনারা যে পূজা-পার্ব্বন করেন মাঠাক্‌রুণ, তাতে জিনিষ কিনতি হয় না? দাদাবাবু আমার দেবতা, তাকে দিতে আমার যদি খর্‌চাই লাগে কিছু, তাতে দোষের কি? এইতেই কি আমার অভাব ঘুচতো?'

নির্ম্মলার কণ্ঠ এবারে কেমন যেন হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। এ কথার জবাব দেবার মতো ভাষা খুঁজে পেলেন না তিনি। মনে মনে শুধু ব'ললেন—সুখদা ঠাক্‌রুণের দল এসে একবার দেখে যাক্, মানুষ কাকে বলে!

একসময় শিয়রের বালিশের উপর মুখ তুলে কাতরকণ্ঠে বিজন জিজ্ঞেস ক'রলো, 'মোনা কেমন আছে তসর?'

তসর আলী ব'ললো, 'শরীলে বেশী বল পায় না, হাট্‌তি পারে না বেশী, তা ছাড়া আছে একরকম।'

—'লক্ষ্য রেখো ওর শরীরের দিকে।' থেমে পুনরায় কাতরোক্তি ক'রলো বিজন, 'আমি যে কবে সুস্থ হ'য়ে উঠবো কিছুই জানিনে। ওদের পাঠশালার খুব ক্ষতি হ'লো। ওরা যেন তা-ব'লে বই বন্ধ ক'রে থাকে না, তবে সব ভুলে যাবে।'

মৃদু হেসে তসর আলী ব'ললো, 'কড়া শাসন না পেলি পরে ওদের নেকা-পড়ায় গরজ হবে বইল্যা বিশ্বাস কম। ওদের এখন গুরুমশাইর অসুখের ছুটি।'

কথা শুনে কৌতুক বোধ ক'রলো বিজন। ব'ললো, 'কেন, আমি কি খুব কড়া শাসন করি?'

—'আপনার আদরই আপনার শাসন। আপনার ঐ আদরকেই ওরা সমীহ করে।' ব'লে পুনরায় মুখে হাসি টানলো তসর আলী।

কেমন একটা অজানা খুশীতে এবারে মনটা ভ'রে উঠলো বিজনের। তার আদরই তার শাসন: একটা নতুন অনুভূতির কথা শুনতে পেলো সে আজ।

নীরবে বহুক্ষণ আচ্ছন্নের মতো প'ড়ে থেকে পরে একসময় জিজ্ঞেস ক'রলো, 'জল আজ কতটা বাড়লো তসর ?'

—'ধানী জমিতে আইজ এক কড় আন্দাজ অনুমান হইল !' থেমে তসর আলী ব'ললো, 'নদীর জল থই থই করে, খ্যাপা ঢেউ, বুঝা যায় না।'

পাশ থেকে নির্ম্মলা জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ধান কিছু ঘরে উঠবে তো ?'

উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে তসর আলী ব'ললো, 'খোদার মর্জ্জি মা ঠাক্রুণ, নদীতে বান ডাক্‌লি সব ভাইসা যাবে।'

আকাশটা তখন কালো হ'য়ে উঠেছে। ভাদ্রের মেঘের ছায়ায় মাঝে মাঝে আকাশটা বড় বেশী কালো হ'য়ে ওঠে, গুম্ গুম্ ক'রে মেঘ ডাকে আকাশে।

থেমে তসর আলী ব'ললো, 'মেঘের গতিকও য্যান্ ভালো বইলা মনে হয় না মাঠাক্রুণ। খোদা ভরসা। ঘরে ধান না উঠলি যে আমিই মরবো আগে।'

এতকাল তসর আলীদের সঙ্গে প্রয়োজনের সম্পর্ক থাক্‌লেও তারা সবাই ছিল দূরের মানুষ। আজ কিন্তু তসর আলী অন্ততঃ হৃদয়ের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তরে নির্ম্মলার মুখ থেকে হঠাৎই বেরিয়ে এলো—'বালাই ষাট, মরবে কেন তসর ? বিপদ এলে সকলে তা এক সঙ্গেই ভোগ ক'রবো। মরার কথা কি মুখে আন্‌তে আছে ?' ব'লে নিজের কাজেই কোথায় একদিকে উঠে গেলেন নির্ম্মলা।

তসর অলীও বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রলো না। একসময় বিদায় নিয়ে সেও দাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই তাকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ছিল না বিজনের। অসুখে প'ড়ে অবধি মনটা কেবলই বহির্ম্মুখী হ'য়ে উঠেছে। বাইরের মানুষ ঘরে পেলে তাই খুসীর অন্ত থাকে না। সংসারের চাপে প'ড়ে ছন্দা আজকাল আসা-যাওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। বিছানায় শুয়ে অবধি বাইরের জগৎটা অনেকখানিই স'রে গেছে তার কাছ থেকে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনটা তার হাহাকার ক'রে ওঠে ছন্দার জন্য। কিন্তু নিগ্রহ কি তাকেই কম সহ্য ক'রতে হ'চ্ছে ?—বিছানায় শুয়ে অবধি মনের এই গ্লানির মধ্যে তসর আলী ব'য়ে নিয়ে এলো বহিঃপ্রকৃতির স্পর্শ। কিন্তু আবার সেই একাকীত্বের তাপদগ্ধ মরুভূমি। কি দুঃসহ এই রোগক্লান্ত মুহূর্ত্তগুলি, কি দুঃসহ প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য এম্‌নি ক'রে শয্যার বুকে বন্দী হ'য়ে থাকা!

কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে হঠাৎ নিজের মধ্যে অধীর হ'য়ে উঠলো বিজন। দেহ আর মন নিয়ে তার সঙ্গে এ আজ কি খেলা খেল্‌ছেন ভগবান ?

খেলাই বটে ! শেষ রাত্রির দিকে হঠাৎ জ্বরের তাপ বেড়ে গিয়ে আরও অস্থির ক'রে তুললো বিজনকে। নির্ম্মলার চোখে ঘুম আসছিল না, বিজন শয্যা নিয়ে অবধি ঘুম তাঁর দু'চোখ থেকে অন্তর্হিত হ'য়েছে। কোনো একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও নিশ্চিন্তে কাটাতে পারছেন না তিনি। মাতৃহৃদয়ের ব্যথা কোথায়, কে বুঝবে তা সংসারে ? বিজনের শিয়রে ব'সে তিনি ন্যাক্‌ড়া ভিজিয়ে জলপটি দিয়ে দিতে লাগ্‌লেন তার কপালে। জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'খুব কষ্ট হ'চ্ছে, তাই না বাবা ?'

অস্ফুট করে একবার ককিয়ে উঠ্‌লো বিজন : 'কপালের দু'পাশের রগ দু'টো বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে মা। জলপটি রেখে তুমি বরং কপালটা একবার টিপে দাও।'

নির্ম্মলা তা-ই ক'রলেন।

কিছুটা উপশম বোধ হ'লে বিজন একসময় তেম্‌নি অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললো, 'ছন্দাকে দেখতে পাই না কতদিন !'

আরও হয়ত কিছু একটা ব'লবার ছিল, কিন্তু সেটুকু আর খুলে ব'লতে পারলো না সে।

নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'এ সময়ে তাকে আর আসা দিয়ে দরকার নেই এখানে। রোগটা তো ভালো নয়, আগে তুই ভালো হ'য়ে ওঠ্‌ বাবা।'

উত্তরে ভালোমন্দ কিছু একটাও আর ব'ললো না বিজন। প্রসঙ্গটাকে সে ইচ্ছে ক'রেই চেপে গিয়ে শুধু ব'ললো, 'আমার জন্যে কষ্টের তোমার শেষ রইলনা মা। ভাবচি, এরপর তুমি আবার অসুখে না পড়ো !'

এ কথার কিছু একটাও জবাব দিলেন না নির্ম্মলা।

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হ'লো। তরুণ ঊষার অরুনিমায় ছেয়ে গেল দিগাঙ্গন। এম্‌নি ক'রে আরও দুটো প্রভাতের উদার অভ্যুদয়ে রাত্রির তমসা কেটে গেল।

একসময় জ্বরের বিচ্ছেদ ঘট্‌লো বিজনের। শরীরেও আর নতুন গুটি দেখা দেয়নি। সামান্য কয়টি যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, এবারে তা শুকোতে সুরু ক'রলো।

কিন্তু নির্ম্মলার আর এমন সাধ্য রইলনা যে, মাথা তুলে ব'স্‌তে পারেন। ক্রমাগত কয়েকদিনের রাত্রি জাগরণে শরীর তাঁর নিস্তেজ হ'য়ে প'ড়েছিল। বিজন মনে মনে যে আশঙ্কা ক'রছিল, অবশেষে তা-ই সত্য হ'লো। শয্যা গ্রহণ ক'রলেন নির্ম্মলা। বহুদিন থেকেই শরীর ভাল যাচ্ছিল না। হার্টের রোগ দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে এবারে শিরঃপীড়ায় একেবারেই ভেঙে প'ড়লেন তিনি।

একসময় বিজন ব'ললো, 'এতদিন আমার দিকে তাকাতেই তোমার বেলা ফুরিয়ে গেছে, এবার তোমাকে দেখবে কে মা?'

—'সংসারে যিনি সকলের সব কিছু দেখেন, তিনিই দেখবেন বাবা।' ব'লে নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে নিলেন নির্ম্মলা।

ঠিক এই সময়ে দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো ছন্দা।

বিস্ময়ে এবং আশঙ্কায় নির্ম্মলা হঠাৎ যেন কেমনই হ'য়ে গেলেন। ব'ললেন, 'ঘরে ঢুকিস্‌নে মা, বিজুর রোগটা কি জানিস্ তো? এসময়ে কাছে আসতে নেই।'

—'আপনি যে কাছে র'য়েছেন!' ছন্দা ব'ললো, 'রোগটা জানি ব'লেই তো পালিয়ে এলাম! সে কি শুধু এ ভাবে দুয়োর থেকে ফিরে যাবো ব'লে?'

নির্ম্মলার বারণ টিক্‌লো না। ছন্দা এসে তাঁর পাশ ঘেঁষে ব'সে প'ড়লো।

নির্ম্মলা ব'ললেন, 'আমি নিজেও আজ আর মাথা খাড়া ক'রতে পারছি না। বিজুর এই অসুখ, এতদিন দিন-রাত্রির দিকে তাকাই নি, ওর শিয়রে ব'সে ব'সে শুধু ভগবানকে ডেকেছি। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে, আজ আর এক দণ্ডও ওর কাছে গিয়ে ব'সতে পারছি না। ওর যে কত কষ্ট হ'চ্ছে!'

মনের গ্লানি মনের মধ্যেই গুম্‌রে ম'রছিল এতদিন। এবারে ব'লবার মানুষ পেয়ে চোখের কোল বেয়ে দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে প'ড়লো নির্ম্মলার। চেষ্টা ক'রেও সেটুকু রোধ ক'রতে পারলেন না তিনি।

ছন্দা তা নিজের আঁচলে মুছে নিয়ে ব'ললো, 'ঘরে এই অবস্থা, অথচ চেষ্টা ক'রে আমাকে কি সামান্য একটা খবরও পৌছে দিতে পারলেন না মাসীমা?'

—'তোকে ডেকে আনবার মতো যে রোগ নয় মা!' থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'একেই পাড়া-প্রতিবেশীর শাসানীর অন্ত নেই, তারপর তোর কিছু

একটা হ'লে আমার যে সংসারে আর মুখ ঢাকবারও জায়গা থাকৃতো না মা। এসে তুই অন্যায় ক'রেছিস্।'

—'সংসারে অন্যায়টাও ন্যায়ের কোঠাতেই পড়ে, আজ অন্ততঃ এটুকু বুঝ্তে শিখেছি মাসীমা। আমার জন্যে আপনি ভাববেন না, আমার কিছু হবে না।' ব'লে দ্বিধাহীন চিত্তেই নীরবে একসময় উঠে এসে বিজনের শিয়রের পাশে ব'সলো ছন্দা। বোধ করি কিছুটা তন্দ্রার মতই এসেছিল বিজনের, নিমিলিত চক্ষে অবসন্নের মতো প'ড়ে থেকে সম্ভবতঃ কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেই বোবা কান্নার মতো ককিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, সহসা ললাটে হাতের স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে তাকাতেই ছন্দার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল তার।

ছন্দা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কেমন বোধ ক'রছো এখন বিজুদা?'

—'দেহে কিছু দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছি, এই যা—। তা' ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গ আপাতত বোধ ক'রছি না।' থেমে বিজন ব'ললো, 'তুই যে কথা নেই বার্ত্তা নেই হঠাৎ এসে আমাকে বড় ছুঁয়ে ফেল্লি?'

—'কেন, আমি কি অস্পৃশ্য, হরিজন যে, ছোঁয়া পেয়ে তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হবে?'

কথাটা গিয়ে কোথায় যেন বিঁধলো বিজনের। এতদিন প্রতি মুহূর্ত্তে সে আশা ক'রছিল ছন্দাকে, এ কথাটুকু যেমন সে খুলে ব'লতে পারলো না তার কাছে, তেম্নি যে কথা দিয়ে কথার সূত্রপাত টান্লো সে, তারও অসারতা ও অনুপযোগিতা কল্পনা ক'রে তেম্নি সুখী হ'তে পারলো না বিজন। কিছুক্ষণ ছন্দার মুখের দিকে নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পরে সে ব'ললো, 'তুই কোন্ দুঃখে অস্পৃশ্য হ'তে যাবি ছন্দা? বামুনের ঘরে জন্ম হ'লেই লোকে বামুন হয় না, আমিও বোধকরি হ'তে পারি নি! চাষাভূষো নিয়ে কাটাই ব'লে গাঁয়ের লোকের চোখে আমিই আজ অচ্ছুৎ হ'য়ে গেছি, নইলে বাড়ি ব'য়ে এসে তারা মাকে শাসিয়ে যাবে কেন?'

উত্তরে কেমন একটা বেদনাক্লান্ত কণ্ঠে ছন্দা শুধু ব'ললো, 'মাসীমার মুখে শুনেছি।'

থেমে বিজন ব'ললো, 'তুই বরং মেঝেয় নেমে কোথাও ব'স্ ছন্দা। গুটিগুলো কেবল শুকিয়ে আস্চে, এ সময়েই নাকি রোগ ছড়াবার বেশী ভয়। দু'দিন বাদে তো চানই ক'রবো, মিথ্যে এই দু'দিনের জন্যে কেন ঘাঁটাঘাঁটি ক'রবি তুই?'

এবারও ছন্দা এ কথার যথাযথ কিছু একটা জবাব না দিয়ে শুধু ব'ললো, 'বুঝলাম।' তারপর উঠে এসে নির্ম্মলার কাছ থেকে রান্নাঘরের চাবি চেয়ে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মাসীমা ও বিজুদার উপযুক্ত পথ্য প্রস্তুত ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে তবে সে বাড়ি রওনা হ'লো। বাড়ি তো নয়, কণ্টকাকীর্ণ একটা আস্তাকুঁড়।

বিস্ময়ে, আনন্দে ও স্নেহে অভিভূত হ'য়ে গেলেন নির্ম্মলা। বিপদের দিনে এম্‌নি ক'রেই ভগবান মানুষী রূপ নিয়ে এসে পাশে দাঁড়ান। ছন্দার এই যত্ন ভিন্ন আজ আর পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না নির্ম্মলা। নিজের কোঠায় শুয়ে শুয়েই একসময় সাধ্যমত গলা তুল্‌লেন তিনি: 'বিজু, বাবা আমার, কেমন আছিস এখন ?'

পাশের কোঠা থেকে বিজন ব'ল্‌লো, 'ভালো আছি মা। তোমার তো কোনো কষ্ট হ'চ্চে না ?'

—'আর কষ্ট কি বাবা, ছন্দা যে আমার সকল কষ্টের ভার তার নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল।' থেমে নির্ম্মলা ব'ললেন, 'জন্মান্তর ব'লে সত্যিই যদি কিছু থাকে, তবে হয়ত আবার আমাকে জন্ম নিতে হবে, সে শুধু ওর ঋণ শোধ ক'রবার জন্যে। আমি আর একটুও কষ্টবোধ ক'রছি না বাবা।'

কেমন একটা গভীর আবেশে ধীরে ধীরে ক্লান্ত চোখ দু'টি বুজে এলো নির্ম্মলার।

আঠাশ

অঞ্জনা অনেকক্ষণ থেকেই মনে মনে জ্ব'লছিলেন। মিণ্টু আর জিতু স্কুল থেকে ফিরে এসে রুটি খাবে, অথচ আটাটুকুও মেখে রাখেনি ছন্দা। এদিকে উনুনের আগুণ নিভন্তপ্রায়। উনুনই কি রাবণের চিতার মতো সারাদিন জ্ব'ল্বে? এদিকে সারা মাসের হিসেব কষতে গেলে চোখ কপালে ওঠে। সংসারে একটা মেয়ের পিছনেই কি খরচটা কম? এই বাজারেও কম ক'রে ত্রিশ টাকা। অথচ নির্ব্বিবাদে সব ব্যবস্থা ক'রতে হ'চ্ছে তাঁকে; তাতেও অবশ্য দুঃখ ছিল.না, কাজকর্ম্মের জন্য দেখেশুনে কাউকে এনে সংসারে বহাল ক'রলেও এর চাইতে কম খরচা নয় তার পিছনে, কিন্তু আজকাল কাজে যেন প্রায়ই ঔদাসীন্য লক্ষ্যে পড়ে ছন্দার। অঞ্জনার পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন।

ছন্দা এসে ঘরের দাওয়ায় পা দিতেই অম্‌নি মারমুখো হ'য়ে উঠলেন তিনি। —'দিব্বি তো পাড়া বেড়িয়ে দিন কাট্‌ছে, এদিকে যে উনুনের আঁচ ব'সে থাকে না, সে খেয়াল আছে কি! হতচ্ছারী পোড়ারমুখীকে এত ব'লে ব'লেও যদি পারি! বলি এরপর মিণ্টু আর জিতু এসে কি আখার ছাই চিবিয়ে খাবে?'

—'ছাই কেন খেতে যাবে, রুটিই খাবে তারা।' ব'লে এক মুহূর্ত্তও আর বিলম্ব না ক'রে দ্রুত পায়ে নিজের কাজে গিয়ে যোগ দিল ছন্দা।

অঞ্জনা কিন্তু দম্‌লেন না। পরোক্ষে ছন্দার উদ্দেশ্যে নানারকম উক্তি ক'রে বাড়িটাকে মাথায় ক'রে নিলেন তিনি। বাইরের ঘরে ব'সে রসিকলালের কানে গিয়ে সবটুকুই তার বিঁধলো, ইচ্ছে হ'লো—ঘর ছেড়ে সামনের নদী-তীর দিয়ে খানিকক্ষণ পায়চারি ক'রে আসেন তিনি; কিন্তু অক্ষম, বাতের কঠিন আক্রমণে আজ তিনি একেবারেই পঙ্গু হ'য়ে প'ড়েছেন। নইলে ইচ্ছে হয় না অঞ্জনার এই চীৎকারের মুহূর্ত্তগুলিতে ঘরে ব'সে থাকেন। আপিসে প্রাকটিশ আজকাল একেবারেই বন্ধ হ'য়েছে, বন্ধ না হ'য়ে উপায় কি? আপিসে গিয়ে হাকিমের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারলে তবে তো পয়সা! পুরনো মক্কেল আর জুনিয়ার উকীল কেউ কেউ বাড়ি ব'য়ে এসে বুদ্ধি-পরামর্শ ক'রে যায় ব'লে দু'চার পয়সা যা ঘরে আসে। নইলে সে পথও বন্ধ। মনের এই অর্থনৈতিক

চাপের মধ্যে স্ত্রীর এই অশোভন রূঢ়তা পুড়িয়ে মারছে তাঁকে প্রতি মুহূর্ত্তে। সব দিক থেকে একটা দারুণ অস্থিরতায় আজ বিষিয়ে উঠেছেন তিনি নিজের মধ্যে।

মনে মনে একবার অদৃষ্ট-দেবতাকে স্মরণ ক'রলেন রসিকলাল, তারপর আপন মনেই একসময় নিমিলিত চক্ষে রামপ্রসাদী একটা সুর ভাঁজতে লাগলেন কণ্ঠে—'আসার আসা ভবে আসা—।'

অঞ্জনা ততক্ষণে পিছনের খিরকি দুয়ার দিয়ে কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'য়েছেন। এ সব মুহূর্ত্তে খুব বেশী দূর যান না তিনি। কাছাকাছিই কোনো বাড়ির গৃহিণীর কাছে ব'সে এ-কথায় সে-কথায় নিজের অদৃষ্টকে খাড়া ক'রে সহানুভূতি আদায়ের অবকাশ খোঁজেন। আজও তাই ক'রলেন।

কিন্তু যাকে নিয়ে সংসারে তাঁর এত জ্বালা, সে কিন্তু আজ আর অঞ্জনার এত-কিছুতেও নিজের কর্ত্তব্য থেকে বিরত থাক্‌তে পারলো না। বিজুদা আজ কঠিন অসুখে শয্যাগত, মাসীমা নির্ম্মলাও সেই সঙ্গে শয্যা নিয়েছেন, আজ আর তাঁদের মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পর্য্যন্ত কেউ নেই ; চোখের সাম্‌নে এ দৃশ্য দেখে কোন্ প্রাণে দূরে স'রে থাক্‌বে ছন্দা ? তার এই তাপদগ্ধ জীবনে আশা-আনন্দের একমাত্র আধার যে তাঁরাই ! তাঁদের মুখ চেয়েই তো তার এই প্রতিদিনের দুঃখ-স্বীকৃতি, নইলে মাগুরায় এই নবগঙ্গা-বিধৌত মাটিতে তার জন্য একবিন্দু স্নেহও কি কোথাও অবশিষ্ট আছে ? কাকাবাবু আজ সংসারে থেকেও নেই, তাঁর স্নেহ-ছায়ায় গিয়ে এক দণ্ডের জন্যও ব'স্‌বার অবকাশ পেলো না সে কোনোদিন। কি নিয়ে কোন্ আশায় তবে মাগুরার প্রেমে সে অন্ধ হ'য়ে রইল ? সে ঐ বিজুদা আর মাসীমা নির্ম্মলা ! তাঁদের জন্য প্রাণ দিতেও তার আনন্দ।

গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম্ম চুকিয়ে আবার এসে একসময় ব'স্‌লো সে নির্ম্মলার শিয়রে। মুখের উপর থেকে তখনও তার কালো ছায়াটুকু মিলিয়ে যায় নি। সেটুকু লক্ষ্য ক'রে শিথিল কণ্ঠে একসময় নির্ম্মলা জিজ্ঞেস্ ক'রলেন, 'আবার কিছু-একটা নিয়ে অঞ্জনা নিশ্চয়ই গলা তুলেছে, তাই না মা ? কি হ'য়েছে খুলে বল্ দিকি !'

সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে চোখ ফেটে এবারে জল এলো ছন্দার। অতি কষ্টে সেটুকু সম্বরণ ক'রে নিয়ে সে ব'ললো, 'এমন অদৃষ্ট ক'রেই এসেছিলাম মাসীমা যে, আপনার আর বিজুদার এই অসুখের সময়েও সর্ব্বক্ষণের জন্যে আপনাদের

কাছে থেকে উপযুক্ত শুশ্রূষা ক'রতে পারছি না। সংসারে মানুষ কবে মানুষকে তার ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়ে কথা ব'লতে শিখবে, ব'লতে পারেন মাসীমা ?'

অনুমান মিথ্যে নয় নির্ম্মলার। ব'ললেন, 'ওটা যে আমারও প্রশ্ন মা। এ প্রশ্নের হয়ত সত্যিই জবাব নেই।' তারপর থেমে ব'ললেন, 'আমাদের জন্যে তুই যা ক'রছিস্, তার কি সত্যিই তুলনা আছে মা ? সারাক্ষণ কাছে না থাক্‌লেই কি শুশ্রূষা হ'লো না! এ যে আমি পাবার চাইতেও অধিক পেয়েছি। সংসারের দিক থেকে দুঃখ করিস নে ছন্দা; অন্যায়ের শাস্তি ভগবান তাঁর নিজের হাতে দেন, অঞ্জনাকেও একদিন সে শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে।'

বোধকরি প্রসঙ্গটা চেপে যাবার জন্যই এবারে নতুন কথার অবতারণা ক'রলো ছন্দা। বাইরে আকাশটা সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল, সাম্‌নের দরজার দিকে ঝুঁকে সেদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে সে ব'ললো, 'এখনই বোধকরি চেপে বৃষ্টি আসবে মাসীমা। যাই, বিজুদাকে একবার দেখে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পালাই। নইলে ওদিকে হয়ত আবার শ্মশান জ্ব'ল্‌বে।'

বাধা দিলেন না নির্ম্মলা। ব'ল্‌লেন, 'তাই যা মা।'

বিজন জেগেই ছিল। কাছে এসে ছন্দা জিজ্ঞেস্ ক'রলো, 'অনেকটা সুস্থ বোধ ক'রছো তো বিজুদা ?'

—'পুরোপুরিই তো সুস্থ হ'য়ে উঠেছি।' থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'এমন কল্যাণময়ীর সেবার হাত যেখানে প্রসারিত, সেখানে রোগ ব'লে কিছু থাক্‌তে পারে ? তুই না থাক্‌লে আমার কি হ'তো, আমি শুধু সেই কথাটাই ভাবচি।'

—'অম্‌নি ক'রে বোলোনা বিজুদা। তোমার সুস্থ হ'য়ে উঠবার পিছনে আমার যে কাণাকড়িও কিছু নেই, সে কি আমিই জানিনে! পারলুম কোথায় আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে প্রাণ ভ'রে সেবা ক'রতে, ভগবান সে সুযোগ আমাকে দেন নি। আজ আর সংসারে আমার দুঃখ ঢেকে রাখ্‌বার জায়গা নেই বিজুদা।' ব'ল্‌তে গিয়ে চোখ দু'টো সহসা ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌লো ছন্দার। মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে লক্ষ্য ক'রতে গিয়ে সে দেখলো—একটু আগে যা আশঙ্কা ক'রেছিল, তা-ই হ'লো। ভাদ্রের আকাশ ভেঙে ধারা নেমে এলো সহসা। একটা দুরন্ত ভয়ে বুকখানি একবার দুর-দুর ক'রে কেঁপে উঠলো তার। দুয়ারে হয়ত অপেক্ষা ক'রে থাকবেন কাকিমা। রুদ্র ভয়াল সেই চোখের দৃষ্টি। দুর্ব্বাসার চাইতেও তা তীক্ষ্ণ—জলন্ত।

বিজন ব'ল্‌লো, 'সংসার মানেই দুঃখের ক্ষেত্র। দুঃখের অনলে পুড়ে পুড়েই সুখের স্বপ্ন দেখে যেতে হবে।' নিজের অলক্ষ্যেই ছন্দার একখানি হাত নিজের রোগশীর্ণ হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে পুনরায় বিজন ব'ল্‌লো, 'যা একদিন অতি স্বাভাবিক ভাবেই হ'তে পারতো, ভাগ্য সেখানে কি নিষ্ঠুর খেলাই না খেল্‌লো! মনে পড়ে সেই দিনটির কথা ছন্দা, মাগুরার এই মাটি ছেড়ে যাবার আগে যেদিন তুই আমাকে চিঠি লিখলি দৌলতপুরে। সমুদ্রে ঝড় বইলে প্রচণ্ড ঢেউ যেমন আছাড় খেয়ে পড়ে, আমার মনটাও সেদিন ঠিক তেম্‌নিই হ'য়েছিল। আজ তা ঠিক খুলে ব'ল্‌তে পারবো না। তুই যে আমার, চিরকালের আমার, এ কথা কি একটি মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল্‌তে পারলাম!'

ছন্দা এবারে কেন যেন আরও অনেকখানি চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বিজনের হাত থেকে নিজের হাতখানিকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লো, 'ছিঃ, ছিঃ, ওকথা মুখে এনো না বিজুদা। ওতে আমার স্বামীর আত্মার অকল্যাণ হবে, ভগবান অভিশাপ দেবেন।'

—'সে অভিশাপ তোর হ'য়ে আমিই মাথা পেতে গ্রহণ ক'রবো। শ্যামলকান্তির আত্মার কল্যাণ—সে কি আমিই কম কামনা ক'রছি দিনরাত?' কেমন একটা বিহ্বল দৃষ্টিতে চোখ দুটোকে তুলে ধ'রলো বিজন ছন্দার চোখের দিকে।

বাইরে তখনও অবিশ্রাম বর্ষণ চ'লেছে। সত্যিই বড় বিশ্রীভাবে আট্‌কে প'ড়তে হ'লো ছন্দাকে। কথাটাকে চাপা দেবার জন্যই এবারে সে ব'ল্‌লো, 'শুনেছি রেবারা কল্‌কাতায় আছে। তুমি যে এতকাল কল্‌কাতায় কাটিয়ে এলে, দেখা হয়নি রেবার সঙ্গে?'

সমস্তটা চেতনার মধ্য দিয়ে কেমন একটা অধীর চাঞ্চল্য খেলে গেল এবারে বিজনের। ব'ল্‌লো, 'যা ভুলে গিয়েছিলাম, অন্ততঃ যা ভুলে থাক্‌তে চেয়েছিলাম, তাকেই তুই খুঁচিয়ে তুল্‌লি ছন্দা? ভুল ক'রে একদিন তার ভালোবাসা পেতে গিয়েছিলাম; সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমার হ'য়েছে। ব্যারিষ্টার দিলীপ দত্তের সে প্রাণ-লক্ষ্মী। এতদিনে তাদের বিয়ে হ'য়ে যাওয়া উচিৎ।'

ছন্দা কিন্তু বিজনের কথায় এতটুকুও কিছু মনে ক'রলো না। এ-কথা জেনেই এমন অকপটে বিজন ব'ল্‌তে পারলো তাকে কথাটা। উত্তরে ছন্দা শুধু ব'ল্‌লো, 'চিরায়ুষ্মতী হোক্‌ রেবা।' তারপর থেমে ব'ল্‌লো, 'মেঘে মেঘে

তো কম বেলা হ'লো না! তোমারও কিন্তু এতদিনে দেখে শুনে কাউকে ঘরে আনা উচিৎ ছিল। মাসীমার আজ কত কষ্ট হ'চ্ছে, বলো তো? তাঁরই কি কিছু-একটা সাধ আহ্লাদ নেই? এবারে সুস্থ হ'য়ে উঠে ঘরে বউ আনো তুমি বিজুদা, দেখে আমিও চোখ জুড়োই।'

—'ঘরে না এলেও মনে যে তার প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেছে অনেক আগেই।' ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো, 'ঘরের এই ছোট্ট কোঠায় যার স্থান হ'লো না, মনের মণি-কোঠায় সে যে রাজেন্দ্রাণী হ'য়ে আছে! আমার মনের মধ্যে একবার তাকিয়ে দেখ, দেখ—সত্যিই চোখ জুড়োয় কি না!'

কথাটার অর্থ বুঝতে বেগ পেতে হ'লো না ছন্দাকে। দেখ্‌তে দেখতে মুখখানি তার অস্বাভাবিক লাল হ'য়ে উঠলো। এতক্ষণ যত সহজভাবে সে ব'সে থাক্‌তে পেরেছিল, এবারে তার পক্ষে তা কঠিন হ'য়ে উঠ লো। বৃষ্টির বেগ ঈষৎ ক'মে এসেছিল মাত্র। সেদিকে আর-একবার লক্ষ্য ক'রে শুধু সে ব'ল্‌লো, 'উঠি বিজুদা, বেশী দেরী ক'রলে বাসায় গিয়ে আর রক্ষা থাক্‌বে না।'—বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা না ক'রে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে প'ড়লো ছন্দা।

বাধা দিতে গেল বিজন, কিন্তু টিক্‌লো না; উঠোন পেরিয়ে ততক্ষণে দৃষ্টির আড়ালে চ'লে গেছে ছন্দা।

এম্‌নি ক'রে আরও দু'টো দিন কেটে গেল। অসুখ নিয়ে যা ভয় ছিল বিজনের, এবারে তা থেকে সে মুক্ত হ'য়ে বাঁচলো। নিমপাতা আর কাঁচা হলুদ-বাটা সাবানের মতো ক'রে সারা গায়ে মেখে সাধ মিটিয়ে স্নান ক'রলো সে। এতদিন এই স্নানটুকুর অভাবে কেমন বিশ্রী লাগছিল তার। স্নানের যে কী আনন্দ, আজ তা নতুন ক'রে সে উপলব্ধি ক'রলো। তাই ব'লে শরীরের অবসন্নতা কিন্তু হঠাৎই কাট্‌লো না। অন্নপথ্য সে দু'দিন আগেই ক'রেছিল, সেদিকে ত্রুটি রাখেনি ছন্দা, কিন্তু ত্রুটি থেকে গেল স্নায়ুতন্ত্রীতে। আজ আর আগেকার মতো তেমন স্বাচ্ছন্দ্য নেই দেহে। অথচ একটি বেলাও আজ আর ঘরে বন্দী হ'য়ে থাক্‌তে মন চাচ্ছে না। অসংখ্য কাজ ছড়িয়ে র'য়েছে তার বাইরে, কে তার সেই কাজের ভার নিয়ে দাঁড়াবে? ব'ল্‌তে গেলে সমস্তটা গ্রামই আজ রুখে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে; সন্ধ্যার তাম্রকুটে টিকি-বিলাসীরা গ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে বড়-বেশী মেতে উঠেছে, তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কিছু একটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। সমাজ শুধু

একজনকে নিয়ে নয়, সকলকে নিয়েই সমাজ। গ্রামের টিকি-বিলাসীদের সেটুকু বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বৈ কি!

কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে সমস্ত মনটা হঠাৎ বড় তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো বিজনের।...

এ ক'দিনে কতকটা শুধ্‌রে উঠেছিলেন নির্ম্মলা। মাথা খাড়া ক'রে কিছু সময়ের জন্যও অন্ততঃ ব'স্‌তে পারলেন। একসময় কাছে ডেকে নিয়ে দু'বাহু দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রে ভাবাবেগে অনেকক্ষণ তন্ময় হ'য়ে ব'সে রইলেন তিনি। মায়ের প্রাণ, প্রবোধ মানেনি এতদিন। ব'ল্‌লেন, 'ইস্‌, এ ক'দিনেই শরীর শুকিয়ে তোর কী হ'য়ে গেছে বাবা! নিজের শরীরটা নিয়ে এ ক'দিনের মধ্যে একটি ক্ষণের জন্যেও যদি গিয়ে ব'স্‌তে পারলাম তোর পাশে!' বিজনের পিঠের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন নির্ম্মলা।

বিজন ব'ল্‌লো, 'আমিই কি ছাই পেরেছি একদণ্ডের জন্যেও তোমার শিয়রে এসে ব'স্‌তে! মন তাতে প্রবোধ মানেনি মা। নাও, বেশীক্ষণ ব'সে না থেকে এবারে শুয়ে পড়ো দিকি! এরপর আবার মাথা ঘুরোতে সুরু ক'রবে।'

আপত্তি ক'রলেন না নির্ম্মলা। ঈষৎ কাৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ব'ল্‌লেন, 'তুই যেন সাত-তাড়াতাড়িই আবার উঠে যাস্‌নে বাবা। কিছুক্ষণ আমার কাছে ব'স্‌ বিজু।'

এ ক'দিন ছন্দা এসে যথানিয়মেই কর্ত্তব্য পালন ক'রে গেছে, কিন্তু বোধ করি ইচ্ছে ক'রেই বিজনের সান্নিধ্য থেকে দূরে দূরে কাটিয়েছে সে। তাতে যে শান্তি পেয়েছে, তা নয়; কিন্তু মুখোমুখি ব'সে তার চোখের দিকে চোখ দু'টো তুলে ধ'রতে যেতেও যে কম অশান্তি নয়! ইচ্ছে ক'রেই তাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্ম্মলার সঙ্গে দু'একটা কথা ব'লে নিজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নীরবে আবার ঘরে ফিরে গেছে ছন্দা। কিন্তু এম্‌নি ক'রেও সে বড়-বেশীদিন পারলো না। পরের দিনই আবার এসে সে সহজভাবেই বিজনের সাম্‌নে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস্‌ ক'রলো, 'আজ কেমন বোধ ক'রছো বিজুদা? দুর্ব্বলতা ক'মেছে একটুও?'

—'কিছুটা।' থেমে বিজন ব'ললো, 'দিন কতক তো কেবল গা ঢাকা দিয়েই রইলি, এ ক'দিন তো কই এম্‌নি ক'রে জিজ্ঞেস্ করিস্ নি ?'

ছন্দা বুঝলো—অভিমান ক'রেছে বিজুদা। নীরবে তাই কাছে এগিয়ে এসে তেম্‌নি সহজভাবেই তার শিয়রের পাশে ব'সে প'ড়লো সে। ব'ললো, 'তোমার মতো মানুষের সঙ্গে কারুকে আবার কথা ব'লতে আছে, বড্ড অসভ্য তুমি।'

কথাটা ছন্দার মনের কথা নয়। তবু মুখে এসে গেল।

বিজন বুঝলো—নিজেকে খুলে ধ'রবার বিপদ কোথায়! ব'ল্‌লো, 'এতদিনে তবে এই কথাটাই বড় হ'লো ?'

—'অম্‌নি রাগ ক'রলে তো ?' অনুরাগের কণ্ঠেই কথাটা ব'ল্‌লো ছন্দা।

বিজন ব'ললো, 'তোর উপর কখনও রাগ ক'রতে পারি ?'

—'কেন, আমি কী যে, রাগ ক'রতে পারো না ?'

—'তুই যা ঠিক তা-ই।'

অলক্ষ্যে মৃদু একটুক্‌রো হাসি গোপন ক'রে নিল ছন্দা, কিন্তু এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আর কিছু একটাও প্রশ্ন তুলতে পারলো না।

থেমে বিজন ব'ল্‌লো, 'এ ক'দিন যে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রলি তুই, তা ভাবলে বিস্মিত হ'তে হয়। কবে শিখ্‌লি তুই এত, বল্ তো ?'

—'কাজ কখনও শিখতে হয় না মেয়েদের, এটা তাদের সহজাত বৃত্তি।' ছন্দা ব'ল্‌লো, 'কিন্তু সত্যিই কি পরিশ্রম ক'রতে পেরেছি বিজুদা, পারলে বোধ করি শান্তি পেতাম।'

স্মিতহাস্যে বিজন ব'ললো, 'তেমন শান্তি হয়ত সত্যিই তোর কপালে লেখা নেই! তা যাক্, এ ক'দিন তো রোগের সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রে কাটলো, এবারে আর ব'সে থাক্‌তে পারছি না। ভেবেছি কালই বেরোবো।'

—'কোথায়, লাঙ্গল ধ'রতে ?' ঠাট্টার সুরে কতকটা কৌতুক প্রকাশ পেলো ছন্দার কণ্ঠে।

বিজন ব'ললো, 'প্রয়োজন হ'লে তাও ধ'রতে হবে বৈ কি! লাঙল যার জমি তার, জানিস্ তো ? দেশের জমিকে যদি উর্ব্বর ক'রে তোলাই না গেল, তবে বাঁচবে কেমন ক'রে দেশের লোক ? তাছাড়া পাঠশালাটাও বন্ধ হ'তে ব'সেছে। ছোট ছোট ঐ শিশুরা একদিন মানুষ হ'য়ে দেশকে রক্ষা ক'রবে প্রাণ

দিয়ে। দেশে সত্যিকারের কৃষক-রাজের প্রতিষ্ঠা সেদিন। ভাবতেও কি ভালো লাগে না ছন্দা?'

সহসা এ কথার কিছু একটা জবাব দিতে পারলো না ছন্দা। পরে একসময় ব'ললো, 'আমি ভাবচি, দেশের সকলে কেন তোমার মতো হয় না বিজুদা?'

—'হবে, সবাই দেশের জন্যে একদিন প্রাণ দিয়ে কাজ ক'রবে। দেশের মানুষের সেই শুভবুদ্ধি একদিন জাগতেই হবে, নইলে তারাও যে বাঁচবে না। দেশের মানুষ যে এখনো দেশকে কাছে পায়নি! গ্রহণ লেগে যেমন সূর্য্য ঢাকা প'ড়ে যায়, আমাদেরও হ'য়েছে তা-ই।' ব'লে একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস চেপে নিল নিজের মধ্যে বিজন।

থেমে ছন্দা ব'ললো, 'কিন্তু কালই যে তুমি বেরোতে পারো না বিজুদা! শরীর এখনও ভাল ক'রে শোধরায়নি তোমার; এই শরীর নিয়ে কাজে বেরোলে আবার তুমি অসুখে প'ড়বে।' বিজনের চুলের ভিতর দিয়ে নরম হাতে ধীরে ধীরে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতে লাগলো ছন্দা।

ইতিমধ্যে কখন্ সাম্‌নের দাওয়ায় এসে সুখদা ঠাকরুণ দাঁড়িয়েছে, তা কারুরই নজরে পড়েনি। ছন্দার যত্নের দিকটা প্রথম দৃষ্টিতেই তার লক্ষ্যে প'ড়েছিল, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে নির্ম্মলার ঘরের সামনের দিকে এগিয়ে এসে এবারে সে ডাক্‌লো, 'কৈ গো বাড়ুজ্জে-বউ, খবর কি তোমাদের, বিজু কেমন আছে?'

নিজের শয্যা থেকেই ঈষৎ মাথা তুলে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বিজু যাহোক্ তবু কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে, গাঁয়ের পাঁচজনের আর ভয় নেই ওকে নিয়ে; কিন্তু আমার আজ আর এমন শক্তি নেই যে মাথা তুলে বেশীক্ষণ ব'সতে পারি।'

—'কেন গো, তোমার আবার কি হ'লো?' উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে খানিকটা আত্মীয়তার ভাব টানতে চেষ্টা ক'রলো সুখদা।

কাতরকণ্ঠে নির্ম্মলা ব'ল্‌লেন, 'বিধাতার বোধ করি ইচ্ছে নয় যে, আমি আর বেশীদিন সংসারে থাকি। মাথার রোগটা এবারে বড় বেশী বেড়েছে। উঠে এসে যে পিঁড়িখানাও এগিয়ে দেবো, এমন সাধ্য নেই।'

—'না, না, সে কি কথা, পিঁড়ি কেন এগিয়ে দিতে হবে! আমার কি ব'স্‌বার সময় আছে—না ম'রবার সময় আছে! এক্ষুণি না গেলে আবার

ওদিকে সব রসাতলে যাবে। সংসার তো করি না, নরকের পিণ্ডি চট্‌কাই।'
থেমে সুখদা ব'ললো, 'মাথার রোগ তো ভালো নয়, আমার ভাসুরপোকে এই নিয়ে রাঁচি পর্য্যন্ত দৌড়োতে হ'য়েছিল; তুমি বরং শরীরের দিকে একটু বেশী যত্ন নিয়েই তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে উঠতে চেষ্টা করো।'

—'আর সুস্থ হ'য়েছি,—এখন তাড়াতাড়ি চোখ বুজে যেতে পারলে বাঁচি।' ব'লে আবার বালিশের উপর মাথা রাখলেন নির্ম্মলা।

সুখদা ব'ল্‌লো, 'ছিঃ, ছিঃ, ও কি কথা, ও কথা মুখেও আন্‌তে নেই বাড়ুজ্জে-বউ। সংসারে কার কতদিন পের্‌মাই, সে কিছু বলা যায়! তাড়াতাড়িই তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠবে, এই আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি।' ঘরের চৌকাঠের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে দক্ষিণ হাতখানিকে একবার সাম্‌নের দিকে প্রসারিত ক'রলো সুখদা, তারপর বিদায় নিয়ে তক্ষুণি আবার দাওয়া থেকে নেমে উঠোনের একদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অনেকক্ষণ থেকেই কেমন একটা দারুণ অস্বস্তি বোধ ক'রছিলেন নির্ম্মলা, সেটা যে সুখদা ঠাকুরুণের এই আকস্মিক উপস্থিতির জন্যই—তাতে সন্দেহ নেই, এবারে সেই অস্বস্তি অনুশোচনার জ্বালা হ'য়ে কেবলই তাঁকে বিদ্ধ ক'রতে লাগ্‌লো।

ছন্দার কথার জবাবে কি একটা বল্‌তে গিয়ে হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেলেছিল বিজন। সুখদার প্রতি দৃষ্টি না গেলেও তার কণ্ঠস্বরকে অনায়াসে সে চিনে নিতে পেরেছিল। পেরেছিল ব'লেই মনে মনে সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ছিল সুখদা ঠাকুরুণের উপর। ছন্দার কথার জবাবে তাই সে কিছু একটাও ব'লে উঠতে পারছিল না; বরং সেও নির্ম্মলার মতই কেমন একটা দারুণ অস্বস্তিতে নিজের মধ্যে অনবরতই দুঃসহ একটা জ্বালা বোধ ক'রছিল।

ছন্দা কিন্তু সেটুকু আদৌ বুঝ্‌তে পারলো না। স্বাভাবিক কণ্ঠেই সে ব'ললো, 'পাপ বিদেয় হ'লো যা হোক্‌। এবারে উঠি বিজুদা। বলো, আমার কথা রাখলে? পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া অবধি তুমি কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে না। তা ছাড়া মাসীমার এই অবস্থা, কখন্ কোন্‌টুকু প্রয়োজন হয়, সেটুকুও তো দেখ্‌তে হবে!'

বিজন এ কথার কিছু একটাও জবাব দিতে পারলো না, শুধু ছন্দার মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল মাত্র।

নীরবে তার পাশ থেকে একসময় উঠে প'ড়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালো ছন্দা।···

নির্ম্মলার উঠোন পেরিয়ে পথে নেমে আস্তে গিয়ে সুখদা ঠাক্রুণের কিন্তু পিত্ত জ্ব'লে যাচ্ছিল। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, পরের ঘরের সোমত্ত বিধবা মেয়েটা কিনা নির্ব্বিবাদে এসে আইবুড়ো ছোঁড়াটার অসুখের সুযোগ নিয়ে তার সাথে রঙ্গ-পীড়িত ক'রছে! ঘেন্নায় গা জ্ব'লে যায় দেখলে। ঘরে এসে হরি মুখুজ্জের কানে কথাটা না তুলে পারলো না সে।

হরি মুখুজ্জে ব'ল্লেন, 'বলো কি পিসি? শুধু চাষি-মজুরই নয়, শেষ পর্য্যন্ত রসিকের বিধবা ভাইঝিটিকে অবধি হাত ক'রেছে বিজু? ছোটবেলায় ওরা একসঙ্গে খেল্তো কি না, গায়ে বসন্ত লেগে মনে আজ তাই বাল্যপ্রেম হঠাৎ উথলে উঠেছে। গাঁয়ে বাস ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ডাঁহা একটা কেলেঙ্কারী দেখতে হবে আমাদের।'

খুসীতে খানিকটা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো এবারে সুখদা।—'তা—যা ব'লেছ। কিন্তু ব্যাপারটা কি চেপে যাওয়া ভালো?'

—'কিছুমাত্র না। রসিকের স্ত্রীকে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার—ঘরের মেয়েকে যদি তারা সাম্লাতে না পারে তো গ্রামে তাদের একঘরে হ'য়ে থাক্‌তে হবে।'

কথাবার্ত্তায় আগাগোড়াই চট্‌পটে হরি মুখুজ্জে। কিছু একটা সিদ্ধান্ত প্রকাশ ক'রতে তাই তাঁর বেগ পেতে হ'লো না।

সুখদাও এম্‌নি একটা জবাবই প্রত্যাশা ক'রেছিল। মনে মনে এবারে তাই আশ্বস্ত হ'লো সে।

সন্ধ্যায় চক্রবর্ত্তী-বাচস্পতিদের হুঁকোর আসরটা এই নিয়ে গরম হ'য়ে উঠলো।

—'তুমি তো তবে জব্বর মজার খবর পরিবেশন ক'রলে হে মুখুজ্জে!'

—'মজা ব'ল্তে মজা, একেবারে রসালো ব্যাপার।' ব'লে খানিকটা অর্থপূর্ণ হাসি হাস্‌লেন হরি মুখুজ্জে।

—'খাও, খাও, তুমি বরং দু'ছিলিম বেশী তামুকই আজ টানো; রসালো সংবাদে কিছু রসের জোগান চাই তো বটেই!' ব'লে হাতের হুঁকোটা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে ধ'রলো ভবানী চক্রবর্ত্তী।

নির্ব্বিবাদে সেটাকে নিজের হাতে টেনে নিয়ে আচ্ছা ক'রে একটা দম ক'ষলেন হরি মুখুজ্জে। সাজা তামাকে টান দিতেই ধোঁয়ার আধিক্য ঘট্‌লো। সামান্য একটা ফুৎকারেই তা বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লো। সেইদিকে তাকিয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন হরি মুখুজ্জে: 'আঃ—!'

বিষয়টা সেদিনের মতো এখানেই সমাপ্ত হ'লো।

কিন্তু সুখদা ঠাক্‌রুণের তাই ব'লে উদ্যমের ত্রুটি ছিল না। সে ইতিমধ্যেই বার দু'য়েক গিয়ে রসিকলালের বহির্দ্দুয়ার দিয়ে ঘুরে এসেছে, কিন্তু অঞ্জনার দেখা মেলেনি। দু'দণ্ড তার সঙ্গে নির্জ্জনে না ব'সতে পারলে বিষয়টা ভালো ক'রে তার কানে তোলা যাবে না।

পরের দিন সমস্ত বেলাটাই হরি মুখুজ্জে তাকে আট্‌কে রাখলেন। নব-গঙ্গার উত্তাল স্রোতে নদীর দক্ষিণ পাড়ের একটা দিক একেবারেই ধ্বংসে প'ড়েছে। নবগঙ্গা আরও কিছুটা এগিয়ে এলে হরি মুখুজ্জের ভয়ের কারণ আছে। তাঁর মোক্‌রশি জমি নিয়ে তবে টান দেবে নবগঙ্গা। এই নিয়ে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে সারাদিন ঘর আর বার ক'রলেন হরি মুখুজ্জে। ঘরের পঁহুরিদার একমাত্র তাঁর পিসী, অতএব সুখদা ঠাক্‌রুণকে একরকম বাধ্য হ'য়েই উৎকণ্ঠিত থাক্‌তে হ'লো তার ভাইপোটিকে নিয়ে।

কিন্তু নবগঙ্গা যদি সত্যিই হরি মুখুজ্জের দিকে করাল মুখব্যাদান করে, তবে মাগুরার দুর্জ্জয় পুরুষসিংহ হ'য়েও হরি মুখুজ্জের সাধ্য কি নবগঙ্গার সেই রুদ্র গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পাবার?

সন্ধ্যায় আজ তাঁর হুঁকোর আসরটা তাই একেবারেই বরবাদ হ'য়ে গেল। উপযাচক হ'য়ে বরং ভবানী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এসে তাঁকে খানিকটা আশ্বস্ত ক'রে গেল। রাত্রে নির্ব্বিঘ্ন নিদ্রার ব্যাঘাত ঘট্‌লেও ভোরে উঠে তাই সমস্ত ব্যাপারটাকে একরকম অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দিয়েই খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন হরি মুখুজ্জে।

সুখদা ঠাক্‌রুণও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। একটা দিনের গৃহবদ্ধ জীবনে ক্ষতির পরিমাণটা তার নিতান্ত সামান্য নয়। রসিকলালের বাড়ি অবধি গিয়ে তাকে আর ধাওয়া ক'রতে হ'লো না, মাঝপথেই একসময় অঞ্জনার সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেল। ব'ল্‌লো, 'তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম সবির মা।'

সবিতার পরিচয়েই অঞ্জনাকে সবি'র মা ব'লে ডাকে সুখদা।

ঈষৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে অঞ্জনা ব'ল্‌লেন, 'তবু ভাগ্যি যে অভাগীকে মনে প'ড়লো!'

—'মনে কি পড়ে না, নইলে যাচ্ছিলাম কি ক'রে!' থেমে আসল বক্তব্যের সূত্র টেনে সুখদা ব'ল্‌লো, 'তবে কি জানো সবির মা, নিজের চোখের উপর তোমাদের আইবুড়ি বিধবা মেয়েটার নষ্টামি দেখে তোমার ওখানে যেতে বড় বেশী আর মন সরে না।' ব'লে মনে মনে খানিকটা তৃপ্তির হাসি হাস্‌লো সুখদা, কিন্তু মুখে তার ফুটে উঠলো কেমন একটা অস্বস্তির চিহ্ন।

কথাটা শুনেই ব্রহ্মতালুতে আগুন জ্ব'লে উঠলো অঞ্জনার। ব'ল্‌লেন, 'কেন, কি ব্যাপার, খুলেই বলোনা কেন শুনি?'

—'ব'ল্‌বো কি, ব'লতে যে নিজেই লজ্জায় ম'রে যাই।' সুখদা ব'ল্‌লো, 'বলি—রঙ্গরস ক'রবি, করার তো আর বয়স যায়নি, বুঝি, কিন্তু তাও কি গাঁয়ে থেকে ভর দুপুরে ঐ বিজু ছোঁড়াটার সঙ্গে? তাও তো গায়ে বসন্তের গুটি! বলি ভয় ডর ব'লেও কি কিছু নেই? একেই তো সারা গাঁ তটস্থ হ'য়ে র'য়েছে, এরপর ধরো ছন্দার আঁচল ধ'রে মা শীতলার অধম বাহনটি যদি একবার তোমার সংসারে ঢুকে পড়ে, তবে কি হবে বলো দিকি?'

কিন্তু অঞ্জনার মুখে তখন আর কোনো প্রশ্নই নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে নিজের মধ্যে নিজে জ্ব'ল্‌ছেন তিনি।

স্বল্প থেমে পুনরায় গলা তুল্‌লো সুখদা ঠাক্‌রুণ: 'ভাবলাম অনেক কাল বাড়ুজ্জে-বউয়ের খোজখবর রাখিনি, দেখে আসি কেমন আছে! গিয়ে দেখি —শুয়ে শুয়ে কাত্‌রাচ্ছে বাড়ুজ্জে-বউ, পাশের ঘরে শুয়ে ব'সে রঙ্গ-তামাসা ক'রছে বিজু আর ছন্দা। এই নিয়ে গাঁয়ের পাঁচজনে যদি পাঁচ কথা বলে, তবে অপমানটা তো তোমারই! বুঝেছ সবির মা, দেখে নিজেই ঘেন্নায় ম'রে গেলাম। এখনও ও মেয়েকে তোমার সাম্‌লাও ব'ল্‌ছি। নইলে কবে দেখবে তোমার সংসারের মুখে চুন-কালি দিয়ে একদিন ভেগে প'ড়েছে মেয়ে।'

চুন-কালি কি এখনই কম প'ড়লো অঞ্জনার মুখে? রাগে সারা মুখ তখন তাঁর লাল হ'য়ে উঠেছে! সুখদাকে যে নতুন কিছু একটাও প্রশ্ন ক'রবেন, এমন কোনো কথাও আপাতত খুঁজে পেলেন না তিনি। তবু কণ্ঠস্বরের উপর যথাশক্তি জোর দিয়েই সুখদার কথার পৃষ্ঠে একবার প্রশ্ন তুল্‌লেন অঞ্জনা: 'তুমি দেখেছ, নিজের চোখে তবে তুমি স্পষ্ট দেখেছ দিদি-ঠাক্‌রুণ?'

—'ও মা, তবে কি ব'ল্‌ছি!' মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে চোখ কপালে তুল্‌লো সুখদা। ব'ল্‌লো, 'আমার কি খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই, মিথ্যে বানিয়ে ব'লছি এসে তোমাকে? মেয়েরও তোমার জিদের বলিহারী, আমাকে দেখেও ন'ড়লো না তবু বিজুর কাছ থেকে!'

আর কথা বা সাক্ষী-প্রমাণের প্রয়োজন নেই অঞ্জনার। মনে মনে তবে এই নিয়েই গাঁয়ে ফিরে এসে কেবল বাইরে বাইরে ঘুর-ঘুর মন হ'য়েছে ছন্দার! অঞ্জনার চোখে কোনো কিছুই এড়ায় না। তিনি ঠিকই ধ'রতে পেরেছিলেন, কিন্তু এতখানি বুঝতে পারেন নি। সুখদার কথায় এবারে তা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। নিজেকে এবারে আর তাই কিছুতেই সম্বরণ ক'রতে পারছিলেন না অঞ্জনা। মাথার উপরে প্রখর সূর্য্য না থাক্‌লেও সূর্য্য-তাপের মতই ব্রহ্মতালু তাঁর তেতে পুড়ে যাচ্ছে। কি মনে ক'রে আকাশের দিকে একবার তাকাতে গিয়ে দেখলেন—পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ভাদ্রের আকাশ ঢাকা প'ড়ে গেছে। বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা ক'রলেন না অঞ্জনা, ব'ল্‌লেন, 'কথাটা ব'লে তুমি ভালো ক'রলে দিদি-ঠাক্‌রুণ!' তারপর সোজা বাড়ির দিকেই দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন তিনি।

এতক্ষণে তবে সুখদা ঠাক্‌রুণের মাথার বোঝা কিছু নাম্‌লো। অনেকক্ষণ ধ'রে সে একাগ্র চোখে অঞ্জনার চলা-পথের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মধ্যে একবার স্বস্তির নিশ্বাস চেপে নিল, তারপর নিজেও আর বড়বেশী অপেক্ষা না ক'রে একসময় বাড়ির পথ ধ'রলো সুখদা ঠাক্‌রুণ।

বেলা ব'সে ছিল না। ঘড়ির কাঁটা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। রসিকলালের স্নানের জন্য তাঁর বৈঠকখানা ঘরের সাম্‌নে বাল্‌তিতে ক'রে গরম আর ঠাণ্ডা জল দু'ভাগে ভাগ ক'রে রাখা হ'য়েছে। উঠতে ব'স্‌তে কষ্ট হয় ব'লে স্নানে আজকাল সময় লাগে রসিকলালের। জল রেখে ছন্দা তাই যথাসময়েই উঠবার জন্য তাড়া দিয়ে গেছে কাকাবাবুকে। উঠবারই উদ্যোগ ক'রছিলেন রসিকলাল।

ইতিমধ্যে তাঁর মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেন অঞ্জনা। এসেই ফেটে প'ড়লেন তিনি: 'বাতে শয্যা নিয়ে এদিকে তো কানের মাথা খেয়ে ব'সে আছ, বলি—পাড়ায় পাড়ায় তোমার সংসার নিয়ে আজ যে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, একবারও কি কান পর্য্যন্ত এসে পৌছেচে?'

অঞ্জনার এ মূর্ত্তি নতুন নয় রসিকলালের কাছে। তাই বিচলিত না হ'য়ে

স্বাভাবিক কণ্ঠেই জিজ্ঞেস ক'রলেন : 'কেন, মিণ্টু আর জিতু গিয়ে কোথাও কিছু ক'রে এসেছে নাকি যে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে ?'

—'হ্যাঁ, মিণ্টু আর জিতুই তো ক'রবে, ওরা যে তোমার সাতজন্মের শত্রু!' গলার ঝাঁঝ না ক'মে এবারে বরং আরও কিছু বাড়লো অঞ্জনার। ব'ল্লেন, 'সোহাগের পাত্রীটি তোমার ভেজা বিড়াল কিনা, মাছটি পর্যান্ত উল্টে খেতে জানেন না ; ওদিকে তো বাড়ুজ্জেদের বিজুর সঙ্গে পীরিতে ঢল ঢল। লোকেরই বা দোষ কি, তারা তো আর অন্ধ বা কানা নয়, যা তারা দেখে—তাই এসে বলে।'

স্ত্রীর মুখের পানে চোখের দৃষ্টি একবার নিবদ্ধ ক'রতে গিয়ে নিজের মধ্যেই কেমন জ্বালা বোধ ক'রলেন রসিকলাল। ছন্দার মতো মেয়ে এতদিনে বিজুর মতো চরিত্রবান ছেলের অসুখের মধ্যে তার সঙ্গে গিয়ে প্রণয় সম্বন্ধ পাতিয়ে মুখর হ'য়ে উঠেছে—এ বলে কি অঞ্জনা? এতদিনে মেয়েটার নিষ্কলুষ জীবনের উপর কলঙ্ক আরোপ ক'রে তবে কি খুসী হ'তে চায় অঞ্জনা? আর সে খুসীকে লালন ক'রছে পাড়া-প্রতিবেশিনীরা! এ কথা উচ্চারণ ক'রতেও যে লজ্জায় জিভ আড়ষ্ট হ'য়ে যায়। অঞ্জনার কি ধর্ম্মভয় ব'লেও কিছু নেই?

আরও কী একটা ব'লতে যাচ্ছিলেন অঞ্জনা, বাধা দিয়ে বিরক্তির কণ্ঠে রসিকলাল ব'ল্লেন, 'মানুষের বাজে কথায় তুমি বড্ড কান দাও, ছিঃ, তুমি না মা, তুমি না কাকিমা?'

—'হ্যাঁ, মা ভিন্ন কি! অমন মেয়ে গর্ভে ধারণ ক'র্লে কেটে করে দু'খানা ক'রে ফেলতাম।' গায়ের জ্বালায় চিৎকার ক'রে উঠলেন অঞ্জনা : 'কই, সবি যে এতোখানিটা বড় হ'য়ে তবে শ্বশুরের ঘর ক'র্তে গেল, তাকে নিয়ে তো কোনোদিন কেউ টু-শব্দটি তোলেনি! যাও না, এতকাল তো দিব্বি ওকালতি ক'রে গলা বাজিয়ে আদালত কাটিয়েছ, পারো তো এবারে গিয়ে পাড়ার মানুষের মুখ বন্ধ করো না! মানুষ যেন সকলেই ওনার হুকুমের চাকর আর কি? তাদের কি মগজ নেই, না চোখ নেই?'

দুঃখে আর বিরক্তিতে সারা গা রী রী ক'র্ছিল এতক্ষণ রসিকলালের। এবারে শ্লেষের কণ্ঠেই তিনি ব'ল্লেন, 'আছে, চোখ-কান বিচারবুদ্ধি সব আছে তাদের ; যাও, এবারে নিজের কাজে যাও তুমি।'

—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন বক্তৃতা ক'রতে আসিনি, তখন যাবো ভিন্ন কি! কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীর চোখরাঙানিটা নিজে দেখলেই তো পারো, আমাকে এমন আপদ নিয়ে কেন দিনরাত ম'রতে হয়?'

অঞ্জনা ভেবেছিলেন—এবারও কিছু একটা উত্তর দেবেন রসিলাল, কিন্তু রসিকলাল আর একটি কথাও ব'ল্লেন না।

বাধ্য হ'য়ে এবারে তাই স'রে আস্তে হ'লো অঞ্জনাকে।

কাকিমার সমস্ত কথাই এতক্ষণ বাইরের বেড়া ডিঙিয়ে ছন্দার কানে এসে পৌঁছেছিল। কথার ঝাঁঝ এবং বিষয়-বস্তুর দিকে লক্ষ্য ক'রে নিজের মধ্যে তাই ভেঙে প'ড়ছিল সে। আকাশে কর্-কর্ শব্দে একবার অশনি-সঙ্কেত হ'লো। সাম্‌নেই কোথাও হয়ত একটা বজ্রপাত ঘ'টে থাক্‌বে! আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ক'রবার অবকাশ নেই। হেঁসেল নিকোনো থেকে সুরু ক'রে ময়লা জামাকাপড়গুলোকে সাবান-কাচা করা পর্য্যন্ত অজস্র কাজ এখনও বাকী প'ড়ে আছে। এতক্ষণে কেবল রান্না শেষ হ'লো। রান্নাও এক ভাগে নয়, আমিষ আর নিরামিষ মিলিয়ে দু'ভাগে। নিরামিষের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবশ্য তার নিজের জন্যই। তা' নিয়ে অন্ততঃ কাকিমার মাথা ব্যথা নেই সংসারে। তা না থাক্, তবু তাকে অন্ন গ্রহণ ক'রতে হয়। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ি অনেকক্ষণ থেকেই পাক দিয়ে উঠচে। এমন ক্ষিদে কিন্তু রোজ পায় না! কিন্তু নিজের ক্ষিদেটাই এ-সংসারে তার বড় নয়। পাঁচজনের ক্ষিদে মিটিয়ে তবে তার নিজের ব্যবস্থা। হেঁসেলে শিকল এঁটে তাই ঘরের ময়লা জামাকাপড়গুলো নিয়ে এসে ব'স্‌লো সে ইঁদারার পাশে। এগুলোকে সাবানকাচা ক'রে তবে তার নিজের খাবার ব্যবস্থা। তাতে অবশ্য দুঃখ ছিল না, সে দুঃখকে নিজে থেকেই জয় ক'রে নিয়েছে সে। কিন্তু বহির্ব্বাটিতে কাকাবাবুকে লক্ষ্য ক'রে তার সম্পর্কে কাকিমার পরোক্ষ উক্তিগুলো বার বার এসে তাকে দগ্ধ ক'রতে লাগ্‌লো। এত নীচ আর এত নৃসংশও হ'তে পারে মানুষ? মাসীমা নির্ম্মলা আর বিজুদাকে একবার স্মরণ ক'রলো সে মনে মনে। কোথায় স্বর্গ আর কোথায় এই নরকের কদর্য্যতা! তা যাক্, কিন্তু সত্যিই বড় অপরাধ ক'রে ফেলেছে ছন্দা। আজ দু দিন ধ'রে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি মাসীমা আর বিজুদার। বিজুদা কতকটা

সুস্থ হ'য়ে উঠলেও এখনও তাঁর শরীর শোধরায়নি। মাসীমা তো শয্যাগতই! একই সঙ্গে এমন বিপদও মানুষের আসে?

কিন্তু উপস্থিত মতো বিপদটা ছন্দারও কম এলো না। আকাশের ঘন-ঘটাচ্ছন্ন মেঘের মতই চমকিত বিদ্যুৎ-রাগে সে-বিপদ এসে অকস্মাৎ আলোড়িত ক'রে তুল্‌লো তাকে। অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো অলক্ষিত একটা মুহূর্ত্তে একেবারেই কখন উল্টে গেল।

ক্রোধ সম্বরণ ক'রে নেবার মতো মানুষ নন্ অঞ্জনা। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এতক্ষণ তাঁর গায়ের জ্বালা মেটেনি। বাড়ির উঠোনে এসে পা দিয়ে এবারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ ক'রলেন ছন্দাকে। অপাঙ্গে একবার কাকিমাকে লক্ষ্য ক'রে আপন মনেই আবার ছন্দা জামাকাপড়গুলোকে সাবান-কাচা ক'রতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। কাকিমার সংসারেরই নোংড়া জামাকাপড় সব, মিণ্টু আর জিতুর পরিধেয়ই অধিকাংশ। তার নিজের প্রয়োজনে একটুকরো সাবান ব্যবহারেরও অধিকার নেই এখানে; আগে আগে এই নিয়ে দুর্ভাবনা হ'তো, এখন সে দুর্ভাবনাকেও অতিক্রম ক'রে উঠেছে সে। কিন্তু তাতেই কি স্বস্তি আছে? আশ্বস্ত হ'তে চেয়ে বরং প্রতিবারই বিপর্য্যস্ত হ'য়েছে ছন্দা। তবু এই মাটি তার কাছে স্বর্ণভূমি, তার বাল্য, কৈশোর আর যৌবনের সহস্র কামনায় পল্লবিত মাগুরার এই বন-প্রকৃতি, নবগঙ্গার জোয়ার-ভাটায় মিশে আছে তার দুঃখ-সুখের ইতিহাস। এ মাটিকে ত্যাগ ক'রে রাজসাহীর নিশ্চিন্ত জীবনে ফিরে গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে আজও সে ভয়ে শিউরে ওঠে। জীবন নিয়ে তাইতো আজও তার এমন কৃচ্ছ্রসাধনা!

অঞ্জনার ক্ষুরধার জিহ্বা কিন্তু তাই ব'লে এতটুকুও প্রশমিত হ'লো না। চিৎকার ক'রে সারা বাড়িটাকে মাথায় ক'রে নিলেন তিনি।—'তিন কূলে কাঁটা দিয়ে তো ম'রতে এলি এখানে, এবারে আমাকেও নির্ব্বংশ ক'রে ছাখ্ পারিস কিনা বেরোতে! রাজেন্দ্রানীর জন্যে তো বাড়ুজ্জেদের ঘরে বরণকুলো সাজানই হ'য়েছে, লোকের চোখে ধূলো দিয়ে তবে আর ঢলাঢলি কেন? এবারে অনুগ্রহ ক'রে সাতপাকের ব্যবস্থা ক'রে পীরিতের শয্যা গিয়ে পেতে ব'স্‌লেই তো হ'লো! হতচ্ছাড়ী; স্বামী-খেকো, রাক্ষুসী কোথাকার। ভেবেছিস—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস, শিবঠাকুরের বাবাও টের পায় না?'

ক্রোধ চণ্ড। রাগে দাঁতগুলো একবার করমর্ ক'রে আওয়াজ হ'য়ে উঠলো অঞ্জনার।

সাবান-মাখা জামাকাপড়গুলো আছড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ হাত দু'খানি থেমে গেল ছন্দার। বুকের মধ্যে মনে হ'লো—হাতুড়ীর এক একটা প্রচণ্ড ঘা এসে প'ড়ছে তার। এ আঘাত আজকের নতুন নয়, আঘাত স'য়ে স'য়েই তো প্রতিমুহূর্তে সে নিজের মৃত্যুকামনা ক'রছে। কিন্তু আজকের আঘাতটা আরও বেশী তীব্র, বিশেষ একটা অর্থবাচক। নিজের অদৃষ্ট-দেবতাকে তাই মনে মনে একবার স্মরণ ক'রলো ছন্দা।

অঞ্জনার শাণিত কণ্ঠ ততক্ষণে আবার ফেটে প'ড়েছে।

—'তাই তো ভাবি, বাড়ুজ্জে-বাড়ির অসুখে দুনিয়ার এত মানুষ থাক্‌তে মেয়ের আমাদের এত দরদ কেন! মেয়ে তো নয়, ডাইনী। রোগের বীজ এনে আমার ঘরে না ছড়ালে আমরা মরি কি ক'রে! হারামজাদী, বজ্জাত, কুলটা কোথাকার, পেটে পেটে এতখানি নিয়ে তবে তুই পাড়া বেড়িয়েছিস এতকাল?'

মুহূর্তে মনে হ'লো—সমস্তটা বাড়ির মধ্য দিয়ে যেন অকস্মাৎ একটা ভূমিকম্প বয়ে গেল। বহির্ব্বাটিতে ব'সে রসিকলাল পর্য্যন্ত সে কম্পন স্পষ্ট বোধ ক'রলেন। কিন্তু অক্ষম, হতমান তিনি। স্নানের গরম জল তাঁর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, কিন্তু স্নানের উন্মাদনা তিনি অনেকক্ষণ আগেই হারিয়ে ফেলেছেন। মাথার তালুতে শুধু একবার জলের হাত বুলিয়ে নিয়ে নিজেকে নিয়ে খানিকটা আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে গেলেন রসিকলাল।

নিজেকে এতক্ষণ যথেষ্ট সংযত ক'রে রেখেছিল ছন্দা। কিন্তু ধৈর্য্যের বাধ অলক্ষ্যেই কখন্ চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। আজ তাকে কুলটা আখ্যাও পেতে হ'লো কাকিমার কাছ থেকে। এ কথা শুনবার আগে তার মৃত্যু হ'লো না কেন? দু'মুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে আজ তার চরিত্রের উপর এত বড় একটা কলঙ্ক আরোপ ক'রেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন কাকিমা? সংসারে কি কাকা জীবিত নেই? সহসা কাকাবাবুর জন্য মনটা একবার হু হু ক'রে উঠলো ছন্দার। আজ তিনি বেঁচে থেকেও জীবন্মৃত হ'য়ে আছেন, কাকিমার ঔদ্ধত্য তাই গিরিশৃঙ্গকেও অতিক্রম ক'রে উঠেছে। হাতের সাবান-কাচা রেখে সহসা একবার মুখ তুলে তাকালো ছন্দা অঞ্জনার মুখের

দিকে : 'কি ব'ল্লেন, কুলটা ? আমি কুলটা ?'—ব'ল্তে গিয়ে অশ্রুভারে দু'চোখ ঝাপ্সা হ'য়ে গেল ছন্দার।

সক্রোধে ঠোঁট উল্টালেন অঞ্জনা : 'না, কুলটা নয়, সতী সাবিত্রী আমার ! বলি, আমার চোখে ধুলো দিলেও পাড়াপ্রতিবেশীর তো চোখ আছে ! তারাই তো জয়ঢাক পিটিয়ে গেল তোমার সতীপনার। ওলো আমার সতী লো ! মেয়ে তো নয়, ঘরে আমি দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছি।'

আর ব'সে থাকা সম্ভব হ'লো না ছন্দার পক্ষে। এভাবে ব'সে থাকা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। হাতের সাবান-কাচা রেখে উঠে দাঁড়ালো ছন্দা, তারপর নিজের ঘরের দিকে পা চালাতে যেতেই আর-একবার থ'ম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়তে হ'লো তাকে।

অঞ্জনা ব'ল্লেন, 'যা, দূর হ'য়ে যা আমার চোখের সাম্‌নে থেকে, সংসারটা তবু আমার বাঁচবে।'

—'দূর হ'য়েই যাবো, আর আমাকে নিয়ে আপনাকে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে ছোট হ'তে হবে না কাকিমা। কাকাবাবুর সংসারে কলঙ্ক প'ড়বে, এ কি আমিই জীবন থাকতে সহ্য ক'রতে পারবো ?' ব'লে ঘরের দিকে অগ্রসর হ'তে গেল ছন্দা।

কিন্তু কথাটা তার কোথায় গিয়ে যেন অপমানের সঙ্গে বিঁধলো অঞ্জনাকে। কণ্ঠের স্বর একই পর্দ্দায় রেখে আর একবার চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি : 'সবাই এসে শুনে যাও মেয়ের কথা। কথার জাহাজ আর কাকে বলে ! বলি —স্বামীকে খেয়ে তার ঘরই যদি আগলাতে পারবি তো এখানে এসে এতকাল এই ঘেন্নাপিত্তি ছড়ানো কেন ? পোড়ারমুখীর কথা শোনো, আর পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে আপনাকে ছোট হ'তে হবে না ! ছোট ক'রতে বাকীই রেখেছিস !' রাগের উত্তেজনায় হন্ হন্ ক'রে খানিকটা সাম্‌নে এগিয়ে এসে শক্ত-হাতে হঠাৎ আঘাত ক'রে ব'স্‌লেন তিনি ছন্দাকে, ব'ললেন, 'আদিখ্যেতা তো যথেষ্ট দেখালি, এবারে মর গিয়ে যেখানে পারিস। হতচ্ছারী, নচ্ছার, বজ্জাত কোথাকার !'

আকাশটাকে বিদীর্ণ ক'রে সহসা যেন একটা বাজ প'ড়লো কোথায় ! বন-প্রকৃতিতে ঝড়ের হাওয়া বইছে শন্ শন্ ক'রে। সেদিকে বোধ করি অঞ্জনার বড় একটা নজর গেল না।

আঘাতের টাল সাম্‌লাতে না পেরে একটা খুঁটির গায়ে গিয়ে আছ্‌ড়ে

প'ড়লো ছন্দা। গালের একটা পাশ কেটে গিয়ে রক্তে সারা মুখখানি তার ভেসে গেল। হাতের তেলোয় ক্ষতস্থানটা চেপে ধ'রে নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে মেঝের ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে প'ড়লো ছন্দা। ভালোবাস্‌লে আঘাত পেতে হয়, সে জানে। মাণ্ডরাকে ভালোবাসার পিছনে এই আঘাতই এতদিন তার জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিল। বোধ করি আজ তার শেষ অধ্যায় ঘ'টে গেল; ঘ'টে গেল কাকাবাবুর অলক্ষ্যেই। কাকিমার কণ্ঠই হয়ত তাঁর কান অবধি গিয়ে পৌছেচে, তার অধিক নয়। মিণ্টু আর জিতু খেয়ে-দেয়ে এগারোটা না বাজতেই স্কুলে ছুটেছে। আকাশের অবস্থা দেখে ঘর থেকে আজ তাদের বেরোতে বারণ ক'রেছিলেন কাকিমা, কিন্তু সে কথা তারা কানে নেয়নি। সাম্‌নেই হাপ্‌-ইয়ালি পরীক্ষা, মাষ্টারের কড়া শাসন র'য়েছে স্কুলে, তাই ছাতা নিয়ে একসঙ্গেই বেরিয়ে প'ড়েছে দু'জনে। নইলে এতক্ষণে তারাও কিছু একটা মজা দেখে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হয়ত খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হাসতো। সব দিক থেকেই কেমন একটা উষ্মা আর উপেক্ষা! জীবনে আজ তার সত্যিই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। সহসা মাসীমা নির্ম্মলার জন্য মনটা একবার বড় বেশী ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। মিথ্যে কথা বলেন নি তিনি সেদিনঃ 'জানিস তো—এ সংসারে বিধবার কি জ্বালা! কোথাও তার মাথা উঁচু ক'রে কথা ব'লবার অধিকার নেই।' প্রতিদিনের জীবন দিয়ে সে-কথা প্রতিমুহূর্ত্তেই সে উপলব্ধি ক'রেছে। আর মৃত্যু কামনা ক'রেছে। মৃত্যুই তো তার শ্রেয়! সমস্ত জ্বালার অবসান। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান': বিজুদাই একদিন 'সঞ্চয়িতা'র পৃষ্ঠা খুলে প'ড়ে শুনিয়েছিল তাকে। জীবনে সেদিন স্বপ্ন ছিল, রং ছিল, আশা ছিল, সুখী হ'তে চেয়েছিল সে সেদিন একান্ত ভাবে। আজ সাম্‌নে তার শুধু অন্ধকার, বিভীষিকার চকিত পদসঞ্চার এসে অনবরত তার কানে আঘাত ক'রছে। সত্যিই ফুরিয়ে গেছে সে, ম'রে গেছে সে আশাদীপ্ত অতীতের ইতিহাস থেকে।···

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটায় ক্রমে দু'টো, তিনটে, চারটে বেজে গেল। বাইরে ক্রমেই ঝড়ের বেগ বাড়ছে। কর্‌ কর্‌ ক'রে শব্দ হ'য়ে উঠছে মেঘের। হাতের তেলোয় আর একবার ক্ষতস্থানটাকে মুছে নিল ছন্দা। যেম্‌নি ক্ষুধায় পেটের নাড়ী পাক দিয়ে উঠচে, তেম্‌নি ব্যথায় টন্‌ টন্‌ ক'রছে গালের ক্ষত-স্থানটা। কিন্তু মনের দাহর কাছে এ দাহ কতটুকু? দেখতে দেখতে ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। মুখে এক ফোঁটা জল অবধি আজ আর প'ড়তে

পেলোনা তার। একটি বারের জন্যও খাবার কথা ব'লে কেউ তাকে এসে ডাকলো না। যিনি ডাকতেন, তিনি কাকাবাবু। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে রেখেছেন তিনি সংসার থেকে। এ সংসারের কোনো কিছুতেই আজ আর তিনি যুক্ত ন'ন্। যিনি সর্ব্বত্র সব কাজে প্রত্যক্ষ, তিনি আজ স্পষ্টই জবাব দিয়ে দিলেন তাকে। জীবন-সত্তার সমস্ত দিক থেকেই পাওনা ছুটি তার মিলে গেছে। অতএব মৃত্যুতে আর দুঃখ নেই। একটা স্পষ্ট অঙ্গীকারে হঠাৎ যেন কেমন নিজের মধ্যে জ্ব'লে উঠলো ছন্দা। মৃত্যু। একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়া সংসার থেকে। এ ভিন্ন আজ আর পথ নেই তার সাম্‌নে। সোজা সরল রেখার মতো পথ। কেউ দেখবে না, কেউ জানতে আস্‌বে না এই দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকারে। মৃত্যুর ডাক শুন্‌তে পাচ্ছে সে স্পষ্ট কানে। অদৃশ্য-লোক থেকে ডাক পাঠিয়েছে তাকে শ্যামলকান্তি। স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছে তার আহ্বান। স্বামীর আহ্বান তার স্ত্রীকে, মৃত্যুর আহ্বান জীবনকে। মৃত্যু : মনে মনে আর-একবার উচ্চারণ ক'রলো ছন্দা শব্দটাকে। তার মৃত্যুর জন্যই যেন প্রকৃতি আজ এমন ঝঞ্ঝার সৃষ্টি ক'রে সমস্ত দিককে আগলে রেখেছে! এমন সুন্দর মুহূর্ত্ত, এমন মধুর নিশিলগ্ন আর তার জীবনে আস্‌বে না। সোজা সরল রেখার মতো পথ। ছোট্ট এই গৃহপ্রকোষ্ঠ থেকে নবগঙ্গা। তারপর তার আবর্ত্তসঙ্কুল জলরাশির মধ্যে ঝুপ ক'রে শুধু একটা শব্দ। সকল জ্বালার অবসান, সকল সমস্যার পরিসমাপ্তি।

নিজের অলক্ষ্যেই একসময় মেঝের উপর উঠে ব'স্‌লো ছন্দা। মনটা লাগামহীন ঘোড়ার মতো, কোথাও সে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকতে চায় না। ঝড়ের গতিতে ছুটে চলে মনের ঘোড়া। লক্ষ্যহীন তার গতি। সেই অলক্ষ্যের পথ থেকেই হঠাৎ কখন্ তার হৃদয়ের সাম্‌নে সে লক্ষ্য ক'র্‌লো বিজুদা আর মাসীমা নির্ম্মলার উপস্থিতি। মৃত্যুর পরেও নাকি জীবন আছে, বিদেহী জীবন। সে-জীবনেও কি ভুল্‌তে পারবে ছন্দা মাসীমা আর বিজুদাকে? মাসীমার স্নেহ আর বিজুদার ভালোবাসা—তা যে অক্ষয় হ'য়ে রইল তার জীবনে! কাল যখন ভোরে উঠে বিজুদা তার এই কৃতকর্ম্মের সংবাদ পাবে, তখন না-জানি কত দুঃখেই সে ভেঙে প'ড়বে! তাকে সান্ত্বনা দেবার মতো প্রাণীটিও যে আর পৃথিবীতে থাক্‌বে না!

কর্ কর্ শব্দে আর একবার অশনি-সঙ্কেত হ'লো আকাশে। বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে ঘন ঘন।

রেসের ঘোড়ার মতো লাগামহীন মনের ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে —টক্ টক্···টক্। দ্রুত, আরও দ্রুত। ভাবীকালের পসরা নিয়ে আলস্যের আবরণে জড়িয়ে থাকবার অবকাশ নেই। দুর্য্যোগের ঘনঘটায় প্রকৃতি আচ্ছন্ন। মায়া মিথ্যে, জীবন মিথ্যে ঃ কলঙ্কিত জীবনে নির্য্যাতনের বোঝা ব'য়ে আর কেন? মিথ্যে হোক্ ভাবীকাল, মিথ্যে হোক্ দুঃস্বপ্ন, মিথ্যে হোক্ আত্মার ললিত বিলাপ! ধিক্কারে ধিক্কারে আত্মা তার বিষে বিষে নীল হ'য়ে গেছে। আর এক মুহূর্ত্তও নয় এই সংসারচক্রে।—সোজা উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লো ছন্দা। পা তার এতটুকুও ট'ল্ছে না, এতটুকুও আর দ্বিধা নেই তার মনে। অশ্রু মুছে গিয়ে কঠোর শপথে জল্ জল্ ক'রছে চোখ দু'টি। একটি মুহূর্ত্তও আর অপেক্ষা নয়। নিঃশব্দে একসময় দরজার খিল খুলে উন্মাদিনীর মতো দুর্য্যোগের অন্ধকারে অলক্ষ্যে কোথায় মিশে গেল ছন্দা।···

নবগঙ্গার গতি আজ প্রচণ্ড। উচ্ছ্বসিত জলপ্রবাহে এ-কূল ও-কূল তার উপ্‌ছে প'ড়ছে। প্রতি বছরই এ-সময়ে নবগঙ্গা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। ভরা যৌবনের জোয়ার আসে তার এ-সময়ে; প্রাণ-বল্লভের অভিসারে ছড়িয়ে পড়ে তার দেহ-সুষমা। এ মূর্ত্তি প্রচণ্ড মূর্ত্তি, হরি মুখুজ্জের মতো ডাকসাঁইটে লোকও তার এ মূর্ত্তিকে ভয় করে। স্রোতের প্রচণ্ড বেগে ধ্বসে পড়ে এ-পার ও-পার। কূলপ্লাবি জলরাশিতে মাঠ-ঘাট ডুবে যায়, তার উপর দিয়ে নৃত্য-মুখরা নবগঙ্গা আপন লাস্যে থই থই ক'রে ব'য়ে চলে। ঝড় এলে তার খ্যাপামি আর বাধ মানে না। আজকের দুর্য্যোগে তার সেই খ্যাপামির লীলা সুরু হ'য়েছে।

নিজের শয্যায় ব'সে পাশের উন্মুক্ত জানালা দিয়ে কেমন একটা অন্যমনস্ক দৃষ্টি তুলে ধ'রে নবগঙ্গার এই ভরা যৌবনের রূপ দেখছিল বিজন। বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে মনটা কখন্ থেকে যেন ক্ষেপে উঠেছিল, ভালো লাগছিল না কিছুই। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও তাই খোলা জানালার পাশে ব'সে বাইরের এই ঝড়ের ঝাপ্টা সম্পর্কে তার এই ঔদাসীন্য। জানালা দিয়ে তাকালে নবগঙ্গার পাড়টা ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে ওঠে দু'চোখে। খণ্ড খণ্ড অলস মুহূর্ত্তগুলো কেটেছে তার এই জানালা-পথেই নবগঙ্গার রূপ দেখে দেখে। কাব্যলক্ষ্মীর সুর-ঝঙ্কার শুন্‌তে পেয়েছে সে তখন মনে মনে, অম্‌নি অলক্ষ্যে কখন্ শাদা খাতার পৃষ্ঠার উপর কলমটা বড় বেশী সজাগ হ'য়ে উঠেছে তার

হাতের আঙ্গুলে। সুরু হ'য়েছে কবিতা। কিন্তু সে দিনও নেই, সে কবিতাও নেই আজ আর তার জীবনে। কেমন একটা দুঃসহ গ্লানিতে আজ নানা দিক দিয়ে জীবনটা ভ'রে উঠেছে। ঘরে ব'সে ক্রমেই আজ অধীর হ'য়ে উঠেছে সে। এমন নিষ্ক্রিয় ভাবেও মানুষ ব'সে থাক্‌তে পারে? কিন্তু ছন্দার কথা সে উপেক্ষা ক'রতে পারেনি। পুরোপুরি সুস্থ হ'য়ে উঠতে কি সত্যিই সে পেরেছে? কেমন একটা অবসন্নতায় আজও সারা দেহ তার ক্লান্ত। মনের ইচ্ছার সঙ্গে দেহের অনুমতি ব'লেও তো একটা বস্তু আছে! সেখানে যে এখনও সে পিছিয়ে র'য়েছে। ছন্দার অনুরোধ তাকে বাধ্য হ'য়েই পালন ক'রতে হ'য়েছে বৈ কি!

বিদ্যুৎ-ঝলকে দুর্যোগের প্রলয়-মাতন স্পষ্ট হ'য়ে চোখে ধরা দিচ্ছে। হু হু ক'রে বাতাস এসে বিঁধ্‌ছে গায়ে, তার সঙ্গে ঠাণ্ডা বরফের মতো বৃষ্টির ঝাপ্টা। অন্য সময় হ'লে শীতবোধ হ'তো বিজনের। কিন্তু আজ কেন যেন মনের অস্বস্তির কাছে সে বোধটুকুও চাপা প'ড়ে গেছে।

সকালের দিকে মা'র সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল ছন্দাকে নিয়ে। নির্ম্মলাই কথাটা তুলেছিলেন। যে মেয়ে রোজ দু'বেলা এসে শত লাঞ্ছনা স'য়েও এত পরিচর্য্যা ক'রে গেল, আজ ক'দিন ধ'রে তার দেখা নেই। অসুখ বিসুখ হ'লো কি না, একটা খবর নেওয়াও তো প্রয়োজন!

উত্তরে বিজন ব'লেছিল, 'সে প্রয়োজনের পথ কি কোথাও খোলা আছে মা? জানি না ওর অদৃষ্ট ওকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে!'

জবাবে কিছু-একটাও আর ব'ল্‌তে পারেন নি নির্ম্মলা।

কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় বিজন জিজ্ঞেস ক'রেছে, 'আচ্ছা মা, ওর সম্বন্ধে আমাদের কি কিছুই ক'রবার নেই, আমরা কি কিছুই বিহিত ক'রতে পারি না ওর?'

—'বিহিত?' শব্দটা উচ্চারণ ক'রে একবার দুঃখের হাসি হেসেছেন মাত্র নির্ম্মলা, আর কিছু-একটাও বলেন নি। ব'ল্‌বার নেই ব'লেই বলেন নি। কিন্তু মনটাও কি তাই ব'লে স্তব্ধ ছিল? তা নয়। রোগ-শয্যায় শুয়ে প্রতি-মুহূর্ত্তেই তিনি ছন্দার অভাব বোধ ক'রেছেন।

অভাব বোধ কি বিজনেরও কিছু কম? কিন্তু এ কথা কি একটি বারও মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারলো? তার প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন, তার ব্যর্থ যৌবনের স্মৃতি। বুকখানিকে খুলে দেখাতে পারছে কাকে সে সংসারে?

সকালে তার কথার জবাব দেওয়া সম্ভব হয় নি নির্ম্মলার। এ-কথায় সে-কথায় আসল কথা চাপা দিয়ে শেষে শুধু ব'লেছেন, 'বাইরে আজ যেমন তুর্য্যোগ, শরীরে যেন ঠাণ্ডা লাগাস্ নে বিজু। ঝড় উঠবে ব'লে মনে হ'চ্ছে। জানালায় খিল এঁটে ভিতর দিয়ে চট কি কাপড় কিছু-একটা গুঁজে নিস্।'

নির্ম্মলার এ সাবধানতা চিরকালের।

শেষ পর্য্যন্ত সেই ঝড় সত্যিই এলো। কিন্তু মা'র কথা মতো জানালা বন্ধ ক'রে ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রতে পারলো কই বিজন? সকালের কথা সকালেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। মনের অস্বস্তির কাছে কখন্ই তলিয়ে গেছে সারা সকাল আর তুপুরটা। বাইরে ঝড়ের বেগ যত বেড়েছে, মনের বেগও তেম্নি থার্ম্মোমিটারের ডিগ্রীর মতো একে একে চ'ড়েছে। জানালাটা বন্ধ করা তার পক্ষে আর হ'য়ে ওঠে নি। মন আর প্রকৃতি কখন্ একাকার হ'য়ে গেছে! উদাস-চিত্তে তাইতো প্রকৃতিকে এমন ক'রে উপলব্ধি ক'রবার অবকাশ।

মেঘ ডাকছে। গুম্ গুম্ শব্দে ফেটে প'ড়ছে আকাশ। মুহুর্মুহু বিত্যুৎ-ঝলকে ঝিঁকিয়ে উঠছে সমস্তটা বহিঃপ্রকৃতি। ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি ঝ'রে পড়ছে মেঘমেতুর আকাশকে বিদীর্ণ ক'রে।

অধীর চিত্তে সহসা একবার চঞ্চল হ'য়ে উঠলো বিজন। বিত্যুৎ-ঝলকে হঠাৎ যেন একটি শ্বেতবসনা নারীমূর্ত্তি ভেসে উঠলো তু'চোখে। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে অকস্মাৎ থ'ম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়লো সে নবগঙ্গার তীরে। আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়কর। এমন দারুণ তুর্য্যোগেও কোনো মানুষ ঘরের বার হ'তে পারে? ঔদাসীন্য কাটিয়ে উঠে খানিকটা সচেতন হ'য়ে ব'স্‌লো বিজন। জীবনে এমন রহস্যের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে নি কোনোদিন। কিন্তু সত্যিই কি রহস্য?

বিত্যুৎ-ঝলকে এক একটা মুহূর্ত্ত জ্যোৎস্নার মতো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠচে। বাত্যাহত একটা ভিজে কাককেও দৃষ্টি প্রসারিত ক'রলে স্পষ্ট চেনা যায়। মানুষ তো বৃহত্তর জীব!

অকস্মাৎ নিজের অলক্ষ্যেই একবার অধীর চাঞ্চল্যে উচ্চারণ ক'রে উঠলো বিজন: 'সে কি, ছন্দা নয় তো?' চিরদিনের এত পরিচিত জনকে ভুল হবার

কথা নয় বিজনের। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ইতিহাসটা যেন মাথার রক্ত-কণিকাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে একবার আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠলো। হয়ত আত্মহত্যার পথই তবে শেষ পর্য্যন্ত বেছে নিয়েছে ছন্দা। তার এই দু'দিনের অনুপস্থিতির পিছনে হয়ত ছিল এই প্রস্তুতি। একেবারে প্রস্তুত হ'য়েই তবে সে বেরিয়েছে। কুলপ্লাবি নবগঙ্গা পারবে কি ধ'রে রাখতে তার প্রাণকে ?

ত্রস্তে উঠে প'ড়লো বিজন। আর এক মিনিটও অপেক্ষা নয়। তার চোখকে সে অবিশ্বাস ক'রতে পারে না। নিশ্চিত দেখেছে সে ছন্দাকে। আত্মহত্যা: কথাটা আর-একবার মনে আসতেই সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে কেমন একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল তার। সে অন্ততঃ এভাবে ছন্দাকে ম'রতে দিতে প্রস্তুত নয়। দুর্য্যোগের কথা অলক্ষ্যেই কখন্ মনের অতলে চাপা প'ড়ে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে দ্রুত পা চালালো বিজন বাইরে।

আতঙ্কে একবার চেঁচিয়ে উঠতে গেলেন নির্ম্মলা: 'তুই কি পাগল হ'লি বিজু? এই ঝড়-জলে এমন খালি মাথায় তুই কোথায় বেরোচ্ছিস্ ?'

কিন্তু বিজন ততক্ষণে ঝড়ের আবর্ত্তে মিশে গেছে। বাতাসের হু-হু শ্বাসে শুধু তার ছোট একটি কথা কেবল নির্ম্মলার কানে এসে বার বার ক'রে বিঁধতে লাগল: 'জীবনে আমার এই শেষ পরীক্ষা মা।'

চকিতে উঠে একবার দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন নির্ম্মলা। কিন্তু ঝড়ের উদ্দাম মাতন ভিন্ন আর কিছু-একটাও লক্ষ্যে প'ড়লো না।...

মেঘ ডাক্‌ছে। বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। কুলু কুলু নাদে ভেঙে প'ড়ছে আবর্ত্তচঞ্চল নবগঙ্গা। মাগুরার মৃত্তিকার সঙ্গে এই আজ শেষ সম্পর্ক ছন্দার। শেষ বারের জন্য আর একবার স্মরণ ক'রলো সে শ্যামলকান্তিকে: 'নাও, আমাকে তুলে নাও তুমি। এ পৃথিবীর সকল যন্ত্রনার আমার অবসান হোক।'

দেহটাকে সম্পূর্ণভাবে নবগঙ্গার বুকে এলিয়ে দিতে যেতেই অকস্মাৎ বাধা পেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লো ছন্দা।—'কে, কে তুমি ?'

বিজন ততক্ষণে দু'বাহুর বন্ধনে ছন্দাকে টেনে নিয়েছে। উত্তরে কিছু-একটাও আর মুখ ফুটে ব'লতে হ'লো না বিজনকে। বিদ্যুৎ-ঝলকে স্পষ্টই তাকে চিনে নিয়েছে ছন্দা। ব'ললো, 'বিজুদা, তুমি ? তুমি কেন এলে বিজুদা ? কেমন ক'রে জান্‌লে তুমি আমার এই পাপের কথা ?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'আত্মায় বিশ্বাস করিস তো তুই ? তা যাক্। আত্মহত্যা ক'রে এ জীবনের অবসান ঘটাবি—এই তবে তোর মনে ছিল ?'

—'সংসারে কোথাও যার স্থান নেই, নদীর জল তার র'য়েছে।' ব'লে বিজনের বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে একবার মুক্ত ক'রতে চেষ্টা ক'রলো ছন্দা। ব'ল্‌লো, 'ছেড়ে দাও, শান্তিতে ম'রতে দাও আমাকে তুমি বিজুদা। কেন তুমি এম্‌নি ক'রে এসে আমাকে বাধা দিলে?'

বিজন ব'ল্‌লো, 'ভগবান তো আত্মহত্যা ক'রবার জন্যে কাউকে পাঠান নি পৃথিবীতে! পাপ জেনেও আজ তবে কেন এই পাপের পথে পা বাড়ালি?'

—'সে শুধু পৃথিবীর এই পুণ্যভূমি থেকে নিঃশেষে মুছে যাবার জন্যে কাল সকালে ছন্দা ব'লে আর কেউ থাক্‌বে না এ পৃথিবীতে।'

ঝড় কি শুধুই মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, উদ্দাম গতিতে সেই ঝড়ের প্রবাহ চ'লেছে ছন্দার সারা বুকের মধ্যে। শ্বাস-প্রশ্বাসের মুহুর্মুহু আন্দোলনে মনে হ'চ্ছে বুকখানি এখনই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। শক্ত হাতে আর-একবার চেষ্টা ক'রলো সে বিজনের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রতে।

কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা।

দু'বাহুর মধ্যে আরও নিবিড় ক'রে ছন্দাকে আঁকড়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিজন ব'ল্‌লো: 'ছিঃ ছন্দা, আর কারুর জন্যে না হোক্‌, আমার দিকে চেয়ে আমার মার দিকে চেয়ে আজ তোকে বাঁচতে হবে। জীবনে আঘাত এলেই কি ম'রতে হয়? আঘাত দেবে মানুষকে নব-জীবনের প্রেরণা। যে দুঃখ কষ্ট তুই সারা জীবন পেলি, সব কিছুকে আজ ভুলে যা লক্ষ্মীটি। আয় ছোটবেলার মতো আবার নতুন ক'রে আমাদের খেলাঘর রচনা করি। সেখানে আবার আমরা নতুন হ'য়ে ফুটে উঠি। একদিন যেমন ক'রে তোকে পেয়েছিলাম আমার সাথী, আজ থেকে ঠিক তেম্‌নি ক'রেই চির-সঙ্গিনী হ'য়ে থাক্‌ তুই আমার জীবনে। সমাজে নতুন ক'রে আবার নবজীবনের প্রতিষ্ঠা ক'রবো আমি। আমাদের যা কিছু আঘাত, আজকের এই ঝড়ের মেঘভাঙা জলে তা ধুয়ে যাক্‌। চল্‌, আমরা ঘরে ফিরে যাই লক্ষ্মীটি।'

ছন্দার মুখে আর একটি কথাও ফুট্‌লো না। মনে হ'লো—কে যেন বুকের ভিতর থেকে সমস্ত কথাকে তার অলক্ষ্যে কেড়ে নিল। এতক্ষণের এত শক্তি কেমন যেন শিথিল হ'য়ে এলো তার! বিজুদাকে সে বাধা দেবে কেমন